শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামী

অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ

ভাব ও লেখা
১০-এ, তেলিপাড়া রোড
কলিকাতা-২৫

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী শ্যামলী ঘোষ

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৬৭

মুদ্রাকর—
শ্রী মৃণাল কান্তি ঘোষ
ঘোষ প্রিণ্টার্স
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা : ৫

—উপহার—

____

____

____

—ঃ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ-

১। নানক বাণী
২। শ্রীঅরবিন্দর জীবন ও বাণী
৩। যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ
৪। ভক্ত রূপ-সনাতন
৫। শ্রীমা সারদামণি
৬। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ
৭। মহামানব বামাক্ষেপা
৮। পরম ভাগবত মহাত্মা কবির
৯। গৌরপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া
১০। শিখাময়ী নিবেদিতা
১১। জানবাজারের রাণীমা
১২। পদ্মাবতী জয়দেব
১৩। শত শহীদের রক্তে
১৪। গরীব লড়াই
১৫। অগ্নিযুগের নায়ক
১৬। লাল গোলাপ ধূসর আকাশ
১৭। পেয়েছি অন্যমনে
১৮। সবার প্রিয় নজরুল
১৯। শরৎ প্রসঙ্গ ইত্যাদি

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যাঁকে সাক্ষাৎ শিব বলে যিনি একালের শ্রেষ্ঠতম যোগীপুরুষ সেই মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামীর রিত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি।

ার এই প্রয়াস সার্থক হলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

'এক স্থানে সামান্য মুদ্রণপ্রমাদজনিত ক্রটির জন্যে পাঠকবর্গের প্রার্থনা করছি।

াঁনি লেখার সময় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির ওপর বিশেষ নির্ভর

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর জীবনচরিত ও তাঁর উপদেশ—
ওঁ স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী।

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর জীবনচরিত ও তত্ত্বোপদেশ—
শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

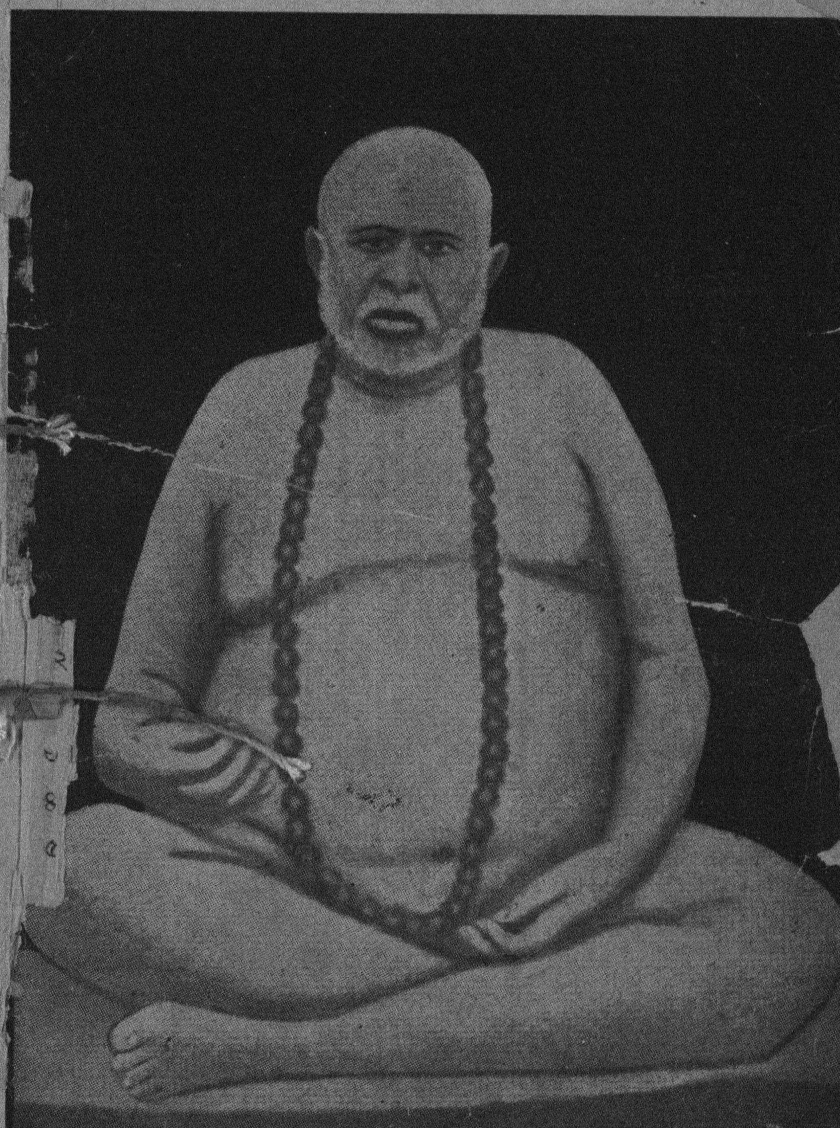
কাশীধাম—মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, সাহিত্যকলা বিদ্যার্ণব।

বিহারী বাবা—স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী।

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

ইতি—

শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার ঘোষ



বিশ্বনাথ শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামী

মহা[illegible]র্ভাব — ১০১৪ বঙ্গাব্দ   তিরোভাব — ১২৯৪ বঙ্গা

বিশ্বনাথ শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামী

পুণ্যতীর্থ কাশীধাম স্মরণাতীত কাল হতে ভক্তজনের মনে করেছে পুণ্যের সঞ্চার। শোকসন্তপ্ত মানবপ্রাণ পেয়েছে বিমল শান্তি এখানকার পুণ্য মৃত্তিকা স্পর্শ করে—অবগাহন করে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্বচ্ছ ও সবেগ ধারায়।

যুগ যুগ ধরে কাশীধামের ধূলিকণা ধন্য হয়েছে মহাপুরুষ এবং সাধুসজ্জনদের পদচারণে। পবিত্র হয়েছে সাধকদেব তপস্যা এবং দিব্যপ্রেমের লীলাবন্যায়। ভগবান তথাগত এই কাশীধামের নিকটবর্তী সারনাথে এসে তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্মের অমৃতময় বাণী প্রথম প্রচার করেন। এমন পবিত্র ধাম এই কাশী বা বারাণসী। এ যেন সাক্ষাৎ স্বর্গ।

পুরাকালে দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীর সামনে কাশীধামের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। তখন তাঁর সামনে উপস্থিত ছিলেন স্বর্গের দেবতাগণ, মর্তের ঋষিবৃন্দ এবং অন্যান্য অনেকে।

ভগবান শঙ্কর বললেন, কাশীধাম হচ্ছে সর্বতীর্থের সার। এখানে আমার লীলা গুপ্তভাবে রয়েছে। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ, যাঁরা শুদ্ধচেতা ব্রহ্মচারী একমাত্র তাঁরাই লীলামাহাত্ম্য বুঝতে পারেন। কাশীধাম হচ্ছে পরম ক্ষেত্র। আমি কাশীছাড়া নই। এই কারণে এ স্থানকে বলা হয় অবিমুক্ত। এই ক্ষেত্র রয়েছে অন্তরীক্ষে। যোগিগণ সাধন বলে সেই ক্ষেত্র দেখতে পান। অত্যন্ত দুরাচার

ব্যক্তি যদি কাশীতে অবস্থান করে বা দেহ রক্ষা করে তাহলে সে সেথা শান্তিময় এবং আনন্দময় শিবলোক প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানতাবশত যারা পাপ করে এখানে আসে তাদের পাপ ক্ষয় হয়। যারা জ্ঞানত পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে এখানে আসে তারা অসংখ্য বিঘ্নের সন্মুখীন হয়।

ভগবান শঙ্কর এভাবে প্রিয়তমা ধর্মপত্নী দেবী পার্বতীর কাছে কাশীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য জৈমিনির কাছে কাশীধামের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। তিনি বলেন, এখনো কাশীধামে ভগবান শংকরের অব্যক্ত লীলার অভিব্যক্তি বোঝা যায়। তিনি এস্থানে মৃত্যুপথযাত্রীদের কানে কানে শোনান অপূর্ব তারকব্রহ্মনাম। কাশীই স্বর্গ, কাশীই ধর্ম, কাশীই অমৃত।

স্কন্দ পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডম্-এর উত্তরার্দ্ধম-এ মহর্ষি বেদব্যাস বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য অতীব নিপুণ এবং প্রাঞ্জল শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছেন। তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি,—

'...প্রাঙ্মুখস্ত পরিশ্রেশঃ সহাসমাভিঃ সহেশয়া।
ব্রহ্মণাধিষ্ঠিতঃ সব্যে বামপার্শ্বেথ শার্ঙ্গিণা।। ৪।
বীজ্যমানো মহেন্দ্রেণ ঋষিভিঃ পরিতো বৃতঃ!
গণৈঃ পৃষ্ঠপ্রদেশস্থৈর্জোষং তিষ্ঠদ্ভিরাদরাৎ ॥ ৫।
উদায়ুধৈঃ সেব্যমানশ্চাবসন্মানভূরিভিঃ।
ব্রহ্মণে বিষ্ণবে শম্ভুঃ পাণিমুৎক্ষিপ্য দক্ষিণম্ ॥ ৬।
দর্শয়ামাস দেবেশো লিঙ্গং পশ্যত পশ্যত।
ইদমেব পরং জ্যোতিরিদমেব পরাৎ পরম্ ॥ ৭।...'

অর্থাৎ স্কন্দ বললেন, বিশ্বেশ্বর দারাপত্যের সঙ্গে পূর্বাস্য হয়ে সেখানে উপবেশন করলে তাঁর বামে ব্রহ্মা, দক্ষিণে বিষ্ণু ও দেবর্ষিগণ উপবেশন করলেন। জনে জনে নিজের নিজের অস্ত্রাদি ধারণ করে তাঁর পেছন দিকে নিজের নিজের কাজে রত হলেন। দেবরাজ সুচারুভাবে চামর বীজন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বিশ্বেশ্বর

একটি অনাদি লিঙ্গকে নির্দেশ করে হরি ও বিরিঞ্চিকে বললেন, হে কমললোচন! হে চক্রপাণে। সামনে ঐ যে অনাদিলিঙ্গ, প্রত্যক্ষ করছো উনি পরম জ্যোতির্ময়। উনি পরাৎপর, স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক, আমার স্বরূপ এবং উনিই সর্বসিদ্ধিদাতা, আর এই যে পাশুপত শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণকে দেখছো, এরা সকলেই বালব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয়, রুদ্রভক্ত, মহাতাপস, বেদপুরাণ ও ইতিহাসের তত্ত্বজ্ঞ, সিদ্ধ, শমদমাদিগুণে সমলঙ্কৃত, সংযতাত্মা, লিঙ্গার্চ্চন-নিয়ত বিহিত-স্নান ও বিভূতি ভূষণে সমধিক পবিত্র, সত্যভাষী তত্ত্বদর্শী, কন্দমূলফলাশী, জিতক্রোধ, জিতমোহ, জীবন্মুক্ত, নির্বিকল্প, নিরাময়, নির্দ্বন্দ্ব, নিরহঙ্কার, নিষ্প্রপঞ্চ, নিরাতঙ্ক, নির্ম্মল, নিষ্পাপ, নিষ্পরিগ্রহ ও সর্ব্বজ্ঞ। এরা আমার পুত্রবৎপ্রিয়, মৎপরায়ণ ও মৎস্বরূপ। উহাদিগকে পূজা করলেই আমি পূজিত হই। এই মহাত্মাগণকে ভক্তিযোগে ভোজ্য দান করলে প্রত্যেকটিতেই কোটিগুণ ফল লাভ হয়।

ব্যাসদেব আরও লিখেছেন—

> 'সর্ব্বেষাং সর্ব্ব সিদ্ধীনাং কর্ত্তা ভক্তিজুষা মিহ।
> অহং কদাচিচ্ছশ্ঃ স্যামদৃশ্যঃ স্যাং কদাচন ॥ ২৭।
> আনন্দকাননে চাত্রস্বৈরং তিষ্ঠামি দেবতাঃ।
> অনুগ্রহায় সর্ব্বেষাং ভক্তানামিহ সর্ব্বদা ॥ ১৮।...'

অর্থাৎ হে দেবর্ষিগণ! আমি লিঙ্গরূপে এই আনন্দবনে সর্বদা স্বচ্ছন্দ বিহার করি। কি জঙ্গম, কি স্থাবর এ সকলই আমার রূপান্তর; আমিই বিশ্বেশ্বর ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে যদিও যথেচ্ছ গমন করি, তথাপি লিঙ্গরূপে এক নিমেষের জন্যেও কাশী পরিত্যাগ করে অন্যত্র অবস্থান করি না। সমস্ত লিঙ্গের তুলনায় বিশ্বেশ্বর লিঙ্গই সকলের তুলনায় উৎকৃষ্ট। যেখানে যত লিঙ্গ আছেন এই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের দর্শনের জন্যে তারা সকলে প্রতিদিনই এই কাশীধামে আসেন। পৃথিবীতে সমস্ত লিঙ্গে আমার আবির্ভাব আছে বটে, কিন্তু এই লিঙ্গই আমার বিশেষ

অবস্থান স্থান। যারা ভক্তিভাবে এঁকে একবার মাত্র দেখেছে তারাই আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছে। যারা একমাত্র এই অনাদি-লিঙ্গের নাম শোনে, তারা সমস্ত পাপ হতে পরিত্রাণ পায়। এঁর নাম স্মরণ করা মাত্র দু'জন্মের পাপ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এঁর দর্শনের জন্যে যাত্রা করলে তিন জন্মের পাপ হতে তখুনি মুক্তিলাভ হয়। এঁকে দেখলেই আমার অনুগ্রহে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। এবং এঁকে স্পর্শ করামাত্র সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফল হয়ে থাকে। এঁকে এক গণ্ডুষ জল ও একটি পুষ্প দান করলে শত স্বর্ণ পুষ্পদানের ফল পাওয়া যায়। যথোপচারে ভক্তিসহকাবে এঁর পূজো করলে সহস্র স্বর্ণ পুষ্প প্রদানের ফল পাওয়া যায়। পঞ্চামৃত দ্বারা পূজো করলে এঁর অনুগ্রহে চতুর্বর্গ লাভ কবতে পারা যায়। বস্ত্রপূত জলে এঁর অভিষেক করলে লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। সুচারু চন্দনে সুগন্ধি ধূপে এবং ঘৃত সংযুক্ত প্রদীপে যিনি এই লিঙ্গের পূজো কবেন, ইনি তাঁকে জ্যোতির্ময় বিমান প্রদান কবেন এবং দেবাঙ্গনাগণও তদীয় অঙ্গের দিব্যগন্ধ সম্পাদনার্থ অগুরু কর্পূবপূবিত আলোকে এঁকে পবিতৃপ্ত করলে ও নানাপ্রকার নৈবেদ্য প্রদান করলে ঐ নৈবেদ্যর ফলাফলে কর্পূরের মত শুভ্র কলেবর ও ত্রিলোচনত্ব লাভ করে যুগে যুগে কৈলাসধামে বাস করতে পারা যায়। এঁকে ঘৃতশর্কর সঙ্গে পবমান্ন প্রদান করলে দেবলোক, পিতৃলোক, মর্তলোক প্রভৃতি সকলকেই পরিতৃপ্ত করা হয়। এঁর প্রীতির জন্যে মুখবাসাদি প্রদত্ত হলে তার জন্যে যে পুণ্য লাভ হয়, তার সংখ্যা করতে পারা যায় না। বরং রত্নাকরের রত্নেরও সংখ্যা হতে পারে কিন্তু এব সংখ্যা হয় না। এঁকে গরুড়—প্রতিমূর্তি লাঞ্ছিত ঘণ্টা ও অন্যান্য পূজোপকরণ প্রদান করলে সেই দাতার হরধামে বাস হয়। নৃত্য, গীত, অথবা বাদ্য দ্বারা যিনি এঁব তুষ্টি সম্পাদন করেন, আমি তাকে মনোহর তৌর্যত্রিক নিনাদে সদা পরিতৃপ্ত করি। যিনি বিচিত্র ব্যাপারে এই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের প্রাসাদ বিচিত্ররূপে চিত্রিত করেন আমি তাকে বিচিত্র স্বীয় ধাম

প্রদান করে পরম সুখী করি। যিনি বিশুদ্ধচিত্তে ভক্তিভাবে এঁকে একবার মাত্র প্রণাম বা দর্শন করেন, ধনসম্পত্তি কি মান সম্পত্তি এবং মোক্ষ সম্পত্তিও তাঁর পক্ষে দুর্লভ হয় না। যিনি বিশ্বেশ্বর নাম সর্বদা মুখে কীর্তন করেন ও কানে শোনেন এবং যিনি হৃদয়ে বিশ্বেশ্বরের রূপ অনুক্ষণ ধ্যান করেন তাঁর আবার জন্ম কোথায়। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে হে বিশ্বনাথ! হে বিশ্বেশ্বর এই মন্ত্র জপ করে এবং যে এঁকে প্রতিক্ষণ ধ্যান করে, আমি তাকে অত্যুৎকৃষ্ট গণত্বপদ প্রদান করে তারই নাম ত্রিসন্ধ্যা জপ করে থাকি। মানবাদি ঋষিগণ এবং দেবগণেরও অবশ্য পূজনীয় এই লিঙ্গকে যারা স্মরণ বা দর্শন না করে, তাদিগকেই বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করে কাল—কবলে পতিত হতে হয়। হে দেবগণ! এই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের আশ্চর্য্য মহিমা, এঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আর ত্রিলোক মধ্যে নেই। ভূলোকে নেই, তপোলোকে নেই, সত্যলোকে নেই, কৈলাসে নেই, বৈকুণ্ঠে নেই, রসাতল মধ্যেও নেই, এঁর দর্শনে দিক্‌পালদের পদ হতেও উৎকৃষ্ট পদ লাভ করে দেবগণেরও নমস্য হতে পারা যায়। হে দেবগণ! ঐ বিশ্বনাথের সমান আশ্চর্য্য মহিমাসম্পন্ন লিঙ্গ ও মণিকর্ণিকাতুল্য তীর্থ এবং আনন্দবনতুল্য পরম পবিত্র তপোবন আর কোথাও নেই। অতএব হে দেবগণ। তার জন্যেই আমি সর্বাঙ্গ-সুন্দর এই কাশী ও মণিকর্ণিকায় সর্বদা সুখে অবস্থান করি।

সেই পুণ্য কাশীধামের পবিত্র শ্মশানঘাট।

ঘাটে দাহ করাব জন্যে এক মৃত ব্রাহ্মণের শবদেহ আনা হয়েছে। ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান।

তার সঙ্গে তার পতিব্রতা স্ত্রীও এসেছে। ইচ্ছে, স্বামীব সঙ্গে সহমরণে যাবে। পতিহীনা জীবন অসার। এ ছার জীবন রেখে কি লাভ? ইহকালের প্রিয়তম সঙ্গী পতি যখন চলে গেল তখন আর বেঁচে থেকে লাভ কি!

মহা ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করছে পতিপ্রাণা স্ত্রী বারাণসীর পবিত্র শ্মশানঘাটে। মৃত পতির সহযাত্রিনী হবে। লাভ করবে অক্ষয়

পুণ্য—আনন্দময় স্বর্গ; বিশেষ করে এই কাশীধামে দেহ রাখলে। কারণ লোকে বলে, এখানে এসে দেহ রাখলে জীব সশরীরে স্বর্গ লাভ করে।

সিঁথার সিঁদুর আর মুছতে হবে না। পরতে হবে না বৈধব্যের শ্বেতবস্ত্র। সহ্য করতে হবে না সমাজের ঘরোয়া নিপীড়ন, মানতে হবে না খুঁটিনাটি আচার বিচার—ব্রতোপবাস।

স্ত্রীলোকটির মনে সংসারে ফিরে যাবার স্বপ্ন নেই। আছে অনন্ত আনন্দের দেশে পাড়ি জমাবার দুরন্ত কৌতূহল আর আশার ঝলকানি।

মৃত স্বামীর শবদেহ শ্মশানে এনে রেখেছে গাউনিবা। স্ত্রী বসে আছে শবকে আগলে। মনে করছে, পতি এখনো জীবিত। সে মরে নি। যেন শুয়ে ঘুমুচ্ছে। এখনি ঘুম ভাঙবে। তাকাবে প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখপানে। ডাকবে স্ত্রীকে। বলবে, চলো, আমার সঙ্গে সহমরণে এসে দু'জনে যাই স্বর্গে।

স্ত্রীলোকটি শুনতে পেল, কে যেন পেছন দিক থেকে তাকে ডাকছে।

সেই অশ্রুতপূর্ব কণ্ঠস্বর সে এর আগে কখনো শোনে নি। যেমন গম্ভীর, তেমনি মিষ্টি। এ স্বর দিব্য স্বর। সব শোকের জ্বালা নাশ করে দেয়। এর এমনি গুণ।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো, এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে। মুখে অপরূপ এক প্রশান্ত ভাব। অনিন্দ্যনীয় কোমলতা—অলৌকিক দীপ্তি। সদা হাস্যময় জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে স্ত্রীলোকটি করযোড়ে প্রণাম জানালো মনে মনে।

ধীরে ধীরে মহাপুরুষ এগিয়ে এলেন স্ত্রীলোকটির কাছে। মধুর কণ্ঠে জানালেন, তুই এখানে এসেছিস কেন? মরতে?

এক অস্বাভাবিক শোকজ্বালা স্ত্রীলোকটির হৃদয় মথিত করে আছড়ে পড়লো মহাপুরুষের চরণতলে।

বললো, সংসারে আমার এখন কেউ নেই। আমার সবে ধন

নীলমণি স্বামী ছিল। সে দেহ রেখেছে। আমি এখন একা। আপনার জন বলতে কেউ নেই।

দুঃস্থা শোকানলদগ্ধা স্ত্রীলোকটির কাতর প্রার্থনা শুনে মহাপুরুষের অন্তরে করুণার সঞ্চার হলো। সে করুণাধারা পবিত্র জাহ্নবীধারার মত তাঁর সর্বাঙ্গ আলোড়িত করে পদদ্বয় সিক্ত করতে লাগলো। পরে তা প্রকাশ পেল তাঁর পবিত্র লীলামাধুরীতে।

মহাপুরুষ তাঁর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মৃত স্বামীর নাভি স্পর্শ করলেন।

স্বামী প্রাণ ফিরে পেল। এতক্ষণ যে লোক মরণের পারে চলে গেছলো এখন মহাপুরুষের কৃপা লাভ করে সে আবার নবজীবন লাভ করলো।

স্ত্রী তখন বিস্ময়ে অবাক, এ কি! এ কেমন করে সম্ভব হলো?

মহাপুরুষের শ্রীচরণে আহত বিটপীর মত পড়ে গেল। ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বললো, বাবা, তুমি সাক্ষাৎ দেবতা। তা নাহলে এমনি হয়!

মুক্ত পুরুষ সহাস্যে বললেন, নারে, না। আমি দেবতা নই। আমি মানুষ। আমি তোদের মতই মানুষ।

তারপর সবিনয় কণ্ঠে বললেন, এবার তোর স্বামী বেঁচে গেছে। যা বাড়ী যা। আর কান্নাকাটি করিস নি।

মহাপুরুষ সে স্থান ত্যাগ করলেন।

ধন্য হলো স্ত্রীলোকটি তাঁর পদসেবা করে। আর ধন্য সে মহাপুরুষের অযাচিত কৃপা লাভ করে। ক'জনের ভাগ্য এমনধারা সুপ্রসন্ন হয়? এ যেন সাক্ষাৎ বিশ্বনাথের পদস্পর্শ। শরীরকে স্পর্শ করা মাত্র ফিরে পেল প্রাণ। অমর দেবতার অমৃতময় কৃপাবর্ষণ যেন। সেই কৃপায় মৃত ব্যক্তিও ফিরে পেল প্রাণ।

কত লোক মরে। শ্মশানে তাদের মৃতদেহ নিয়ে আসে। কিন্তু বেঁচে যায় ক'জন? মরা মানুষ জীবন ফিরে পায় কি? আর

কে ফেরাবে জীবন? তেমন ক্ষমতা আছে কার? একমাত্র তৈলঙ্গ-স্বামী তাঁর অলৌকিক দৈবশক্তির বলে সে দুরূহ কাজ সুসম্পন্ন করতে পারতেন।

আর একদিন তৈলঙ্গস্বামী গুপ্ত কাশী মন্দাকিনী তীরে অবস্থান করছিলেন। ঐ কাশীতে নারায়ণের মন্দির আছে। সেখানে সদাসর্বদা আগুন জ্বলে। সেই পবিত্র অগ্নিশিখায় স্বামিজী জপতপ করতেন।

এক দিন ঐ মন্দিরের সামনে স্বামিজীর কাছে এক ব্রাহ্মণ এসে হাজির।

সে পঙ্গু। দু'টি পা অবশ। চলৎশক্তিহীন। বাবার কাছে এসেছে মহাকৃপা লাভের অদম্য আশায়—আকাঙ্খিত হৃদয়ে।

দয়াময় তৈলঙ্গস্বামীর পদতলে পড়ে গেল। আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে জানালো, বাবা, আমায় কৃপা করুন। আপনি দয়া করে আমার ব্যাধি ভাল করে দিন।

বৈদ্যর বৈদ্য মহাবৈদ্য রয়েছেন ব্রাহ্মণের কাছে। সুতরাং তার আর ভয় কিসের? রোগ সেরে যাবে। বাবার দিব্য স্পর্শে সব রকম ব্যাধি দূর হবে। মনের ব্যাধি—দেহের ব্যাধি, সব ব্যাধি।

বাবা তখন ওপব দিকে দু'হাত তুলে পঙ্গু ব্রাহ্মণের দু'টি পা চেপে ধরলেন নিজের দিব্য চরণস্পর্শে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বুঝতে পারলো সে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠেছে।

চারদিকে মহা কোলাহল হতে লাগলো। বহুলোক দৌড়ে এলো বাবার কাছে। বাবাকে ধরলো। বললো, আপনি একজন অলৌকিক পুরুষ। আপনি কৃপা করুন। আমার বৌয়ের অসুক। তাকে ভাল করে দিন।

কেউ বা সাশ্রুনয়নে আকুলিত হৃদয় দিয়ে বললো, আমার ছেলের ব্যাধি। তাকে বাঁচান।

সেদিন বাবা আর কাউকে কৃপা করলেন না। চলে গেলেন

অন্যত্র। লোকালয় থেকে চলে এলেন নির্জন জায়গায়। সেখানে মনোরম তৃপ্তি—অখণ্ড শান্তি। সাধনার আদর্শ স্থান—দেবতার মন্দির। লোকালয়ে তো বিষয়ী লোকেদের ভীড়। সেখানে তাঁর মত লোক থাকবে কেন? তাই তিনি বিষয়ী লোকসঙ্গ এড়িয়ে থাকবার জন্যে অন্যত্র চলে গেলেন।

কে এই মহাপুরুষ? কিবা তাঁর পরিচয়?

এই মহাপুরুষের নাম তৈলঙ্গস্বামী। দক্ষিণ ভারতের স্বনামধন্য স্থান ভিজাগাপট্টম। সেখানে হালয়ানা গ্রামে তৈলঙ্গস্বামী আবির্ভূত হন। তেলেঙ্গীদের দেশের মানুষ বলে তাঁর নাম ছিল তৈলঙ্গস্বামী। আবার তাঁকে ত্রৈলিঙ্গস্বামীও বলা হতো। কারণ তিনি ছিলেন পুং, স্ত্রী ও ক্লীব লিঙ্গের অতীত।

পিতামাতার বৈষয়িক অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়।

তৈলঙ্গস্বামীর মাতার নাম বিদ্যাবতী। পিতার নাম নৃসিংহধর। নৃসিংহধরের দুই স্ত্রী। বিদ্যাবতী তাঁর প্রথমা স্ত্রী। অনেকদিন যাবৎ বিদ্যাবতীর গর্ভে কোন সন্তান হচ্ছে না দেখে নৃসিংহধর বড় চিন্তায় পড়লেন।

পতিপ্রাণা বিদ্যাবতী তাঁর মনের কথা জানতে পারলেন।

দেবোপম স্বামীকে বললেন, তুমি আবার বিয়ে করো।

মিষ্টভাষী নৃসিংহধর বললেন, তা কেমন করে সম্ভব?

বিদ্যাবতী বললেন, তা সম্ভব। আমার কোন দুঃখ হবে না। তুমি বিয়ে করলে আমি সুখী হবো।

একথা শোনা সত্ত্বেও নৃসিংহধর রাজী হলেন না। পতিপ্রাণা এবং ধর্মশীলা স্ত্রী বিদ্যাবতীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

অবশেষে শুভদিন দেখে আর একবার দার পরিগ্রহ করলেন নৃসিংহধর। বেশ সুন্দরী স্ত্রী। ধর্মপরায়ণা। পতিপ্রাণা।

কিছুদিন পরে দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র হলো। এদিকে বিদ্যাবতী বড় মুসড়ে পড়লেন। গৃহদেবতা অনাদি অনন্ত শঙ্করের

মন্দিরে এসে একমনে প্রার্থনা জানালেন, ঠাকুর আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো। আমার কোলে একটি পুত্রসন্তান দাও।

এই প্রার্থনাতেও কোন ফল হলো না।

কোন পুত্রসন্তানের চাঁদমুখ দর্শনের সৌভাগ্য হলো না তাঁর। নারী হয়ে জন্মেছেন। পুত্রহীনা নারীর জন্ম যে বৃথা। নারীর জীবন সার্থক হয় জননীর রূপবৈচিত্রে।

কিন্তু ভাগহীনা বিদ্যাবতী আজও পর্যন্ত পুত্রসন্তানের স্নেহানন দর্শনসুখ হতে বঞ্চিতা।

ঠাকুরের তুষ্টি সাধনের জন্যে বিদ্যাবতী একবার ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করলেন।

ব্রাহ্মণরা এলেন। আহার করলেন। কিন্তু দান গ্রহণ করলেন না।

তাঁরা বললেন বিদ্যাবতীকে, যে নারী নিঃসন্তান তার দান ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করবে না।

তাই শুনে বিদ্যাবতী মরমে মরে গেলেন। অন্তরে দুঃখের অন্ত রইলো না। ভাবলেন এতো আশা করে ব্রত করলুম। তাও দেখছি অনর্থ ঘটেছে। এ যে অসহ্য। ভগবান শংকর কি এমনি বিরূপ হলেন?

ওদিকে তাঁর সতীন পুত্রবতী। তার দান ব্রাহ্মণরা আনন্দে গ্রহণ করেছে। এ দৃশ্য বড় মর্মন্তুদ বোধ হলো দেবী বিদ্যাবতীর কাছে।

কিছুতেই এই দুঃখ সইতে পারলেন না তিনি। শংকরের মন্দিরে এসে কাতরভাবে প্রার্থনা জানালেন। লুটিয়ে পড়লেন দেবাদিদেব শংকরের পুণ্য পাদপীঠে। জানালেন মহাকালের কাছে অন্তরের একান্ত আকুতি, ঠাকুর আমার দিকে মুখ তুলে চাও। কৃপা করো আমায়। আমায় একটি পুত্র দাও।

এবার বোধহয় দেবাদিদেব শুনলেন তাঁর প্রার্থনা।

ভক্তের কাতর আবেদন কি ব্যর্থ হয়? ভক্ত আর ভগবান যে অভেদ।

ভক্তের প্রাণ কাঁদলে ভগবান স্থির থাকতে পারেন না। ছুটে আসেন ভক্তের কাছে। পূর্ণ করেন প্রার্থনা।

অতি শীঘ্র প্রার্থনা পূর্ণ হলো সতী বিদ্যাবতীর। কয়েক মাস পরে তাঁর কোল আলো করে এক সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হলো।

এর কিছুদিন পূর্বে বিদ্যাবতী দেখলেন এক অলৌকিক ঘটনা।

তিনি মন্দিরে এসে শংকরের আরাধনা করছিলেন। এমন সময় এক শিশু এসে বসলো তাঁর কাছে। বললো, আমায় ঠাকুরের প্রসাদ দাও।

নধরকান্তি হাস্যানন অলৌকিক ও দিব্য লাবণ্যভরা শিশুটিকে দেখলে মনে হয়, সে কোন দেবশিশু এসেছে স্বর্গ হতে মর্ত্ত্যের বার্তা সংগ্রহ করতে।

তিনি শিশুটিকে দেখে খুসী হলেন।

তারপর বললেন, তুমি মন্দিরের বাইরে বসো। আমি প্রসাদ আনছি।

শিশুটি বসে রইলো। ওদিকে বিদ্যাবতী মন্দিরে গিয়ে বাবা ভোলানাথের প্রসাদ নিয়ে এলেন।

মন্দিরের বাইরে এসে দেখলেন, শিশুটি সেখানে নেই। একি হলো? এ যে বড় তাজ্জব কাণ্ড!

বিস্মিত হন বিদ্যাবতী। স্বামীর কাছে এসে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, একি দেখলুম দেব! একটি দেবশিশুর মত বালক আমার কাছে এসে প্রসাদ চাইলো। আমি তাকে মন্দিরের বাইরে বসতে বললুম। তারপর প্রসাদ আনতে আমি মন্দিরের ভেতরে গেলুম। প্রসাদ হাতে নিয়ে বাইরে এসে দেখি, শিশুটি আর ওখানে নেই।

নৃসিংহধর বললেন, তুমি শিগ্‌গীর সন্তানের জননী হবে।

বিদ্যাবতীর মন আনন্দে ভরে উঠলো। ভাবলেন, স্বামীর কথা কি সত্যি! তাঁর আশা কি সফল হবে?

এই ব্যাপারটা পরে তিনি পতিকে জানালে তিনি জবাব দিলেন, এ তোমার একান্ত শিবপূজোর ফল। শিবের বরে তুমি একে পেয়েছো। এইটাই ঈশ্বর তোমাকে বুঝিয়ে দিলেন। এতে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই।

সেদিনই বিদ্যাবতী স্বপ্নে দেখলেন, একটি শ্বেত হস্তী তাঁর অন্তরে প্রবেশ করলো।

এও একটি সুলক্ষণ।

কিছুদিন পরে তিনি স্বামীর ভবিষ্যৎবাণী অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করলেন। তাঁর আশা এতদিনে পূর্ণ হয়েছে। বুঝি অন্তর্যামী বিশ্বনাথ তাঁর অন্তরের কথা শুনেছেন—মিটিয়েছেন মনের বাসনা।

ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান শঙ্কর স্বল্প তপস্যায় সন্তুষ্ট হন। দেবী ও সতী বিদ্যাবতীর অনাবিল হৃদয়ের আকুতি তিনি শুনলেন। পূরণ করলেন বাঞ্ছা একান্ত শরণাগত—আশ্রিতজনের।

প্রথমা স্ত্রী পুত্রলাভ করেছেন। তাই শুনে নৃসিংহধর কত আনন্দ প্রকাশ করলেন।

বহু লোকজনকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। অনেক রকম উৎসবের আয়োজন করলেন।

বহু লোক এলো। নবজাতককে দেখে মনে প্রাণে আশীর্বাদ জানালো। নৃসিংহধর তাই দেখে খুশী হলেন।

গৃহদেবতা শিবলিঙ্গকে ভক্তি ভরে পূজো করতেন বিদ্যাবতী। পুত্র-সন্তান প্রসবের কিছুদিন পরে অশৌচান্তে প্রথম দিন তিনি শিশুটিকে মন্দিরের বারান্দায় শুইয়ে রেখে শিবলিঙ্গের পূজো করতে লাগলেন। পূজো শেষ হয়ে আসছে এমন সময়ে মা বিদ্যাবতী দেখলেন হঠাৎ শিবলিঙ্গের ভেতর থেকে একটি জ্যোতি অগ্নিশিখার মত বেরিয়ে এসে সমস্ত মন্দির আলোকিত করে ফেললো এবং নিমেষে বারান্দায়-শোয়ানো শিশুর শরীরের মধ্যে মিলিয়ে গেল। প্রথমে তিনি ভয় পেলেও পরে শিশুর কাছে এসে দেখলেন যে তার শরীর ঘিরে দিব্যজ্যোতির প্রকাশ হচ্ছে।

বিদ্যাবতীর মুখে হাসি আর ধরে না। এতদিন পরে গৃহদেবতা শংকরের আশীর্বাদে তিনি পুত্রবতী হয়েছেন। নারীজন্ম সার্থক হয়েছে।

এবার পাড়াপড়শীদের কাছে মুখ রক্ষা হবে। তাঁকে নিয়ে আর কেউ একটা বড় ঠাট্টাবিদ্রূপ করবে না।

বিদ্যাবতীর পুত্র ক্রমশ বড় হতে লাগলো।

অন্নপ্রাশন হলো। জীবনের সুপ্রভাতে অন্নের প্রথম সুস্বাদ গ্রহণ করলো নবজাতক। নামকরণ হলো।

পিতা নাম দিলেন 'তৈলঙ্গধর'।

মাতা নাম রাখলেন, 'শিবরাম'।

'শিবরাম' নামের সঙ্গে তাঁর কাজের যোগাযোগ ছিল। তিনি শিবকে আরাধনা করতেন। তাই ঐ নাম তাঁর বড় পছন্দ হলো।

ঠিক সময় উপনয়ন সংস্কার হলো তৈলঙ্গধরের। লেখাপড়ায় বেশী মন দিতে পারতো না শিবরাম।

মায়ের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে শংকরের পূজো করতে ভালবাসতো।

তার স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। একবার যা শুনতো তা ভুলতো না।

পিতা তাকে শাস্ত্রপাঠের জন্যে নির্দেশ দিতেন। শিবরাম পাঠের দিকে বেশী মন দিতো না। নির্জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে বসে থাকতো। তার মনে অন্যরকম ভাব দেখা যেত।

পাড়ার অন্যান্য বালকেরা খেলাধূলো আর পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। তারা অন্যদিকে মন দিতো না। কিন্তু বালক শিবরামের মধ্যে অন্যভাব দেখা যেত। সে সাধারণ বালকদের মত লেখাপড়া আর খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে নি। তার জীবনের বেশীর ভাগ সময় ধ্যান ও ঈশ্বর চিন্তায় ব্যয়িত হতো।

মাতা বিদ্যাবতী শিবরামের মধ্যে ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। তিনিও কম ভক্ত ছিলেন না। মন্দিরে গিয়ে অনেকক্ষণ দেবতার

আরাধনায় মগ্ন থাকতেন। সময়সেই তাঁর দেহ ও মনের ভাবান্তর লক্ষ্য করা যেত। একমাত্র শিবরাম ছাড়া আর কেউ তাঁর কাছে যেতে পাবতো না।

বিদ্যাবতী শিবরামের অন্তরে ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। বুঝতে পারলেন, শিবরাম যে সে ছেলে নয়। তার মধ্যে এমন কতকগুলি ভাব বর্ত্তমান যার বলে উত্তরকালে সে একজন মহাপুরুষ হতে পারে।

তাই একদিন শিবরামকে ডেকে বললেন, শিবরাম, তুমি থাকবে না তো আমি জানি। আমি মারা গেলে আমার অন্তেষ্টিক্রিয়া করো। তারপর জানতে চেষ্টা করবে আমি তোমার মত পুত্রলাভের আশায় যে শিবের পুজো করেছি আর সেই সঙ্গে বারো জন ব্রাহ্মণকে খাইয়েছি তার ফল কি হয়েছে। তারপর তুমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করো। এই মাতৃ-আজ্ঞা যেন ব্যর্থ না হয়। তোমার কার্যকলাপ দেখে বুঝতে পারছি, তুমি ধর্মপথের পথিক হতে চলেছ। তুমি সাংসারিক মায়ামোহে আবদ্ধ থাকতে ইচ্ছুক নও। তাতে আমি বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হওয়া দূরের কথা বরং সমধিক আনন্দিত হয়েছি।

শিবরামের মন এমনিই ধর্মপথে অগ্রসর হচ্ছিলো। এরপর মায়ের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লো। অন্তরে ঈশ্বরকে লাভ করার জন্যে তীব্র ব্যাকুলতা দেখা দিলো।

বাড়ীর কাছে একটা বটগাছ ছিল। তার তলায় দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় কাটাতো শিবরাম। ঠিকমত আহার করতো না—ঘুমোতো না। দিনরাত এক চিন্তা, কিসে ঈশ্বরলাভ হবে।

লোকে বলে ঈশ্বর আছেন? কোথায় আছেন তিনি। তিনি দেখতে কেমন? জীবকল্যাণে তিনি সর্বদা মুক্তহস্ত। সদা হাস্যানন —অপরূপ তেজোময় তাঁর রূপ। দেখলে নাকি মন-প্রাণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। সেই অপরূপকে রূপের মধ্যে কিভাবে কল্পনা করা যায়, দেখা যায় কিভাবে?

বিদ্যাবতী বড় চিন্তায় পড়লেন।

তিনি ভাবলেন, পুত্রকে সন্ন্যাসধর্মের কথা বলে বড় ভুল করেছেন। ওকথা না বললে বোধহয় তার মনে এমনধারা পরিবর্ত্তন আসতো না।

আফশোষের অন্ত থাকতো না বিদ্যাবতীর। মায়ামায় মাতৃপ্রাণে জাগলো স্নেহাকর্ষণের হিল্লোলকল্লোল।

এমনিভাবে অশান্তি আর নিরানন্দে কাল কাটাতেন বিদ্যাবতী।

মনে সর্বদা ভয়, এই বুঝি তাঁর সাধের গোপাল—নয়নের মণি শিবরাম ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যায়।

পরে ভাবলেন, এর একটি উপায় আছে। শিবরামের বিয়ে দিলে ও সংসার ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। পত্নীর প্রেমে ধরা পড়ে সংসারে থাকবে চিরদিন।

বিয়ের ব্যবস্থা হলো। মেয়ে দেখা ঠিক হয়ে গেল।

শিবরাম আপত্তি জানালো। বললো, মা, ওকাজ করতে যেও না। আমি বিয়ে করতে পারবো না। সংসারী হবার আমার মন নেই।

বিদ্যাবতী শুনলেন পুত্রের আপত্তির কথা।

বললেন ধীর কণ্ঠে, মানুষ বিয়ে করেও তো ধর্মপথের পথিক হতে পারে। তার বড় সাক্ষী হচ্ছে তোমাদের গৃহদেবতা স্বয়ং শঙ্কর।

শিবরাম আর আপত্তি করলো না। বিয়ে করলো।

সুন্দরী পুত্রবধূকে ঘরে এনে সুখী হলেন বিদ্যাবতী।

শিবরামের বিয়ের খবর ঠিকমত জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন তিনি বিবাহিত আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি আজীবন কুমার ছিলেন।

তাঁর বিখ্যাত চরিতকার ও শিষ্য কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন,—

'মাতৃভক্ত শিবরামের বিবাহ করিতে আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কেবল মাতার অনুরোধে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। মাতা যতদিন

জীবিতা ছিলেন শিবরাম ততদিন সংসারাশ্রমে ছিলেন এবং এক পুত্র ও কন্যালাভ করিয়াছিলেন'।

(মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর জীবনচরিত ও তাঁহার উপদেশ—ওঁস্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী—পৃঃ ১৫)

আবার স্বামীজীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য উমাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন,—'বিদ্যাবতী বহু পূর্ব হইতেই পুত্রের মানসিক ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং তাহাব কার্যকলাপ দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে তৈলঙ্গধর ধর্মপথের পথিক হইতে চলিয়াছে। সে বৃথা সাংসারিক মায়ামোহে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছুক নহে। কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিতা হওয়া দূরে থাকুক বিদ্যাবতী বরং সমধিক আনন্দিতা ছিলেন। সুতরাং তৈলঙ্গধর বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্য বা দুঃখিতা হইলেন না। কিন্তু স্বামীকে তজ্জন্য বিমর্ষ দেখিয়া এক দিবস তিনি তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন, 'তৈলঙ্গধর বিবাহ করিবে না বলিয়া তোমার এত দুঃখিত হইবার কারণ কি? প্রকৃতপক্ষে বিবাহের উদ্দেশ্য কি? যদি বংশ-রক্ষাই বিবাহের উদ্দেশ্য হয় তবে শ্রীধরের বিবাহ দিলেই ত সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। বিবাহ করিতে যখন তৈলঙ্গধরের একান্ত অনিচ্ছা তখন জোর করিয়া বিবাহ দিলে কি তাহার মানসিক প্রফুল্লতা আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে?—কখনই না। বরং তাহাতে আরও বিষময় ফল উৎপন্ন হইবারই সম্ভাবনা। বিশেষতঃ সে যে পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে ভবিষ্যতে বংশধর, কেবল বংশের কেন সমস্ত ভাবতে একটি সমুজ্জ্বল রত্ন হইয়া উঠিবে। জনক-জননীর ইহা কম গৌরবের কথা? সুতরাং তাহার সে কার্য্যে বাধা দেওয়া বা বিন্দুমাত্র বিঘ্ন উৎপাদন করা আমাদের কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। বরং যাহাতে সে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইয়া পরিশেষে সফলকাম হইতে পারে তাহারই যথোচিত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য'। গুণবতী স্ত্রী এইরূপ স্বামীকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া তৈলঙ্গধরের বিবাহ বিষয়ে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন।

নৃসিংহধরও সহধর্মিনীর এতাদৃশ প্রবোধ বাক্যে যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া এইরূপ গুণবান পুত্রের পিতা বলিয়া নিজেকে মহা সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করিলেন। অনন্তর কিছুদিন পরে নৃসিংহধর তাঁহাব দ্বিতীয়া সহধর্মিনীর অনুরোধে শ্রীধরের বিবাহ দিলেন। শ্রীধরের বিবাহে বিদ্যাবতী ও তৈলঙ্গধর উভয়েই পরম আনন্দ লাভ করিলেন।'

(মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীব জীবনচবিত ও তত্ত্বোপদেশ—
উমাচরণ মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ৯—১০)

আবার তৈলঙ্গস্বামীর একমাত্র জীবিতা শিষ্যা শঙ্করী মাতার মতে তিনি ছিলেন আবাল্য ব্রহ্মচারী। কখনো সংসারী হননি। সে যাই হোক বিবাহিত বা অবিবাহিত বহু ব্রহ্মচাবী মহাপুরুষ ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে বিরাজ করছেন। তৈলঙ্গ-স্বামী একজন উচ্চমানের সাধক ছিলেন। বদ্ধ ও ক্ষুদ্রমনা সংসারী জীবের পক্ষে তাঁর অপার লীলারহস্য বোঝা সত্যিই দুঃসাধ্য ও কষ্টকর।

বেশ কিছুদিন চললো শিবরামের সংসার।

শিবরাম এখন দু'টি সন্তানের পিতা। একটি ছেলে, অপরটি মেয়ে।

তবু সংসারে মন বসাতে পারলো না শিবরাম। অথচ সংসার ত্যাগ করতে পারছে না! মা-বাবা বেঁচে আছেন যে। তাঁরাই তো সাক্ষাৎ শঙ্কর আর পার্বতী। তাঁদের ত্যাগ করে কোথায় যাবে? পার্থিব সংসারের যাবতীয় সুখ—স্বাচ্ছন্দ্য—আরাম বিরামের সন্ধান তাঁরা এনে দিয়েছেন। তাঁদের সেই অপরিশোধনীয় ঋণ কি বিস্মৃত হতে পারে শিবরাম। এমন অকৃতজ্ঞ—অর্বাচীন সন্তান শিবরাম নয়!

সংসারে থেকেই ঈশ্বরের দিকে মন রাখলো শিবরাম। সে নাম মাত্র সংসারী। মন কিন্তু উদাসীন সংসারের সব কাজে। মন আসলে পড়ে থাকে বিধাতার শ্রীচরণপদ্মে। তাঁকে স্মরণ করে সংসারের নিরানন্দময় দিনগুলি আনন্দের করে তোলে শিবরাম।

সংসারে মন কিভাবে বসবে শিবরামের। সে যে কাশীর সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ। লোকশিক্ষার জন্যে আসতে হয়েছে। এ বিধাতারই পরম কৃপা। আর আমরা ধন্য তাকে লাভ করে।

ঈশ্বর যে ভক্তের কাছে চিরকাল বাঁধা থাকেন। যে ভক্তিভরে তাঁকে ডাকে তিনি তাঁর কাছে ধরা দেন কখন পুত্ররূপে, কখন কন্যা, কখন বা অন্য কোনরূপে।

বিদ্যাবতীর একান্ত ভক্তির আতিশয্যে বিশ্ববিধাতা অনাদি শঙ্কর স্থির থাকতে পারেন নি। কৈলাসে তাঁর আসন টলে উঠেছিল। তিনি নেমে এলেন মর্ত্ত্যে। ধরণীর ধূলিতে মানবের সাধারণ সংসারে এলেন মানুষের বেশে লীলা করবার জন্যে। মানব নিয়েই তাঁব লীলা। মানবের মঙ্গলের জন্যে তাঁর মানবসংসারে আসা। সুতরাং তিনি মানবছাড়া একতিল থাকতে পারেন না। তিনি মানবকে চান—সংসারকেও চান। এই দু'টি ছাড়া তিনি কি একদণ্ড পৃথক থাকতে পারেন। কখনো তিনি আমাদের মাঝে ছায়ারূপে আসেন, কখনো বা কায়ারূপে। এবাব এসেছেন কায়ারূপে—নরদেহ ধারণ করে।

আকার-নিরাকার, নিত্য-অনিত্য নিয়েই তাঁর লীলা চলে। তিনি সগুণ আবার তিনি নির্গুণ। তিনি এক ও অনাদি আবাব বহু ও আদি।

তাঁর মহিমা অপার, রূপ অচিন্ত্যনীয়। না বুঝিয়ে দিলে সাধারণ অন্নগতপ্রাণ মর্ত্ত্যের মানুষ বুঝতে পারে না। ধরতে পারে না লীলাময়ের রহস্যভরা লীলা।

নৃসিংহধর অকস্মাৎ পীড়িত হয়ে পড়লেন।

শিবরামের বয়স তখন চল্লিশ। সংসারে বিশেষ মন বসলো না। নামমাত্র সংসার করেছে। মন আসলে পড়ে রইলো ঈশ্বরের পাদপদ্মে।

সংসার অনিত্য। সাংসারিক সুখও তাই নিত্য নয়। আজ আছে কাল নেই।

পিতার অসুখ দেখে বিন্দুমাত্র দুঃখবোধ করলো না শিবরাম। তাঁর সেবায় লেগে গেল বেশ কিছুদিন। তাই ঈশ্বরের দিকে ঠিক ঠিক মন রাখতে পারলো না।

'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম পিতাহি পরমং তব······'

পিতারূপে সাক্ষাৎ দেবতার সেবায় দিনরাত যুক্ত হলো।

অক্লান্ত সেবা করলো শিবরাম। পিতা আর বাঁচলেন না। দেহ রাখলেন।

মাতা বিদ্যাবতী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। শিবরাম তাঁকে বোঝালো। বললো, মা তুমি দুঃখ করো না। বাবা চলে গেলেন। আমি তো আছি। তোমাকে দেখবো। তুমি যদ্দিন বেঁচে থাকবে তদ্দিন আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

বিধবা বিদ্যাবতী শিবরামকে বুকের মাঝে চেপে ধরে বললেন, সত্যি বলছো, আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না? আমি যদ্দিন বেঁচে থাকবো তদ্দিন আমার কাছে থাকবে?

শিবরাম অক্লেশে ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ। আমি থাকবো।

বিদ্যাবতী হেসে বললেন, তাই যেন সত্যি হয়। আমি মলে তুমি যেখানে ইচ্ছে যেও। ঈশ্বরকে নিয়ে থাকতে তুমি ভালবাসো। আমি মলে তিনিই তোমার জীবনপথে পরম সহায় হবেন। তিনি তোমার কল্যাণ করুন।

গলায় কাপড় দিয়ে করযোড়ে প্রণাম জানালেন বিদ্যাবতী ঈশ্বরের উদ্দেশে। দু' চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগলো। অন্তরের আকুতি মূর্ত হয়ে উঠলো অশ্রুজলে।

শিবরাম নিজের কাপড়ের খুঁট দিয়ে মায়ের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বললো, মা আমায় আশীর্বাদ করো। আমি যেন দিন দিন আমার ইষ্টকে পাবার জন্যে সেই পথে এগুতে পারি।

মা, বললেন, তাই হোক। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক।

আশীর্বাদ জানালেন বিদ্যাবতী। সতীসাধ্বী বিদ্যাবতী। সাক্ষাৎ জগজ্জননীর পুণ্য আশীর্বাদ। মাই হলেন শিবরামের আদি গুরু।

তিনি অমন পুত্রকে আশীর্বাদ না করে যে পারেন না। গুণী ও ভক্ত পুত্র। তিনি তাঁর মনের বাসনা জানতেন। বাল্যকাল থেকে তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন। তাই তাঁর অবর্তমানে পুত্র যদি ধর্ম-পথে এগুতে চায় তো ভাল। কিন্তু তাঁর পুত্রবধূ বা ছ'টি নাতিনাতনীর কি হবে? সেই তো হচ্ছে এক সমস্যা। তবে ঈশ্বর আছেন মাথাব ওপরে। তিনি ওদের দেখবেন। তিনি যে লীলাময়। জীব ও তার সংসারকে নিয়ে তাঁর বিচিত্র লীলার প্রকাশ। তাঁর হাতে সব কিছু সমর্পণ করলে তিনিই দেখেন।

গীতায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন লীলাময় পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণ,—

> 'মন্মনা ভব মদভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
> মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রেয়োঽসি মে॥
> সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামী মা শুচঃ॥'

অর্থাৎ—আমাতে মনপ্রাণ অর্পণ করো। আমাকে স্মরণ করো। আমি নিশ্চয় করে বলছি, তুমি আমার প্রিয়।

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে আমাকেই স্মরণ করো। আমি তোমাকে সর্বপাপ হতে মুক্ত করবো। তুমি শোক করো না।

জীবকে লীলাময় ঈশ্বব দিয়েছেন এতবড় প্রতিশ্রুতি। এর চেয়ে বড় জিনিস—প্রিয় ধন আর কে দিতে পারে!

সকলের কল্যাণকারী দয়াময় ঈশ্বরের কথা ভেবে সান্ত্বনা পেলেন বিদ্যাবতী।

পিতা নৃসিংহধর মারা যাবার পর দশ বছর কেটে গেল।

এবার মাতা বিদ্যাবতীর দেহ রাখার সময় এসেছে। তিনি চলে যাবেন অমৃতধামে। মহাযাত্রা আসন্ন। যাবার আগে প্রিয় পুত্র শিবরামকে আশীর্বাদ করলেন। স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর অন্তিম বাসনা—পূর্ব্বেকার কথা।

তারপর ইহলোক ত্যাগ করলেন পুত্রের প্রিয়মুখ নিরীক্ষণ করে।

মা দেহ রাখলেন। শিবরাম সেই নশ্বর দেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করে এলো। দশ বছর আগে ঠিক এমনিভাবে একই জায়গায় পিতৃদেবের মরদেহ সৎকার করেছিলো।

মরণের ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়লো।

একটা নয়, আধটা নয়—দু' দুটো দৃশ্য। এবার সংসারের প্রতি পূর্ণভাবে উদাসীন হয়ে উঠলো শিবরাম।

শ্মশানের চিতার সামনে বসে বসে দেখলো অপরূপ এক রূপ। যে মানবদেহ এতদিন সংসারে থেকে বিচিত্র লীলা করে গেল, হাসিকান্নায় ভরিয়ে গেল সংসারের চতুর্দিক, আজ সেই চঞ্চল দেহ স্থির ও নিস্ফল হয়ে জ্বলন্ত পাবকের লেলিহান শিখায় বিলীন হয়ে গেল। এ কি বিচিত্র ধরণ এই মানবসংসারে! হায় ভগবান, ধন্য তুমি! ধন্য তোমার লীলাবৈচিত্র্য।

এই যদি মানবশরীরের পরিণাম হয়, ভাবলো শিববাম, তাহলে এ শরীর সংসারে রেখে লাভ কি—লাভ কি তার গাঁটছড়ায় আবদ্ধ হয়ে। তার চেয়ে বরং সকল লীলার পেছনে যিনি আছেন সেই লীলাময় ভগবানেব শরণাপন্ন হওয়া শ্রেয়।

বাড়ী ফিরে গেল না শিবরাম।

শ্মশানে ভস্ম মেখে দিন কাটাবে ঠিক করলো। স্মরণ করবে দেবাদিদেব শঙ্করকে। যিনি শ্মশানচারী। যিনি অনাদি ও মঙ্গলময়। জীবের মুক্তি, সিদ্ধি ও ঋদ্ধিদাতা।

বড় ভাই শ্রীধর এলেন। তাঁর সহধর্মিনীও। অনেক করে বোঝালেন শিবরামকে। বললেন, সংসারে ফিরে গিয়ে আনন্দে বিষয়সুখ ভোগ করো। এভাবে এখানে থেকো না। তুমি সংসারী। তোমার এ কাজ ভাল দেখায় না।

কে কার কথা শোনে। শিবরাম নির্বিকার রইলো। কারও কথা কানে নিলো না। মার কথা মনে করে নিজের ব্রতে অটল রইলো।

অগত্যা শ্মশানের কাছে ওর জন্যে ঘর তৈরী হলো। সেখানে

ও একাকী বাস করতে লাগলো। সারা দিনটা ঈশ্বরের আরাধনায় কাটিয়ে দিতো। এখন থেকে ঈশ্বরই তার পরম নির্ভর—প্রিয়তম সাথী।

বড় ভাই শ্রীধরকে ডেকে বললো, আর কেন এখানে থেকে বৃথা কষ্ট পাও। বাড়ীতে ফিরে যাও। সেখানে যাকিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে তা তুমি ভোগ করো। আমার স্ত্রী ও পুত্র তোমার কাছে থাকবে। ওদের দেখো। আমার ওসব বিষয়ে বা ধনসম্পত্তিতে কিছুমাত্র দরকার নেই। আমি আর বাড়ী ফিরবো না। এ পাপ সংসারে আর থাকবো না। মায়াময় সংসার আমার কাছে কণ্টকাকীর্ণ বলে মনে হচ্ছে। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ নিয়ে সংসারে আর অনিত্য সুখে বৃথা মজবো না। যা নিত্য ও অবিনশ্বর এবং যে সুখের আদিঅন্ত নেই, যাকে পেলে আর কিছু পাবার আশা থাকে না, অশান্তি যার কাছে আসতে অক্ষম, আমি তাঁরই স্মরণ নিচ্ছি। আমাকে আর বাড়ী ফেরার জন্যে অনুরোধ করো না।

শ্মশানের ধারে বসে শিবরাম যোগাভ্যাস করতে লাগলো। মায়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে থাকে। তার মনের একান্ত বাসনা ছিল, মা দেহ রাখলে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। কিন্তু মা তাকে একবার বললেন, আমার যখন ছেলেপুলে হলো না তখন গৌরীশঙ্করের আরাধনা ও নিয়ম করে বারোটি ব্রাহ্মণ সেবা করেছিলুম। কিন্তু বারোটি ব্রাহ্মণ সেবার যে কি ফল তা আমি জানি না। শিবরাম, তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কবার আগে তা জেনে সন্ন্যাস নিও। আর তুমি জানলেই আমার ফল হবে। আমার এই অনুরোধ।

মার ঐ কথা মনে পড়লো শিবরামের। সে একাধিক্রমে দশ বছর কাটালো মাতৃশ্মশানে।

শ্মশানে বসে প্রতিদিন শিবের ধ্যান করতো। তাইতে পেত অপার শান্তি—আনন্দময় অনুভূতি।

এবার ঠিক করলো, দেশবিদেশ ঘুরে বিভিন্ন পণ্ডিতদের কাছে যাবে। জিগ্যেস করবে মায়ের ব্রাহ্মণ ভোজনের কি ফল।

কাশীতে এলো শিবরাম।

এখানে বহু পণ্ডিতদের সঙ্গে দেখা করলো।

জিগ্যেস করলো তাঁদের, আমার মা বারোটি ব্রাহ্মণসেবা করেছিলেন। তার ফল কি?

তার কথার সদুত্তর দিতে পারেন নি কেউ। একজন পণ্ডিত বললেন, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার কাছে পবিত্র গঙ্গাতীরে উদ্ধারণপুর ঘাট। ঐ ত্রিধারাতে স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নব্যস্মৃতি রচনা করেছেন। তাঁর কাছে যাও। তিনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

কাশী থেকে বর্দ্ধমানের কাটোয়া। তারপর উদ্ধারণপুর ঘাট। সেত অনেক পথ। দুর্গম রাস্তা। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' পেরিয়ে আসতে হবে। তবে মিলবে রঘুনন্দনের সাক্ষাৎ।

কিন্তু শিবরাম যে সত্যসন্ধানী। তার সত্যসন্ধিৎসু মন বাংলায় আসবার জন্যে অধীর হয়ে উঠলো। শত বাধা তার গতিরোধ করতে পারলো না।

তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করে সে এলো উদ্ধারণপুরে।

দেখা হলো রঘুনন্দনের সঙ্গে।

দেখলো, তিনি পুস্তকরচনায় ব্যস্ত।

প্রণাম করলো শিবরাম পণ্ডিত রঘুনাথকে।

রঘুনাথ তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, কি খবর আপনার? আপনি কোথা হতে আসছেন?

শিবরাম বললো, আমি কাশীধাম থেকে আসছি। আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি। আশা করি, আপনি দয়া করে তার উত্তর দেবেন। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে তাতে।

বিনয়ের মিহি সুরে বললেন রঘুনাথ, কি প্রশ্ন আপনার? বলুন। আমি সাধ্যমত তার উত্তর দেবো।

রঘুনাথ অপেক্ষা করতে লাগলেন শিবরামের কথা শোনার

জন্যে। লেখা থামালেন। কলম হাতে রয়েছে। দৃষ্টি কিন্তু পুঁথির ওপরে নেই। শিবরামের মুখপানে রয়েছে।

নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করলো শিবরাম, মশাই দ্বাদশ ব্রাহ্মণসেবার ফল কি?

পণ্ডিত রঘুনন্দন বললেন, একজন ব্রাহ্মণের সেবার ফল বলা যায় না আর বারোজনের ফল কি তা কেমন করে বলবো। তবে আপনি নর্মদাতীরে যান। সেখানে আপনার আশা পূর্ণ হবে।

শিবরাম আবার জিগ্যেস করলো, সেখানে গিয়ে কি করতে হবে বলুন?

নর্মদাতীরে বসে এক হপ্তা মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ করুন, মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠস্বরে বললেন রঘুনন্দন। তারপর দেখবেন, একজন মহাপুরুষ এসে আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর দেবেন।

শিবরাম ভক্তিপ্রণাম নিবেদন করলো রঘুনন্দনকে। তারপর আবার যাত্রা আরম্ভ করলো নর্মদার উদ্দেশে। অনেক দূর পথ। দুর্গম রাস্তা। কাশী থেকে বাংলাদেশ অতি দুর্গম পথ। এ পথ আরও দুর্গম ও ভয়াবহ। তবু যেতে হবে। পথ যে তাকে ডাকছে। সত্য-সন্ধানী শিবরাম কোমর বেঁধে হৃদয়ে সাহস নিয়ে এগিয়ে চললো। গন্তব্যপথে তাকে পৌঁছতেই হবে যেমন করে হোক। আসুক ঝড়, বহুক তুফান, সামনে পড়ুক উত্তাল ঊর্মিমুখর নদী, সুউচ্চ ও দুর্ভেদ্য গিরিপর্বত। তবু যেতে হবে তাকে। সে চলেছে সত্যের সন্ধানে। যতক্ষণ না সেই সত্যে গিয়ে পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ নেই মনে শান্তি, হৃদয়ে নেই আনন্দ।

সত্যের জন্যে দুর্গম পথের শত রকম ক্লেশ সহ্য করতে সে রাজী।

তখনকার দিনে এদেশে রেলপথ ছিল না। পায়ে হেঁটে বা নদীপথে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করতো মানুষজন। তার জন্যে নানা রকম পথক্লেশের অন্ত ছিল না।

শিবরাম সেই দীর্ঘ পথক্লেশ নীরবে সহ্য করলো। পথিমধ্যে

কখনো জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তর, কখনো সূচীভেদ্য অন্ধকারময় হিংস্র জন্তু-পরিপূর্ণ বিশাল অরণ্য, কখনো দুর্ভেদ্য দুর্গম পর্বত, কখনো ভয়াবহ জলপথ, কখনো বা দুস্তর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করতে হলো। শেষ লক্ষ্যে পৌঁছলো অনেক তিতিক্ষা, কষ্ট আর কায়ক্লেশ সহ্য করে।

নর্মদাতীরে একটি নির্জন স্থান নির্বাচন করলো। সর্ব পাপ-বিনাশিনী কুলকুলনাদিনী নর্মদা। শুভ্রজলকণাবিধৌত স্রোতস্বিনী। তার পবিত্র তটে বাস করতে লাগলো শিবরাম। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠতো। নর্মদার পবিত্র জলে অবগাহন করতো। তারপর বসতো চণ্ডীপূজোয়।

একান্ত ভক্তি সহকারে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ করতো। প্রথমেই পাঠ করলো চণ্ডিকার ধ্যান। সর্বকল্যাণময়ী বিশালাক্ষী মহামায়ার ধ্যান বড়ই সুন্দর এবং অপরূপ,—

'ওঁ বন্ধূক-কুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্
স্ফুরচ্চন্দ্রকলা-রত্ন-মুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসাং পীনোন্নতঘটস্তনীং
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ॥
দধতী সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাম্।'

অর্থাৎ—যিনি বন্ধূকপুষ্পবর্ণা এবং শিরোপরি সংস্থিতা, উদীয়মান চন্দ্রকলা যাঁর মুকুটরত্নরূপে বিরাজিত ; যিনি নর-মুণ্ডমালাশোভিতা এবং উন্নত-ঘটবৎ-স্তনযুগলসংযুক্তা, যিনি ত্রিনয়না ও রক্তবসনা, যিনি চার হস্তে যথাক্রমে পুস্তক ও রুদ্রাক্ষমালা এবং বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করেন সেই আগমশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যা মহাদেবীকে নিত্য উত্তমরূপে ধ্যান করবে।

'কালীং রত্ন-নিবদ্ধ-নূপুর-লসৎ-পাদাম্বুজামিষ্টদাং
কাঞ্চী-রত্নদুকুল-হারললিতাং নীলাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্
শূলাদ্যস্ত্রসহস্রমণ্ডিত-ভুজাশূদ্বক্ত্র-পীনস্তনীং
আবদ্ধামৃতরশ্মিরত্নমুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্॥'

অর্থাৎ—যাঁর পাদপদ্মযুগলে রত্নখচিত নূপুর শোভিত, যিনি

মনোভীষ্টদায়িনী, যিনি মেখলা, রত্নময় বস্ত্র ও মণি-হার-পরিহিতা, যিনি নীলবর্ণা, ত্রিনয়নোজ্জ্বলা, সহস্রভুজে শূলাদিঅস্ত্রধারিণী ও ঊর্ধ্বমুখ-স্তনযুগলশোভিতা এবং যিনি অমৃতবর্ষিণী রশ্মিযুক্তা রত্নখচিত মুকুটধারিণী সেই শিবপ্রিয়া কালীকে বন্দনা করি।

'যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিযোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী॥'

অর্থাৎ—যে চণ্ডিকা মধুকৈটভাদি-দৈত্য-নাশিনী, যিনি মহিষাসুর-মর্দ্দিনী, যিনি ধূম্রলোচন-চণ্ডমুণ্ডাসুর-সংহারিণী, যিনি রক্তবীজ-ভক্ষয়িত্রী, যে মহাশক্তি শুম্ভনিশুম্ভাসুর-বিনাশিনী ও শ্রেষ্ঠা সিদ্ধিদাত্রী এবং নবকোটী-সহচরী-পরিবৃতা, সেই জগদীশ্বরী দেবী আমাকে পালন করুন।

'মধ্যে সুধাব্‌ধি মণিমণ্ডপরত্ন-বেদী—
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্‌।
পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্যশোভাং
দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্‌॥'

অর্থাৎ—সুধাসমুদ্রের মধ্যে মণিমণ্ডপস্থ রত্নবেদীস্থিত সিংহাসনে সমাসীনা, উত্তমপীতবর্ণা, পীতবস্ত্রপরিহিতা, স্বর্ণালঙ্কার ও মাল্য-শোভিতা এবং হস্তে মুদ্গর ও শত্রুজিহ্বাধারিণী দেবীর ধ্যান করি।

দু'তিন দিন এমনিভাবে পাঠ করলো চণ্ডী। আহা কি সুন্দর শুনতে। এমনি ভক্তিভাবে পড়তে পারে ক'জন? মায়ের চরণে মন-প্রাণ সমর্পণ করলে তবেই এমন সুন্দরভাবে পাঠ করতে পারা যায়।

শিবরাম মাতৃভক্ত সন্তান।

তাই তার পক্ষে মাতৃকীর্ত্তিগাথা কীর্ত্তন করা এমনি সুন্দর, সহজ আর সাবলীল।

মায়ের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা থাকলে এমনিধারা হয়। শ্রদ্ধাতে

কিনা হয়। মাকে লাভ করা যায়। তাঁর করুণা পেয়ে জীবন ধন্য ও আনন্দময় হয়। মা-ই শক্তি দিলেন শিবরামকে চণ্ডীপাঠের জন্যে। তিনি সর্বত্র সকল মানুষের অন্তরে সতত বিরাজ করছেন।

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা' (চণ্ডী)

মা করুণাময়ী। তিনি ভক্তপুত্র শিবরামের অন্তরে আবির্ভূতা হলেন। শক্তি দিলেন ভক্তকে চণ্ডীপাঠের জন্যে। আবার তিনিই শুনেছেন সে পাঠ ভক্তের সামনে বসে। আহা! কি অপরূপ লীলা! এ যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো।

তাঁর চণ্ডীপাঠ সকলে শুনলো।

বনের হিংস্র জন্তুদল সেই বাঘ, সাপ প্রভৃতি তন্ময় হয়ে শুনলো। তারপর দেখা দিলেন দেবদেবী। একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ এলেন। তাঁব পরণে বাঘছাল। হাতে ত্রিশূল। মাথায় জটাজুট। তারপর তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন গৈরিক-বসনা গৌরী। অপরূপ লাবণ্যময়ী দিব্যকান্তি—দিব্যালঙ্কারভূষিতা দেবীমূর্তি।

প্রতিদিন ওনারা এসে শুনতেন শিবরামের চণ্ডীপাঠ।

শিবরাম ওঁদের দেখে অবাক হয়ে যেত। কি সুন্দর ঐ শান্ত যুগল মূর্তি। কি অপূর্ব জ্যোতির্ময় রূপ। একবার ওদিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। নির্মিমেষ নয়নে চেয়ে থাকতে হয়।

শিবরাম এক হপ্তা চণ্ডীপাঠ করলো। নির্দিষ্ট দিনে পাঠ শেষ হলো।

শেষ দিনে পাঠ করলো নারায়ণী স্তুতি,—

'দেবি প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং
ত্বমেশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥'

অর্থাৎ—হে ভক্তদুঃখহারিণী দেবী, আপনি প্রসন্না হোন। হে নিখিল বিশ্বজননী, আপনি প্রসন্না হোন। হে বিশ্বেশ্বরী, আপনি প্রসন্না হয়ে বিশ্ব পালন করুন। হে দেবী, আপনি চরাচর জগতের অধীশ্বরী।

'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ
আপ্যায্যতে কৃৎস্ন-মলঙ্ঘ্যবীর্যে ॥'

অর্থাৎ—হে অলঙ্ঘ্যবীর্যা, আপনি পৃথিবীরূপে বিরাজিতা বলে একাকিনীই জগতের আশ্রয়স্বরূপা। আপনিই জলরূপে অবস্থিতা হয়ে এই সমগ্র জগৎকে পরিতুষ্ট করেছেন। অতএব আপনি সর্বাত্মিকা।

'ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভূবি মুক্তিহেতুঃ' ॥

অর্থাৎ—হে দেবী, আপনি অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবী শক্তি (বিষ্ণুর জগৎপালিনী শক্তি)। আপনি বিশ্বের আদিকারণ মহামায়া। আপনি সমস্ত জগৎকে মোহগ্রস্ত করেছেন। আবার আপনিই প্রসন্না হলে ইহলোকে শরণাগত ভক্তকে মুক্তি প্রদান করেন।

'বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥'

অর্থাৎ—হে দেবী, বেদাদি অষ্টদশ বিদ্যা আপনারই অংশ। চতুঃষষ্ঠি কলাযুক্তা এবং পাতিব্রত্য, সৌন্দর্য ও তারুণ্যাদিগুণান্বিতা সকল নারীই আপনার বিগ্রহ। আপনি জননীরূপা এবং একাকিনীই এই জগতের অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। স্তবনীয় বিষয়ে মুখ্য ও গৌণ উক্তির নাম স্তুতি। যখন আপনি নিজে সেইসব উক্তিরূপা তখন আপনার এরূপ স্তুতি আর কি হতে পারে?

'সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গ মুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বাং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥'

অর্থাৎ—আপনি সর্বভূতস্বরূপা, স্বর্গ ও মুক্তিদায়িনী এবং প্রকাশ-রূপিণী। এইরূপে যখন আপনার স্তব করা হয় তখন আপনার স্তবের উপযোগী শ্রেষ্ঠ বাক্য আর কি হতে পারে?

'সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—হে দেবী, আপনি সকল ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা এবং স্বর্গ ও মুক্তিদায়িনী নারায়ণী। আপনাকে প্রণাম করি।

'কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—হে দেবী, আপনি কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণমুহূর্তাদি সূক্ষ্ম কাল-রূপে জগতের পরিণামদায়িনী এবং জগতের সংহারসমর্থা শক্তিরূপিণী। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম করি।

'সর্ব মঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—আপনি সর্বমঙ্গলস্বরূপা, সর্বাভীষ্টসাধিকা, একমাত্র শরণ-যোগ্যা, ত্রিভুবনজননী ও গৌরবর্ণা। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

'সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—হে দেবী, আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তিরূপিণী। আপনি সনাতনী ও ত্রিগুণের আধারভূতা অথচ ত্রিগুণময়ী। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

'শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—হে দেবী, আপনি শরণাগত, দীন ও আর্তদের পরিত্রাণ-পরায়ণা এবং সকলের দুঃখ হরণ করেন। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

'হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—হে দেবী, আপনি ব্রহ্মাণীরূপে হংসযুক্ত বিমানে অবস্থিতা হয়ে কমণ্ডুল হতে কুশ দিয়ে জল সিঞ্চন করেন। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

'ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—হে দেবী, আপনি ত্রিশূল, অর্ধচন্দ্র ও সর্প ধারণ করেন এবং মহাবৃষ আপনার বাহন। আপনি মহেশ্বর-শক্তিরূপা। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

'ময়ুব কুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেহনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—হে দেবী, আপনি ময়ূর কুক্কুটবেষ্টিতা মহাশক্তিধারিণী, অপাপবিদ্ধা ও কুমারশক্তিরূপিণী। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

'শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ গৃহীত পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—হে দেবী, আপনি বিষ্ণুশক্তিরূপে চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ এই চার মহা অস্ত্র ধারণ করেন। হে নারায়ণী! আপনি প্রসন্না হোন। আপনাকে প্রণাম।

'গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃত বসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—হে দেবী, আপনি ভীষণ মহাচক্রধারিণী এবং বরাহরূপে জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। আপনি মঙ্গলময়ী। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

'নৃসিংহরূপেনোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণী নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—হে দেবী, ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্তি ধারণ করে আপনি

দৈত্যবিনাশে উদ্যতা হয়েছিলেন এবং আপনিই ত্রিভুবন রক্ষা করেন। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

'কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—দেবী, আপনি মুকুটযুক্তা, মহাবজ্রধারিণী, সহস্রনয়ন-শোভিতা, বৃত্রাসুরনাশিণী এবং ইন্দ্রশক্তিরূপা। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

'শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—দেবী, শিবদূতীরূপে আপনি বিশাল-অসুর-সৈন্য-নাশিণী। আপনি ভয়ঙ্করমূর্তিধারিণী ও মহাগর্জনকারিণী। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

'দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—চামুণ্ডে, আপনি বিকটদন্তবিশিষ্ট ভীষণবদনা, নরমুণ্ড-মালিনী এবং মুণ্ডাসুরনাশিণী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

'লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—দেবী, আপনিই লক্ষ্মী, লজ্জা, ব্রহ্মবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি ও স্বধাস্বরূপিনী। আপনি নিত্য, মহাপ্রলয়রূপা রাত্রি ও মহামোহরূপা অবিদ্যা। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

'মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—দেবী, আপনি মেধারূপা, বাগ্দেবী, সর্বশ্রেষ্ঠ, রাজসী, তামসী, দৈবশক্তি এবং ঈশ্বরী। আপনি প্রসন্না হোন। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

'সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবী নমোহস্তু তে॥'

অর্থাৎ—দেবী আপনি সর্ব কার্য ও কারণরূপিনী, সর্বেশ্বরী, সর্বশক্তিময়ী ও দুর্জ্ঞেয়া। দেবী, আপনি আমাদেরকে সকল আপদ হতে রক্ষা করুন। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

২১ 'এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥'

অর্থাৎ—কাত্যায়নী, আপনার ত্রিনয়নশোভিত সৌম্য বদন আমাদেরকে সকল ভৌতিক বিকার ও সর্বভূতেব উপদ্রব হতে রক্ষা করুক। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

২২ 'জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥'

অর্থাৎ—হে ভদ্রকালী, প্রচণ্ডদীপ্তিমান, অতিতীক্ষ্ণ অসংখ্যাসুরনাশক আপনার ত্রিশূল আমাদেরকে সকল রকম ভয় হতে রক্ষা করুক। আপনাকে প্রণাম।

২৩ 'হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবী পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব॥'

অর্থাৎ—দেবী, আপনার যে ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ করে আপনি দৈত্যতেজ হরণ কবেন তা জননী যেমন পুত্রকে অমঙ্গল হতে রক্ষা করেন তেমনি আমাদেরকে সকল পাপ হতে রক্ষা করুক।

২৪ 'অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্‌গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্॥'

অর্থাৎ—চণ্ডীকে, আপনার হস্তস্থিত তেজোময় এবং অসুরের রক্তসিক্ত ও মেদলিপ্ত খড়্গ আমাদের কল্যাণসাধন করুক। আপনাকে আমরা প্রণাম করি।

'রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
২৫ রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥'

অর্থাৎ—দেবী, আপনি সন্তুষ্টা হলে সবরকম ব্যাধি বিনাশ করেন।

আবার রুষ্ট হলে অভীষ্ট বস্তুসকল নাশ করেন। আপনার আশ্রিত ব্যক্তিদের বিপদ স্থায়ী হয় না। যাঁরা আপনার চরণাশ্রিত তাঁরা অন্যেরও আশ্রয়যোগ্য হন।

'এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা॥'

অর্থাৎ—দেবী, সম্প্রতি আপনি ব্রাহ্মী প্রভৃতি ও কালী আদি মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ বহু প্রকারে প্রকটিত করে ধর্মদ্বেষী মহাসুরগণের এই যে বিনাশসাধন করলেন, অম্বিকে, তা আপনি ছাড়া অন্য কারও দ্বারা সম্ভব হতে পারে?

'বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষু
আদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্তেঽতি মহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥'

অর্থাৎ—সকল দৈহিক বিদ্যায়, মন্বস্মৃত্যাদি প্রবৃত্তিপর ধর্মশাস্ত্রসমূহে এবং নিবৃত্তিপর বেদান্তবাক্যসকলে মানুষকে আপনি ছাড়া আর কে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাতে পারে?

'রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
এত স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥'

অর্থাৎ—যেখানে রাক্ষস, যেখানে তীব্র বিষধর সর্প যেখানে শত্রু ও দস্যুরা এবং যেখানে দাবানল ও সমুদ্রবক্ষে সর্বত্র আপনি সর্বদা বিরাজিতা থেকে বিশ্ব পরিপালন করেন।

'বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।

বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥'

অর্থাৎ—হে জগদীশ্বরী, আপনি বিশ্ব প্রতিপালন করেন। আপনি বিশ্বরূপা। আপনি বিশ্ব ধারণ করেন। আপনি ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়া। যাঁরা ভক্তিপূর্বক আপনার শরণাগত হন, তাঁরা বিশ্বের আশ্রয়স্থল হন।

'দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোহরিভীতেঃ ;
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥'

অর্থাৎ—দেবী, আমাদের প্রতি প্রসন্না হোন। সম্প্রতি স্মরণমাত্রেই আপনি যেরূপ অসুরনাশ করে আমাদেরকে রক্ষা করলেন তেমনি ভবিষ্যতেও আপনি সর্বদা আমাদেরকে শত্রুভয় হতে রক্ষা করবেন। দেবী, আপনি কৃপা করে জগতের সমস্ত পাপ ও অধর্মের পরিণামে উৎপন্ন দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি উপদ্রবসকল শীঘ্র নাশ করুন।

'প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥'

অর্থাৎ—হে বিশ্বার্তিহারিণি দেবী, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্না হোন। ত্রিভুবনবাসিদের আরাধ্য দেবী, আপনার চরণে প্রণত জনগণের প্রতি আপনি বরদা হোন।

নির্দিষ্ট দিনে চণ্ডীপাঠ সমাপ্ত হলো। তারপর ঐ জ্যোতির্ময় পুরুষকে বিনীতভাবে জিগ্যেস করলো, হে মহাপুরুষ, আমার মা বারো জন ব্রাহ্মণের সেবা করেছিলেন। তার ফল কি?

মহাপুরুষ শিবরামের কথা শুনলেন। পরে মহাযোগিনীকে সম্বোধন করে মধুর বচনে বললেন, হে দেবী, তোমার ঝুলিতে তিনটি বটিকা আছে। তা এই লোকটিকে দাও। এক পার্বতীয় রাজার ছেলেপুলে হয়নি। এই বটিকা খেলে তাঁর স্ত্রীর ছেলে হবে। সেই নবজাত শিশু বারোটি ব্রাহ্মণসেবার ফল বলে দিতে পারবে।

মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান করলেন। শিবরাম অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বাহ্যজ্ঞানহারা। নিশ্চল প্রস্তর মূর্তি যেন।

পরে মন আবার দেহে ফিরে এলো। সাতদিন যাবৎ উপবাস করে আছে। পেটে কিছু পড়ে নি। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লো।

এই অবস্থায় সে কোথায় যাবে! সে তো জানে না পার্বতীয় রাজার রাজধানী কোথায়। কে বলে দেবে তার সন্ধান?

অনির্দিষ্ট পথ ধরে খানিকটা গেল। আবার ফিবে এলো। অথচ বেশীদূর যেতে পাবলো না। অনাহারে শরীর ক্লান্ত। চলৎশক্তিহীন। হঠাৎ সামনে দেখলো একটি খাবারের দোকান। ভাবলো, তাইতো, ওখানে গিয়ে কিছু জলযোগ করে এলে মন্দ কি!

সেখানে গিয়ে কিছু জলযোগ করলো।

তারপর আবার হাঁটা সুরু হলো। কিন্তু পা যে আব চলে না। মনে হচ্ছে মাটি তার পা টেনে রেখেছে। যেতে দিচ্ছে না।

তথাপি বলপূর্বক চলতে চেষ্টা করলো। শেষকালে আর চলতে পারলো না। চলা থামিয়ে দিলো। সামনে তাকালো একবার।

আরে বটবৃক্ষ না!

আনন্দিত হলো শিবরাম।

বটের ছায়া পথিকেব পথশ্রান্তি দূর করে। তার শীতল ছায়াস্পর্শে পথিক ফিরে পায় নবজীবনের ইঙ্গিত। এনে দেয় সর্বশরীরে শক্তির জোয়ার। সেই শক্তিতে সে আবার পথ চলার সাহস পায়।

বটবৃক্ষের তলায় এলো শিববাম।

তার নীচে শান্ত ছায়ার কোলে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিলো।

জনকোলাহলশূন্য নির্জন জায়গায় বিশ্রাম নিতে লাগলো শিবরাম।

মনে ছিল না এতটুকু সঙ্কোচ—ক্ষুদ্রতম আশঙ্কা। শান্ত ও নির্বিঘ্ন মন নিয়ে বিশ্রাম করছিল।

ওকি। কিসের শব্দ আসছে? খস্‌খস্ খস্‌খস্—মস্-মস্।

সামনে তাকিয়ে দেখলো শিবরাম।

চতুর্দিক ঘন কৃষ্ণবর্ণ। জমাট অন্ধকার দেখে মনে হলো কোন দৈত্য ভীষণ ও ভয়াল রূপ নিয়ে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষ চেনা যায় না সহজে।

তবে একজন লোক এলো। তার মাথায় একটা বোঝা।

সে শিবরামকে দেখে অবাক হলো। জিগ্যেস করলো, আপনি কে ?

লোকটি প্রায় এখানে এসে রাত কাটাত। আজ এখানে একজন অপরিচিত মানুষকে দেখে সে বিস্মিত হলো।

তাই প্রশ্ন করলো শিবরামকে।

তার ওপর তার সেই সুপুরুষ দৈহিক গঠন দেখে মনে মনে ভীতও হয়েছিল লোকটি।

শিবরাম বললো, আমি রাজবাড়ীতে যাব। এখানে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। তুমি কে ?

লোকটি বললো, আমি ঘাসওলা। ঘাস কেটে এনেছি। এখানে রাতটা কাটাবো। রাত পোয়ালে আমিও রাজধানীতে যাব।

তুমি কি রোজ এখানে রাত কাটাও ? জিগ্যেস করলো শিবরাম।

ঘাসওলা বললো, হ্যাঁ

—তুমি কি জাতি ?

—আমি গোয়ালা।

—আমিও কাল তোমার সঙ্গে রাজধানী যাব।

গোয়ালা বললো, আচ্ছা। ভালই হবে।

এদিকে শিবরাম বড় ক্লান্ত। দীর্ঘপথ হেঁটেছে। তার ওপর দীর্ঘদিন উপবাস।

এত কষ্ট শরীরে সহ্য হলো না। হাতে পায়ে ব্যথা।

ভাবলো, এই অবস্থায় কেউ যদি আমার গা-হাত-পা টিপে দেয় তো ভাল হয়। একটু সুস্থ হতে পারলে আবার পথ চলতে পারবো নির্বিঘ্নে।

ঘাসওলা গোয়ালাকে বললো, তুমি আমার একটু পা টিপে দাও।

গোয়ালা পা টিপতে বসলো।

অনেকক্ষণ পা টেপার পর ক্লান্তি এলো। শুয়ে পড়লো সেখানে। শিবরামের পায়ের কাছটিতে। প্রভুভক্ত একান্ত দাসের মত পড়ে রইলো প্রভুপাদসমীপে। মনে নেই বিকার। সেবার আনন্দ তাকে উৎফুল্লিত করলো।

ক্রমে রজনী অতিবাহিত হলো।

চতুর্দিকে গগনভেদী বায়সকণ্ঠ নিনাদিত হলো। প্রত্যূষের নির্মল এবং স্নিগ্ধ বাতাস শরীরে এসে লাগলো। সকলের মন ও দেহকে শান্ত করলো। নবশক্তিতে ও আনন্দে জেগে উঠলো সকলে।

কিন্তু একি! সকলে জাগলো অথচ গোয়ালার এখনো পর্যন্ত ঘুম ভাঙ্‌লো না কেন?

শিবরাম গোয়ালার কাছে এলো। ডাকলো তাকে, ও গোয়ালার ছেলে, ওঠো।

কোন সাড়াশব্দ নেই। চতুর্দিকে নিবিড় মৌনতা বিরাজমান।

গোয়ালা উঠলো না।

তখন সে তার গা ঠেলে ডাকতে লাগলো, ও গোয়ালার ছেলে, ও গোয়ালার ছেলে, ওঠো ওঠো।

তাতেও ঘুম ভাঙ্‌লো না তার।

তখন সে সজোরে ধাক্কা দিলো।

মনে মনে বললো, এ আবার কি ব্যাপার! এত ডাকছি, এখনো ওঠে না কেন?

তবু পাশ ফিরে শুলো না গোয়ালা। কোন কথাও বললো না।

শিবরাম তার শরীর পরীক্ষা করলো। চোখের পাতা টেনে ধরলো।

নাকের কাছে আঙ্গুল নিয়ে গেল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকমত বইছে কিনা তা জানবার জন্যে।

দেখলো, গোয়ালার গা-হাত-পা ঠাণ্ডা এবং অসাড়। অনুভবে

বুঝতে পারলো, সে মৃত। তার পরমায়ু দেহের মধ্যে আর নেই।

একি হলো। এই অজানা অচেনা জায়গায় একজন অচেনান লোককে সেবা করতে বলে একি অনর্থ ঘটলো!

মহা ভাবনায় পড়লো শিবরাম গোয়ালাকে নিয়ে। এই অজানা জায়গায় নাম-গোত্রহীন একজন মৃত লোককে নিয়ে সে কি করবে?

মৃত দেহটিকে সামনে রেখে উঠে পড়লো। চতুর্দিকে তাকালো।

হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটি মুদির দোকান। ভাবলো, ঐ দোকানের মালিককে জিগ্যেস করে দেখি না একবার। লোকটির পরিচয় বোধহয় জানা যাবে।

দোকানী তখন সবেমাত্র দোকান খুলেছে। এবার ধূনোগঙ্গাজল দিচ্ছে।

শিবরাম দোকানীব কাছে এসে জিগ্যেস করলো, তুমি এই লোকটিকে চেন?

দোকানী বললো, না।

তখন শিবরাম সব ব্যাপাবটা তাকে খুলে বললো। তার কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চাইলো মৃত লোকটিব সংকারেব জন্যে।

দোকানী দয়াপরবশ হয়ে কিছু টাকা সাহায্য দিলো। আরও দু'একজন লোক তাকে অর্থ সাহায্য দিলো।

শিবরাম সেই অর্থ নিয়ে গোয়ালার মৃতদেহ নর্মদার ঘাটে নিয়ে গেল। শাস্ত্রবিহিত যথারীতি সংকার করলো।

পরে নদীতে অবগাহন করে ফিরে এলো।

এবার একাকী রাজধানী অভিমুখে যাত্রা শুরু করে দিলো। পথ দুর্গম। তথাপি আশায় হৃদয় স্থির রেখে মনকে সবল করে এগুতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে পার্বত্য রাজধানীতে এলো।

শহরে প্রবেশ করে বলতে লাগলো, এই মহারাজার ছেলেপুলে. হয় নি। আমার কাছে দৈব ওষুধ আছে। তা খাওয়ালে মহারাণী গর্ভবতী হবেন।

রাজমন্ত্রীর কানে গেল শিবরামের ঘোষণা।

রাজমন্ত্রী সেই খবর দিলেন মহারাজাকে।

মহারাজা তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না।

মন্ত্রীকে বললেন, আমি আগে অনেক দৈব ওষুধ খেয়েছি। ওসবে আমার আর বিশ্বাস নেই।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজা, ব্রাহ্মণ বলছেন, যদ্দিন পর্যন্ত পুত্র না হয় তদ্দিন তিনি এখানে বন্দী হয়ে থাকতে রাজী আছেন।

মহারাজা এবার খুশী হলেন।

শিবরাম ওষুধ দিলো মহারাজাকে।

সেইসঙ্গে বললো, মহারাজা, আমি অর্থপ্রত্যাশী নই। কিন্তু আমার একমাত্র প্রার্থনা, আপনার পুত্রসন্তান হওয়ামাত্র আমাকে সূতিকাঘরে নিয়ে গিয়ে সেই নবজাত শিশুকে দেখতে দিতে হবে।

মহারাজা একবার তাকালেন সুপুরুষ শিবরামের দিকে। ভাবলেন, ইনি কে? ইনি নিশ্চয়ই একজন শক্তিমান পুরুষ হবেন। আগে অনেক লোক দৈব ওষুধ নিয়ে আমার কাছে এসেছেন কিন্তু এনার মত কাউকে দেখলুম না।

মহারাজা রাজী হলেন। বললেন শিবরামকে, বেশ তাই হবে। আপনার অভিলাষ পূর্ণ হবে। আপনি আশ্বস্ত হোন।

দশ মাস সময় অতিক্রান্ত হলো।

মহারাণী শিবরাম প্রদত্ত ওষুধ খেয়েছেন।

এখন তিনি পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা।

নির্দিষ্ট দিনে একটি সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হলো। সময় প্রাতঃকাল। অতিশয় সুন্দর কাল। পরম শুভক্ষণ।

ভূমিষ্ঠ হয়েই পুত্রটি পদ্মাসনে বসে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

সকলে শিশুর কাণ্ড দেখে অবাক হলো। পরস্পরে কানাকানি করতে লাগলো, হ্যাঁরে এ কি কখনো সম্ভব? এই ঘোর কলিতে সদ্য-জাত শিশু এমনি ব্যবহার করতে পারে!

কৌতুহলী হয়ে সকলে এলো শিবরামেব কাছে। বললো, আপনি সে শিশুকে দেখবেন চলুন। সে এমনি অদ্ভুত যে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মাসনে বসে আপন মনে হাসছে।

শিবরাম ততোধিক কৌতুহলী হয়ে ছুটে এলো।

অবশ্য সে এই ব্যাপার দেখে বেশী আশ্চর্য বোধ করলো না। কারণ সে আগে থাকতে জানতে পেরেছিলো এমনি এক অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে।

মহারাণীর ঘরে প্রবেশ করলো শিবরাম।

ধীরে ধীরে সন্তর্পণে চলে এলো, নিশ্চুপ। পায়ের শব্দ শোনা গেল না। এমন কি কাপড়ের খস্‌খসানী শব্দ পর্যন্তও না।

শিশুব দুগ্ধধবল লালিত্যপূর্ণ চেহারা দেখে সাতিশয় আনন্দিত হলো। এমন অনিন্দ্যসুন্দর রূপ কোন মানবপুত্রের হতে পারে না। ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবশিশু হবেন। মনেব বাসনা পূরণ করবেন তাঁর। সফল হবে গর্ভধারিণীর আশা। ব্রাহ্মণ ভোজনেব ফল।

শিবরাম শিশুটিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললো, রাজকুমার, আমার মা বারো জন ব্রাহ্মণকে সেবা করেছিলেন। তার ফল কি?

নবজাত রাজকুমার দ্বিধাহীনচিত্তে বললেন, আমি ক্ষণকালমাত্র একটি ব্রাহ্মণকে সেবা করেছিলুম। সেই ব্রাহ্মণসেবার ফলে আজ গোপকুল থেকে রাজকুমার হয়েছি! সুতরাং বারো জন ব্রাহ্মণসেবার ফল যে কত তা একবার ভেবে দেখুন।

শিবরাম মনে মনে বুঝতে পারলো শিশুর কথার মাহাত্ম্য।

সে আর কোন প্রশ্ন না করে চলে এলো রাজবাড়ী থেকে। এরপর সে দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি প্রসিদ্ধস্থানে গেল।

পরিশেষে এলো পুরীধামে। এখানে জনৈক ব্রাহ্মণবাড়ীতে অতিথি হলো।

ব্রাহ্মণ তার মত অতিথিকে পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন। ভক্তিভরে তার সেবাযত্ন করলেন।

ব্রাহ্মণের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে শিবরাম তাকে বর দিতে চাইলো।

ব্রাহ্মণ বললো, আপনি আমাকে এমন বর দিন যাতে আমি সন্তানের জনক হতে পারি।

শিবরাম আশীষ জানিয়ে বললো, তাই হোক।

এর কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রীর চেহারা এবং গতি প্রকৃতি দেখে বুঝতে পারলেন যে তিনি অচিরে সন্তানের জনক হতে চলেছেন।

ইতিমধ্যে শিবরাম অন্যত্র গমন করলো।

বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে পাঞ্জাবে এলো শিবরাম।

প্রসিদ্ধ বাস্তব গ্রাম। এখানে ভগীরথ স্বামী নামে এক প্রসিদ্ধ যোগী থাকতেন।

ভগীরথ স্বামীর সঙ্গে শিবরামের সাক্ষাৎ হলো। তিনি শিবরামের মাতৃকাশ্রমে এলেন। এখানে উভয়ে কিছুদিন অতিবাহিত করলেন। এই সময় দু'জনে শাস্ত্র আলোচনা করতেন।

তাবপর ভগীরথ স্বামী শিবরামকে পুষ্করতীর্থে নিয়ে এলেন। এখানে তাকে দীক্ষা দিলেন।

দীক্ষার পর শিবরাম নিজের নাম পরিবর্তন করলো না। পিতৃদত্ত নাম তৈলঙ্গস্বামীই রইলো।

দীক্ষার কিছুদিন পরে ভগীরথ স্বামী দেহরক্ষা করলেন। তৈলঙ্গ-স্বামী তখন পুষ্কর ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন বিভিন্ন তীর্থদর্শনে।

এলেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরে।

এখানে প্রতি বছর কার্তিক মাসে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে মেলা বসে। বহু লোকজন আসে। অনেক সাধুপুরুষের যাতায়াত হয়।

দেশীয় লোকজনদের সঙ্গে দেখা হলো। ওরা তৈলঙ্গস্বামীকে চিনতে পেরে বাড়ী ফেরার জন্যে জিদ্ ধরলো।

কয়েক জন লোক বললো, আপনি ফিরে চলুন।

তৈলঙ্গস্বামী নারাজ হলেন। বললেন, আমি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর বাড়ী যাওয়া নিষেধ।

ওরাও আর কিছু বললো না।

কয়েক দিন ধরে ঐ মেলা চললো।

মেলার দ্বিতীয় দিনে একটি দুর্ঘটনা ঘটলো। ভিড়ের চাপে একজন লোক সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো।

সকলে মহা হৈ-হট্টগোল শুরু করে দিলো।

হৈ-হট্টগোল শুনে তৈলঙ্গস্বামী আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সেই ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলেন।

ওদিকে ঐ লোকটির সঙ্গীরা ওকে দাহ করার আয়োজন করতে লাগলো। মনে করলো, ও মারা গেছে।

ওদের ঐ কাণ্ড দেখে তৈলঙ্গস্বামী বললেন, একি, ওকে দাহ করার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছো কেন? ওতো মরে নি?

সেকি! মরে নি? ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন লোক চীৎকার করে উঠলো।

তৈলঙ্গস্বামী বললেন, হ্যাঁ। ও মরে নি। ও এখনো বেঁচে আছে। তবে অজ্ঞান অবস্থায় আছে। দেখবে, ওকে এখুনি বাঁচিয়ে দেবো।

এই বলে কমণ্ডুল থেকে দু'তিন বার জল নিয়ে মৃত লোকটির চোখেমুখে ছিটে দিতে লাগলেন।

লোকটি জীবন ফিরে পেল। আগের মত সুস্থ জীবন। উপস্থিত লোকজন তৈলঙ্গস্বামীর কীর্তি দেখে অবাক হলো। ভাবলো, ইনি মানুষ, না ভগবান!

তাঁকে একজন মহাপুরুষ ভেবে কাছে আসতে লাগলো। তৈলঙ্গস্বামী তখুনি সে স্থান ত্যাগ করলেন।

কারণ তিনি যশের কাঙাল ছিলেন না। মানুষের উপকারের জন্যে বিভূতির লীলা প্রকাশ করতে। কিন্তু তিনি নিজে কোনদিন

বিভূতির দাস ছিলেন না বা তার জন্যে লোকজনের কাছ থেকে মান-যশ-সুখ আশা করেন নি।

রামেশ্বরে হাজার করিডোরের ওপর বিরাট রামেশ্বর মন্দির। মন্দিরের সামনে নাট মন্দির। সেখানে একটি বিরাট শিলাময় বৃষ রয়েছে। রামেশ্বরের বাহন। তার সামনেই বিরাট এক ঘণ্টা।

তৈলঙ্গস্বামী সেই ঘণ্টায় একবার ঘা দিলেন। তখুনি ঢং ঢং শব্দে মন্দিরতল সরগরম হয়ে উঠলো। তারপর বজ্রনির্ঘোষে 'হর ব্যোম্ ব্যোম্' ধ্বনি করতে করতে মন্দির পরিক্রমা করতে লাগলেন। তাঁর সুদর্শন মূর্তি ও জোরালো কণ্ঠস্বর শুনে মন্দিরের অন্যান্য দর্শকবৃন্দ বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারা তখনো বুঝতে পারেনি সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ—রামেশ্বরের অন্য এক মূর্তি তাদের সামনে বিরাজ করছেন।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর ত্যাগ করে প্রভাসক্ষেত্র এবং দ্বারকাশ্রমে চলে এলেন তৈলঙ্গস্বামী। তারপর যান নেপালে। এখানে পর্বতগুহার মধ্যে বহুদিন যাবৎ যোগ ও তপস্যা করে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হলেন। তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এই সময় একটি বেশ অলৌকিক ঘটনা ঘটলো। পর্বতগুহায় বসে ধ্যানে মগ্ন আছেন তৈলঙ্গস্বামী। বাহ্য জগতের প্রতি কোন রকম হুঁস নেই।

এমন সময় নেপালের রাজা সেনাদল নিয়ে শিকারে বেরিয়েছেন। তাঁর প্রধান সেনাপতি একটা বাঘকে দেখে গুলি ছুঁড়লো। গুলিটি বাঘের গলায় না লেগে অন্যত্র ছুটে গেল।

বাঘটি তখন বিকট চীৎকার করতে করতে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল।

প্রধান সেনাপতিও তাকে অনুসরণ করার জন্যে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে ছুটলো।

একাকী অনেকদূর বনপথে এগিয়ে গেল। শেষে একটা গুহার

কাছে এসে আশ্চর্য ব্যাপার দেখলো। দেখলো, বাঘটি গর্জন করছে। একটি সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন হয়ে বাঘের কাছে বসে আছেন।

বাঘের গর্জন শুনে সন্ন্যসীর ধ্যান ভেঙে গেল। সন্ন্যাসী তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

বাঘ তখন আশ্বস্ত হলো। প্রভুভক্ত সারমেয়ের মত তাঁর পদতলে মাথা রেখে বিশ্রাম নিতে লাগলো।

সেনাপতি ঐ দৃশ্য দেখে অবাক হলো। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না।

ভাবলো, এও কি সম্ভব। বনের হিংস্র বাঘকে বশ করতে পারে একজন দিগম্বর সাধু!

সেনাপতি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সাধুর প্রতি।

সাধু তাকে ধীর বচনে আহ্বান করে বললেন, বাবা এতো আশ্চর্য বা ভীত হবার কারণ কি? তুমি যদি হিংসাপ্রবৃত্তি ত্যাগ করো তবে কোন হিংস্র প্রাণীই তোমার প্রতি হিংসা করবে না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই দেখো। বাঘটি কেমন শান্তভাবে আমার কাছে শুয়ে আছে। এতক্ষণ তুমি এই বাঘের প্রাণ বধ করতে স্থির সঙ্কল্প হয়েছিলে, কিন্তু এখন তোমার এই অবস্থাতে বাঘ অনায়াসে তোমারই প্রাণ বিনাশ করতে পারে। নিজেও এখন সেই ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছো। কাউকে কারুর হত্যা করার ক্ষমতা নেই। যদি তা থাকতো তবে অনেক আগেই তুমি এই বাঘের প্রাণ নাশ করতে পারতে। এই বিশ্বসংসারে সকল প্রাণীই সমান, কারও প্রতি হিংসা করা উচিত নয়। এখন তোমার আর কোন ভয় নেই। তুমি নির্বিঘ্নে তোমার অনুচরদের কাছে যাও। আজ থেকে হিংসাপ্রবৃত্তি ত্যাগ করতে চেষ্টা করো।

একি কথা! এমন কথা, এমন দৃশ্য তো আগে কখনো শুনি নি বা দেখি নি! কে এমন অলৌকিক শক্তির মানুষ? কিবা এনার পরিচয়?

নির্বাক বিস্ময় নিয়ে মূক প্রশ্ন মুখে করে দাঁড়িয়ে রইলো সেনাপতি।

কখন তার হাতছ'টি মিলিত হয়ে সাধুপুরুষকে প্রণাম জানালো সেদিকে খেয়াল নেই।

তারপর যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত কখন বনতল ত্যাগ করলো তাও জানে না। বন্ধু আর সঙ্গীদের কোলাহল যখন তার কানে গেল তখন ভাবলো, সে প্রকৃতিস্থ হয়েছে। বাস্তব জগতের মাটিতে ফিরে এসেছে। এতক্ষণ সে ছিল কল্পনা আর স্বপ্নেব রাজ্যে।

নেপাল বাজার সৈনিকরা ভেবেছিল, তাদের দলপতিকে বাঘে বুঝি মেরে ফেলেছে। কিন্তু দলপতিকে সশরীরে ফিরে আসতে দেখে সকল সৈনিক পুরুষ আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। দৃঢ় হস্তে করমর্দ্দন করলো তার সংগে।

ওদিকে বাঘটি ধীবে ধীরে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল। তৈলঙ্গ-স্বামীর কাছে এসে প্রাণ ফিরে পেল।

অহিংসামন্ত্রের কি সুন্দর দৃষ্টান্ত। জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। সেনাপতি তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা বন্ধুদের কাছে বললো। ক্রমে সে কথা নেপাল রাজার কানে গেল।

তিনি একজন ভক্ত মানুষ। সাধুকে দর্শন করার জন্যে অধীর হলেন। সপার্ষদ সাধুর কাছে এলেন।

বহুমূল্য উপহার সাধুর কাছে রাখলেন।

তৈলঙ্গস্বামী তার একটিও গ্রহণ করলেন না। সব ফিরিয়ে দিলেন রাজাকে।

পরে রাজাকে আশীর্বাদ ও উপদেশ দান করে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, আপনার মঙ্গল হোক। আপনি প্রীতিভরে প্রজাদের শাসন করুন। বনের পশুকে হত্যা করে অন্তরে হিংসাভাব জাগাবেন না।

রাজা সন্তুষ্ট চিত্তে দলবলসহ ফিরে এলেন রাজধানীতে।

নেপালরাজ্যে তৈলঙ্গস্বামীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর অলৌকিক ও অকৃত্রিম কাণ্ড কে না জানে! পথে পথে লোকমুখে

প্রধান সেনাপতির স্বচক্ষে দেখা কাহিনী রটতে লাগলো। তাই শুনে প্রতিদিন বহু লোক গিয়ে ভিড় করে দাঁড়ালো তাঁর সামনে।

বহু লোককে আসতে দেখে তিনি বড় বিব্রত বোধ করতেন। সাধনভজনের ব্যাঘাত ঘটতে লাগলো।

তখন তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করে ভীমরথী নামক স্থানে এলেন। ভীমরথী তীর্থে অবস্থান করার সময় তিনি সদ্‌গুরু লাভের আশায় দিন গুণতে লাগলেন। হৃদয়ের মধ্যে আকুলতার তুফান ওঠে। রাতদিন মনে এক চিন্তা, কবে সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ মিলবে? সদ্‌গুরু কৃপা করে দেখিয়ে দেবেন প্রেমের ঠাকুর গোলকপতিকে। জীবন সার্থক হবে ঈশ্বরদর্শন লাভ করলে।

আর আকুলতা এলেই স্বয়ং ঈশ্বর গুরুরূপে দেখা দেন।

শৃঙ্গেরী মঠের স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতী তাঁর কাছে এসে তাঁকে দীক্ষা দিলেন। তৈলঙ্গস্বামী তাঁর অলৌকিক রূপ দেখে বিস্মিত হলেন। বিদ্যানন্দ যেন সাক্ষাৎ শিব। তাঁর রূপ আর করুণার তুলনা মেলা ভার।

দীক্ষার সময় বিদ্যানন্দ তৈলঙ্গস্বামীকে দণ্ড আর কমণ্ডুল দেন। নামও নতুন হয়। তৈলঙ্গস্বামীর সন্ন্যাস আশ্রমের নাম হলো স্বামী রামানন্দ সরস্বতী। কিন্তু সাধারণের মাঝে তিনি তৈলঙ্গস্বামী বলে পরিচিত হন।

তৈলঙ্গস্বামী গুরুর কাছে বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করলেন। সেই সংগে নানারকম যৌগিক প্রিয়াকলাপও আয়ত্ত করেন।

এরপর বিদ্যানন্দ দাক্ষিণাত্যে যান। যাবার সময় শিষ্যকে আদেশ দেন, তুমি ভীমরথীতে কিছুদিন যোগাভ্যাস করে তিব্বত ও মানস-সরোবরে যেও। সর্বদা আত্মধ্যানে মগ্ন থেকো। সেই পরমাত্মা তোমাকে ব্রহ্মধামে নিয়ে যাবেন।

গুরুর নির্দেশমত তৈলঙ্গস্বামী ভীমরথীতে দীর্ঘ পাঁচ বছর থাকেন। এই সময় তিনি হঠযোগ, ক্রিয়াযোগ ও রাজযোগে সিদ্ধ হন। ক্রমে আত্মদর্শন লাভ করে বিভিন্ন প্রকার বিভূতি লাভ করলেন

এইসব বিভূতির বলে তিমি কখনো আকাশে, কখনো জলে, কখনো স্থলে ইচ্ছেমত যাতায়াত করতে পারতেন।

ভীমরথীতে বহুদিন যোগসাধনার পর তিনি গেলেন তিব্বতে। সেখান থেকে এলেন মানস সরোবরে।

মানস সরোবরের দুগ্ধধবল রূপ অতীব মনোরম। ঠিক যেন স্বর্গ। এখানে বেশ কিছুদিন যোগ অভ্যাস করলেন।

(কয়েক জনকে উপদেশও দিলেন। বললেন, বদ্ধ কে জান?

যার বিষয়ে আসক্তি আছে সেই-ই বদ্ধ।

ভয়ানক নবক বলতে কি বোঝ?

নিজের দেহটাই ভয়ানক নরক বলে জানবে।

স্বর্গ কি?

বাসনাক্ষয়।)

কিসে সংসারবন্ধন ঘোচে?

শ্রুতিসম্মত আত্মজ্ঞান লাভ হলে সংসারবন্ধন ঘোচে।

নরকে যাবার একমাত্র পথ কি?

নারী।

মুক্তির কারণ কি?

শ্রুতিসম্মত আত্মজ্ঞান।

কিসে স্বর্গলাভ হয়?

জীবের প্রতি অহিংসার দ্বারা।

সুখে থাকে কে?

সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তি।

জাগরিত কে?

যার সদাসৎ বিবেক আছে।

(কারা শত্রু?

নিজের ইন্দ্রিয়গণ। জিতেন্দ্রিয় হলে তারা হয় মিত্র।)

দরিদ্র কে?

যার বলবতী আশা আছে।

ধনী কে ?

যে সকল বিষয়ে সন্তুষ্টচিত্ত।

কোন্ ব্যক্তি জীবন্মৃত ?

যে উৎসাহশূন্য।

অমৃত কি ?

সুখদায়িনী নিরাশা।

সংসারে বদ্ধ হবার পাশ কি ?

মমতা আর অভিমান।

সুরার মত পুরুষকে মত্ত করে কে ?

নারী।

মোহান্ধ কে ?

যে বেশী কামাতুর।

মৃত্যু কি ?

নিজের অপমান।

গুরু কে ?

যিনি হিতোপদেশ দেন।

শিষ্য কে ?

যে গুরুভক্ত।

দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যাধি কি ?

বারংবার ভবযন্ত্রণা।

তার নিবারণের ওষুধ কি ?

সদাসদ বিচার।

অলঙ্কার থেকেও উত্তম ভূষণ কি ?

সচ্চরিত্রতা।

পরম তীর্থ কি ?

নিজের মনের বিশুদ্ধতা।

কোন বস্তু হেয় ?

কামিনী আর কাঞ্চন।

সর্বদা কি শ্রবণ করা উচিত ?

গুরুর উপদেশ বেদবাক্য।

ব্রহ্মলাভের কি কি কারণ ?

সৎসঙ্গ, উপযুক্ত দান, সদাসদ্ বিচার আর সন্তোষ।

কাকে সাধু বলা যায় ?

সমস্ত বিষয়ে যাঁর বীতরাগ হয়েছে। যিনি মোহশূন্য এবং যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েছেন তিনিই সাধু।

প্রাণীদের জ্বর কি ?

চিন্তা।

মুর্খ কে ?

যে অবিবেকী।

প্রিয়কর্ম কি ?

শিব আর বিষ্ণুভক্তি।

প্রকৃত জীবন কিরূপ ?

যা দোষশূন্য।

বিদ্যা কি ?

যে বিদ্যা ব্রহ্মলাভে সাহায্য করে।

জ্ঞান কাকে বলে ?

যা মুক্তি আনে।

লাভ বলে কাকে ?

আত্মতত্ত্বজ্ঞানই যথার্থ লাভ।

কে জগৎ জয় করেছে ?

যে মন জয় করেছে।

বীরের চেয়ে মহাবীর কে ?

যে স্মরশরে ব্যথিত হয় না।

প্রাজ্ঞ বীর আর সমদর্শন বিশিষ্ট কে ?

যে ললনার কটাক্ষে মোহিত হয় না।

বিষের চেয়ে বিষ কি ?

সকল রকম বিষয়।
সর্বদা দুঃখী কে ?
বিষয়ানুরাগী।
ধন্য কে ?
যে পরোপকারী।
পূজনীয় কে ?
যার ব্রহ্মতত্ত্বে নিষ্ঠা আছে।
সকল অবস্থায় জ্ঞানীদের অকর্তব্য কি ?
স্নেহ আর পাপ।
জ্ঞানীদের কর্তব্য কি ?
সকল অবস্থায় বেদ ও বেদান্ত পাঠ ও ধর্মকর্ম।
সংসারের মূল কি ?
চিন্তা।
বিজ্ঞ অপেক্ষা বিজ্ঞতম কি ?
যে ব্যক্তি পিশাচীস্বরূপা নারীর দ্বারা বঞ্চিত হন না।
প্রাণীদের শৃঙ্খল কি ?
নারী।
দিব্য ব্রত কি ?
সকলের কাছে দিনভাব প্রকাশ।
মুমুক্ষুদের আশু কর্তব্য কি ?
সৎসঙ্গ, নির্মমতা, আর ঈশ্বরে ভক্তি।
মূক কে ?
সত্য কথা বলার সময় যে সত্য বলে না।
বিশ্বাসের অযোগ্য কে ?
নারী।
একমাত্র তত্ত্ব কি ?
অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব।
উত্তম কি ?

সাধু চরিত্র।

শত্রুদের মধ্যে মহাশত্রু কে?

কাম, ক্রোধ, লোভ, অসত্য আর তৃষ্ণা।

প্রাণীদের মঙ্গলকর কি?

সত্য।

কিসের বিনাসে মোক্ষ হয়?

চিত্তচাঞ্চল্য।

কোন ব্যক্তির সেবা করা কর্তব্য?

গুরুদেব এবং প্রাচীন ব্যক্তির।

সকলের পক্ষে দুর্জয় কি?

কাম।

মিত্রবৎ শত্রু কে?

পুত্র, কন্যা, জায়া প্রভৃতি।

চপলার মত ক্ষণস্থায়ী কে?

ধন, যৌবন আর জীবন।

পাপী ব্যক্তির কর্তব্য কি?

পতিতপাবন বিশ্বনাথের আরাধনা।

তৈলঙ্গস্বামী আবার বললেন, আগে নিজেকে অর্থাৎ আমি কে জানা চাই। তবেই সদ্গুরুর আশ্রয় পাবে। আমি শরীর নই, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য অথবা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক প্রভৃতি নই। আমি অহঙ্কার অথবা প্রাণ, অপান, ধ্যান, উদার, সমান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ুও নই। বুদ্ধিও নই। দারা, ক্ষেত্র, বিত্ত ইত্যাদি দূরে থাকুক, সকলের সাক্ষী যে নিত্য পদার্থ প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ যিনি জীবাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে আছেন সেই পরমাত্মাই আমি।

অজ্ঞানতাবশতঃ রজ্জুকে যেমন সর্প জ্ঞান হয়ে থাকে তেমনি সর্বব্যাপী পরমাত্মাতেও মানবগণের জীবভাব বলে ভ্রান্তি জন্মে। জ্ঞানী লোকের উপদেশে সর্পভ্রান্তি বিনষ্ট হলে যেমন রজ্জুকে আর

সর্প বলে বোধ থাকে না, রজ্জু বলে জ্ঞান হয় তেমনি গুরুর উপদেশ পেয়ে কিংবা অন্য রকম উপায়ে অজ্ঞান গেলে 'আমি জীব নহি' অর্থাৎ আমি সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা বলে জীবের জ্ঞান জন্মে।

এ বিশ্বসংসার আমা হতে আর কিছুই নয়। বাইরে নানারকম বস্তু দেখতে পাওয়া যায় সত্যি কিন্তু সেসব কেবল আয়নার ছায়ামূর্তি মত মায়াকল্পিত। একমাত্র অদ্বৈতস্বরূপ আমাতেই সে অদ্বৈত পদার্থ প্রকাশিত হয়ে রয়েছে। অতএব আমিই সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা।

যেরকম ঘুমন্ত অবস্থায় অজ্ঞানতা হতে নানারকম অসত্য পদার্থও সত্য বলে মনে হয় সেইরকম মায়াময় বিশ্বসংসার সেই সচ্চিদানন্দ—স্বরূপ পরমাত্মাকে সত্য বস্তু বলে প্রকাশিত হচ্ছে। ফলে মোহাদিপরিশূন্য হয়ে একমাত্র পরমাত্মাই সত্য পদার্থ; তিনি আমা হতে অভিন্ন। আমিই সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা। এই কথা যিনি বুঝতে পারেন তিনি শুদ্ধ নিত্য পদার্থ। সাধক সবসময় একথা জানতে পারে না।

আমি যখন জন্ম নিই নি কিংবা বৃদ্ধও নই তখন বিনষ্টও হবো না। কেননা, জন্ম, মৃত্যু জরা এই তিনটি দেহের পক্ষে সংঘটন হয়। একে দেহের প্রাকৃতিক ধর্ম বলা যায়। সকল কর্তৃত্বাদিশক্তি কেবল চেতনাময় আত্মাতে বিদ্যমান আছে এ দেখতে পাওয়া যায়। জীবত্বরূপ অহংকারের ওসব নেই। এতএব জীবত্ব ভ্রমের বিনাশ হলে আমিই সেই মঙ্গলময় ও স্বরূপ পরমাত্মা এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়ে থাকে।

আমি দেহ অর্থাৎ শরীর নই। এতএব আমার জন্ম অথবা মৃত্যু কি প্রকারে সম্ভব হতে পারে? আমি প্রাণও নই। সুতরাং আমার খিদেতেষ্টা কি প্রকারে থাকতে পারে? আমি চিত্ত নই। সুতরাং আমার শোক, তাপ, মোহাদি থাকবার বিষয় কি? আমি কর্তাও নই। সুতরাং আমার বন্ধন বা মুক্তি কোথায়?

এরপর তৈলঙ্গস্বামী আরও অনেক প্রকার ধর্মোপদেশ দিলেন।

'তত্ত্বমসি' কথার সারমর্ম বিশদরূপে বুঝিয়ে দেন। বললেন, 'তত্ত্বমসি' এই কথার প্রকৃত অর্থ বিবেচনা করে দেখলে তুমিই ব্রহ্ম এরূপ অভেদ জ্ঞান হবে। অতএব জীব ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানই 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ পরন্তু ঐক্য শব্দের এরূপ অর্থবোধ কর্তব্য নয় যে দুই বস্তু মিলিত হয়েছে। অথচ উভয়েই এক পদার্থ। কেবল নাম প্রভেদ মাত্র। নাম ভেদেই উভয় বলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ ত্বং, তৎ ও অসি। এই তিনের ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করলে ও জানলে তবে জীবের পরিজ্ঞান লাভ হয়। আর তখনই জীব ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশ পায়। কারণ মায়াদি পরিত্যাগ হলেই 'আমিই ব্রহ্ম' এরূপ অভেদ জ্ঞান হয়ে থাকে।

যিনি আগে একমাত্র সৎ ছিলেন, তিনিই এক জগৎ সৃষ্টি করে জীবরূপে স্বয়ং সেই জগতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনিই পরমাত্মা আর পরমাত্মাই তুমি। জগৎসৃষ্টির পূর্বে তুমিই একমাত্র সৎস্বরূপে বিদ্যমান ছিলে।

তুমি সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা। কেননা আপনিই নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে জীবভাব লাভ করেছ। এই বিস্মৃতিরূপ মোহ নিবৃত্ত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান এলেই আবার তুমি অদ্বয়ানন্দ, শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে প্রকাশ পাবে। জীবভাব পরিত্যক্ত হলেই আত্মস্বভাবরূপ সাম্রাজ্য লাভ হয়। অর্থাৎ যখনি জীব আত্মস্বরূপ ভুলে সংসারমায়ায় অভিভূত থাকে তখনি নিজেকে আপনি চিনতে পারে না। পরে আত্মবিস্মৃতি চলে গেলে 'আমিই ব্রহ্ম' এইসব জ্ঞান হয়ে থাকে।

মানস সরোবরে কিছুদিন ছিলেন তৈলঙ্গস্বামী। সেখানে নিয়মিত যোগযাগ আর শাস্ত্রাধ্যয়ন করতেন। যারা উপদেশ চাইতো তাদের তিনি নিরাশ করতেন না কখনো।

কেবল কি মৌখিক উপদেশ দিতেন? তা নয়। ঐশ্বরিক বিভূতির দ্বারা অনেক দুঃখী ও পাপীতাপীদের অসহ ভবযন্ত্রণা দূর করতেন।

সুন্দর প্রভাত।

স্নিগ্ধ অরুণকিরণ চারদিকে অপূর্ব শোভা বিস্তার করে স্বামিজীর

চরণে এসে প্রথম প্রণাম নিবেদন করতে লাগলো। মানস সরোবরের স্নিগ্ধ কুলকুলনাদিনী ধারা অবিশ্রান্তভাবে বয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে, তার মুখে নামগান। সেও যোগীবর—তৈলঙ্গস্বামীর মত তপস্বী।

এমন সময় তৈলঙ্গস্বামী শুনতে পেলেন কার যেন বুকভাঙা আর্তনাদ। হায় ভগবান, আমার একি সর্বনাশ করলে। আমার একমাত্র কোলের বাছাটাকে কেন কেড়ে নিলে!

তার আর্তনাদে তৈলঙ্গস্বামীর ধ্যান গেল ভেঙে। তাকিয়ে দেখলেন এদিক ওদিক।

দেখলেন, একটি মহিলা সাত বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে শ্মশানঘাটে এসেছে। ছেলেটি মৃত বলে মনে হচ্ছে।

পুত্রহারা জননীর কাতর বিলাপ সহ্য হলো না তাঁর। তিনি যোগাসন থেকে উঠে পড়লেন। এগিয়ে এলেন মহিলাটির কাছে।

জিগ্যেস করলেন, তুমি অমনভাবে কাঁদছো কেন? কি হয়েছে?

মেয়েটি কিছু বলতে পারলো না। শোকে বাক্‌হারা। কপালে করাঘাত করতে থাকলো। দু'চোখ ভেসে গেল অশ্রুজলে।

পরে সামান্য প্রকৃতিস্থ হয়ে ধীরে ধীরে বললো, বাবা, কাল রাতে একে সাপে কেটেছে। বাঁচাতে পারি নি। তাই এখানে এনেছি।

ভালভাবে পরীক্ষা করলেন তৈলঙ্গস্বামী মৃত ছেলেটিকে।

মনে হলো করুণার সঞ্চার।

করুণাময় ঈশ্বরসেবকের অন্তর কি কখনো করুণাশূন্য হতে পারে? হতে পারে কি স্নেহহীন?

বিধবার একমাত্র পুত্র। অন্ধের যষ্ঠি। ওকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে।

তৈলঙ্গস্বামী মেয়েটিকে অভয় বাণী শোনালেন, তোর কোন ভয় নেই। চুপ কর। অমন করে আর কাঁদিস না।

মেয়েটি তাঁর অমৃতময় বাণী শুনে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইলো। অশ্রুজল আর নেমে এলো না গণ্ডদেশ বেয়ে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ সাক্ষাৎ বিশ্বনাথের

তেজোপূর্ণ দিব্য মূর্তির পানে। নিষ্পলক আঁখি দু'টি মহাপুরুষের করুণাসুধা পান করতে উন্মুখ।

তারপর মৃত ছেলেটিকে আস্তে আস্তে তুলে স্বামিজীর পায়ের কাছে শুইয়ে দিলো। করযোড়ে বললো, বাবা আপনি ওকে রক্ষা করুন। আমার আর কেউ নেই।

তৈলঙ্গস্বামী ছেলেটির গায়ে হাত দিয়ে বললেন, কৈ? কি হয়েছে? দেখি একবার।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি একটি নিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলো।

ছেলের মা অবাক হয়ে গেল। একি! বাছাধন এবার জেগেছে! চিরনিদ্রায় এতক্ষণ যে মগ্ন ছিল এবাব ঘুম ভাঙলো।

আনন্দের উজ্জ্বল আলোয় চোখমুখ উদ্ভাসিত করে এগিয়ে এলো ছেলেটির দিকে। তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বললো, বাবা, এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?

তৈলঙ্গস্বামী সে স্থান ত্যাগ করলেন। যাবার আগে মেয়েটি তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বারবার প্রণাম জানালো। বললো, বাবা, তুমি সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ। তুমি কৃপা না করলে ছেলেটি বাঁচতো না।

তৈলঙ্গস্বামী বললেন, যা-যা। ছেলেটিকে ফিরে পেয়েছিস তো। এবার বাড়ী ফিরে যা।

মেয়েটি শান্ত হলো।

মানস সরোবর থেকে নর্মদা নদীর তীরে এলেন তৈলঙ্গস্বামী। এখানে মার্কণ্ডেয় আশ্রম আছে। ঐ আশ্রমে রইলেন। আরও অনেক সাধু এলেন ভারতের নানা তীর্থস্থান থেকে। ওঁরা তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে আলাপ করলেন।

ঐ আশ্রমে খাকিবাবা নামে এক সাধু ছিলেন। তাঁকে সকলেই মান্য করতো। তিনি রাত্তির বেলায় নর্মদার তীরে বসে সাধনা করতেন।

একদিন দেখলেন, নর্মদার জল দুধের মত সাদা হয়ে গেল। চারদিক ধবধবে সাদা। আর সেই দুধ অঞ্জলি ভরে পান করছেন তৈলঙ্গস্বামী।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন খাকিবাবা। পরে নিজে ঐ দুধ পান করার ইচ্ছে করলেন।

তর্‌তর্ করে নদীর ঘাটে নেমে গেলেন। দুধ স্পর্শ করতে যাবেন এমন সময় দেখলেন, সে দুধ আর নেই। জল হয়ে গেছে।

আশ্রমে ফিরে এলেন খাকিবাবা। অনুচরদের সামনে সব কথা খুলে বললেন।

শিষ্যরা তাই শুনে অবাক হলো। এরপর থেকে তৈলঙ্গস্বামীর প্রতি ওদের অশ্রদ্ধাভাব চলে যেতে লাগলো।

আগের তুলনায় আরও অধিকভাবে শ্রদ্ধা জানাতে আরম্ভ করলো।

খাকিবাবা নিজে এসে তৈলঙ্গস্বামীর পা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, বাবা, আপনিই ভগবান। তা না হলে এমন অঘটন কাজ কেমন করে ঘটলো।

তৈলঙ্গস্বামী হেসে বললেন, আমি ভগবান নই। আমি তোমাদের মত সাধারণ মানুষ। তবে আমি ভগবানকে মন-প্রাণ দিয়ে ডাকি। তোমরা তাঁকে ডাকো।

প্রয়াগে এলেন তৈলঙ্গস্বামী। ভারতের তীর্থস্থানগুলির মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত স্থান হচ্ছে প্রয়াগ। যুগ যুগ ধরে এর মাহাত্ম্য ধর্ম-প্রাণ ভারতবাসীর মনে যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতূহল জাগায়। এখানকার গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিধারায় অবগাহন করলে জীব সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়। এই পবিত্র তীর্থে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করলে তিনি সশরীরে স্বর্গলাভ করেন।

এখানে গঙ্গার তীরে বসে যোগাভ্যাস করতে আরম্ভ করলেন তৈলঙ্গস্বামী।

একদিন এই গঙ্গার তীরে এক অঘটন ঘটলো। তৈলঙ্গস্বামী

উলঙ্গ অবস্থায় বসে ছিলেন গঙ্গাতীরে। এমন সময় দেখলেন, একটি যাত্রীবাহী নৌকো গঙ্গার ওপার হতে এপারে আসছে। নৌকোটি গঙ্গার মাঝবরাবর এসেছে এমন সময় আকাশে মেঘ ও ঝড় দেখা দিলো।

তৈলঙ্গস্বামী বড় চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

গঙ্গাতীরের বহু লোকজন এদিক ওদিক ছুটতে ছুটতে যে যার বাড়ী চলে গেল। রামতারণ নামে একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ স্বামিজীকে ওভাবে ভিজতে দেখে বললো, আপনি এখানে এভাবে কষ্ট করছেন কেন? আমার সঙ্গে আসুন।

স্বামিজী হঠাৎ হেসে তাকে বললেন, না বাপু। আমি এখন কোথাও যাব না। ঐ যে অদূরে নৌকোটি দেখছো, ওটি এখুনি ঝড়ে ডুবে যাবে। আমাকে এখন ওখানে যেতে হবে। রক্ষে করতে হবে নৌকোখানি ডুবে গেলে। স্বামিজী তক্ষুনি অদৃশ্য হলেন।

রামতারণ গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ঐ দৃশ্য। এক পাও নড়লো না ওখান থেকে।

ওদিকে ঝড়ে ডোবা নৌকোটি আবার জলের ওপর ভেসে উঠলো। শুধু ভেসে ওঠা নয়। তার মধ্যে উলঙ্গ তৈলঙ্গস্বামীকে দেখতে পেল যাত্রীগণ। ওরা অবাক হলো। ভাবলো, ইনি কে? আগে ত নৌকোর ওপর দেখি নি!

একি দেখলো তারা! কেমন করে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ এখানে এলেন? আর কিভাবে তিনি তাদের রক্ষা করলেন?

ক্রমে নৌকোটি তীরে এসে লাগলো। যাত্রীরা নৌকো থেকে তীরে নেমে পড়লো একে একে। তারা তৈলঙ্গস্বামীর অপরূপ রূপ আর অলৌকিক কীর্তি তারিফ করতে লাগলো। অকস্মাৎ স্বামিজী অদৃশ্য হলেন। তীরে এলেন একটু পরেই।

রামতারণ তাঁকে দেখে করজোড়ে প্রণাম জানালো। বললো, বলুন আপনি কে? আপনার অসাধারণ শক্তি! আপনি কি ভগবান?

তার কথা শুনে তৈলঙ্গস্বামী হেসে বললেন, বাবা, আমি ভগবান নই। আমি তোমারি মত একজন মানুষ। এই ঘটনা দেখে তুমি বড় আশ্চর্য হয়েছ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এরূপ ক্ষমতা সকল মানুষেরই আছে। তবে মানুষ মাত্রই অনিত্য সংসারসুখে মগ্ন থাকে। নিজের উন্নতির দিকে একবার লক্ষ্য করে না। ভগবানের এই মনুষ্যদেহে প্রত্যেক মানুষেরই ঐশী শক্তি ওতঃপ্রোতভাবে বর্তমান রয়েছে। অনিত্য সংসারের জন্যে মানুষ মাত্রেই যেমন পরিশ্রম করে থাকে তার শতাংশের একাংশও ভগবানের জন্যে খাটালে তাঁকে লাভ করতে পারে। তখন এ বিশ্ব-জগতে কিছুই তার পক্ষে অসাধ্য থাকে না। এতে কিছুমাত্র আশ্চর্য হবার নেই। তুমি জলে আর কেন কষ্ট পাচ্ছ। বাড়ী যাও।

রামতারণ বারবার প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলো নিজের বাসায়।

পরিত্রাতা চেষ্টা করেন পতিতকে রক্ষা করতে। তাই তাঁর আর এক নাম পতিতপাবন। তৈলঙ্গস্বামী সাধনবলে পরম করুণাময় পতিতপাবন ঈশ্বরকে লাভ করেন। ফলে তিনি নানারকম দিব্যশক্তি ও দৈব অনুভূতিতে ধন্য। পতিতদের উদ্ধারে ঐ শক্তি সুন্দর ফল দেয়। তিনি একাধিকবার ঐ শক্তি দেখিয়ে বহু অভাজনকে উদ্ধার করেছেন।

বারাণসীধামে ছিলেন তৈলঙ্গস্বামী। সেখানে বিখ্যাত অসী-ঘাটের কাছেই তুলসীদাসের বাগান। সেই বাগানে থাকতেন। নিয়মিত সাধনভজন করতেন। মাঝে মাঝে ওখান থেকে তিনি লোলার্ককুণ্ডে যেতেন। সেখানে ব্রহ্মসিংহ নামে একজন লোক থাকতো।

তার বাড়ী আজমীরে। সে বধির।

কেবল বধির নয়, দুরারোগ্য ব্যাধিও ছিল। কুষ্ঠব্যাধি। তাকে দেখে স্বামিজীর মনে দয়ার উদ্রেক হলো।

একদিন সে ঘুমিয়ে ছিল।

তৈলঙ্গস্বামী তার গা স্পর্শ করলেন।

ঘুম ভাঙলো ব্রহ্মসিংহের। আড়মোড়া খেয়ে দু'চোখ রগড়াতে রগড়াতে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে তাকালো সামনের দিকে।

দেখলো, তার সামনে একজন সুন্দর যোগী পুরুষ বসে আছেন। মুখে করুণাভরা দিব্য হাসি। হাতে একটি বেলপাতা।

অমনি করজোড়ে স্তব করতে শুরু করলো।

তৈলঙ্গস্বামী তাই শুনে খুশী হলেন। তার হাতে ঐ বেলপাতাটি দিয়ে বললেন, সামনে লোলার্ককুণ্ড। তুমি ওর জলে চান করে এই পাতাটি ধারণ করো। তোমার সব অসুখ ভাল হয়ে যাবে।

ব্রহ্মসিংহ তাই করলো। আগে চান করলো পবিত্র লোলার্ককুণ্ডে। তারপব ধীবে ধীরে তীরে উঠে এসে পরম পবিত্র পাতাটি ধাবণ করলো।

কিছুদিনের মধ্যে তার ব্যাধি ভাল হয়ে গেল। বধিরতা হলো নষ্ট। গায়ের কুষ্ঠরোগও গেল সেরে।

ব্রহ্মসিংহ স্বামিজীর অপার করুণা লাভ করে ধন্য হলো।

একান্ত অনুগত ভৃত্যের মত স্বামিজীর সেবা করতে লাগলো। অগতির গতি, পরম কৃপাময় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিভূ তৈলঙ্গস্বামীর একান্ত অনুগত হয়ে রইলো।

তুলসীদাসের বাগান ছেড়ে এবার স্বামিজী এলেন বেদব্যাসের আশ্রমে।

গঙ্গায় প্রতিদিন চান করে আহ্নিক করতে বসতেন।

একদিন দেখলেন, সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি লোক চান করতে এসেছে।

ভীষণ কাশছে। লোকে বলছে, ওর যক্ষ্মা হয়েছে।

যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সতীনাথ। বারংবার বক্ষদেশে শীর্ণ হস্ত দু'টি বোলাচ্ছে। বেদনাক্লিষ্ট পাণ্ডুব মুখ আর অনুজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে সামনের দিকে করুণ নয়নে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। পথচারীদের গঞ্জনা নীরবে সহ্য করছে। মাঝে মাঝে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলছে, তুমি কৃপা করো ঠাকুর। এ অধমকে কৃপা করো।

তৈলঙ্গস্বামী সেখানে গেলেন। দেখলেন সতীনাথকে। বললেন, এই নে গঙ্গামাটি। এইটা খেয়ে নিস। তার আগে গঙ্গায় চান করে আয়।

বহুদিনের রোগ। অনেক রকম চিকিৎসা করেছে সতীনাথ। তবু আরোগ্য হয় নি।

এবার মহাপুরুষের যদি কৃপা হয় তো রোগ সারবে। গভীর বিশ্বাস রাখলো সতীনাথ স্বামিজীর কথায়।

ঠিকমত চান করে এলো। তারপর গঙ্গামাটি খেলো।

কিছুদিন পরে সে আরোগ্যলাভ করলো। রোগ সেরে যাবার পর প্রতিদিন স্বামিজীর কাছে এসে চরণবন্দনা করতে লাগলো।

সেবাশুশ্রূষায় প্রাণমন ঢেলে দিলো। বললো, প্রভু, আপনি আমার মা-বাপ। আমাকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে বাঁচিয়েছেন। আপনি কৃপা না করলে আমি ইহজীবনে আর রোগমুক্ত হতুম কিনা সন্দেহ।

তৈলঙ্গস্বামী বললেন, যা—যা! ভালভাবে থাকতে চেষ্টা করবি। নিত্য একবার করে ঈশ্বরের নাম নিবি। তাহলে তোর আর কিছু হবে না।

ধন্য তুমি সতীনাথ। ধন্য তাঁর অসীম কৃপা। তিনি কৃপানাথ। তিনি জগন্নাথ। জগতের মঙ্গলের জন্যে অকৃপণভাবে কৃপা করে চলেছেন। তাঁর কৃপায় মূকও বাকশক্তি ফিরে পায়, পঙ্গুও লঙ্ঘন করতে পারে গিরিপর্বত।

আ মরণ! বুড়ো মিন্‌সে, যদি একটা কাণ্ড জ্ঞান থাকে। খেঁকিয়ে উঠলো একজন স্ত্রীলোক।

বারাণসীর হনুমান-ঘাটে এসেছেন স্বামিজী। এখানে বিশ্বেশ্বরের মন্দির আছে। প্রতিদিন বহু পুণ্যার্থী নরনারী এখানে আসে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যে।

একদিন এক মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোক এলো। বিশ্বেশ্বরের পূজো করবে।

তার আগে গঙ্গাস্নান করবার জন্যে গঙ্গার তীরে যাচ্ছিল। এমন সময় দেখলো, একজন উলঙ্গ সাধু তীরে বসে আছে।

স্ত্রীলোকটির মনে ক্রোধ জাগলো। সাধুকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে গালিগালাজ করতে আরম্ভ করলো।

স্বামিজী কিন্তু নির্বিকার। একটি রূঢ় কথা বা অভিশাপের স্ফুলিঙ্গ তাঁর মুখ হতে ঠিকরে রেরুলো না।

স্বামিজীকে গালমন্দ করে স্ত্রীলোকটি বিশ্বেশ্বরের পূজো করলো।

তারপর বাড়ী ফিরে এলো।

ঐদিন বাতে স্বপ্ন দেখলো, বিশ্বেশ্বব এসে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, তুই তোর মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির জন্যে আমার পূজো করতে এসেছিলি। আমাকে দিয়ে তোর মনোবাসনা সিদ্ধ হবে না। ঐ যে উলঙ্গ স্বামিজীকে তুই আজ গালমন্দ করেছিস তাকে দিয়েই মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো স্ত্রীলোকটি। সে রাত্তিবে সুনিদ্রা হলো না। বাকি রাতটা দুর্ভাবনায় কাটলো। মনে মনে আফশোষ করলো, হায়, আমি না জেনে কি ভুলই করেছি। আমি যদি আগে জেনে নিতুম সাধুর পরিচয় তাহলে এমনিধারা গালমন্দ করতুম না। আর বিশ্বেশ্বরও আমার প্রতি রুষ্ট হতেন না।

পরের দিন সকাল হতেই ঘুমচোখে স্ত্রীলোকটি এলো তৈলঙ্গস্বামীর কাছে।

চরণপ্রান্তে পড়ে মাথা কুটতে লাগলো, বাবা, আমার সর্বনাশ হবে। আপনি আমায় কৃপা করুন। ক্ষমা করুন আমার অপরাধ। আমি কাল আপনাকে অপমান করেছি। ক্রোধের বশে যা নয় তাই বলেছি।

স্বামিজী বললেন, কি হলো কি? তুই অমনধারা করছিস কেন?

স্ত্রীলোকটি বললো, আমার স্বামী পেটের যাতনায় বড় কষ্ট

পাচ্ছে। তার পেটে একটা ঘা হয়েছে। আমি প্রতিদিন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আসি। বাবার কাছে প্রার্থনা জানাই। বলি, বাবা, ওকে ভাল করে দাও। তা কাল আপনাকে ন্যাংটা অবস্থায় দেখে আমার বড় রাগ হলো। আমি আপনাকে অনেক কুকথা শুনিয়েছি। আমার অপরাধ......

আর কোন কথা বেরুলো না স্ত্রীলোকটির মুখ থেকে।

তার আগেই স্বামিজী বললেন, তাতে কি হয়েছে। লোকে ভুল করে অনেক সময় অনেক কিছু বলে। ওতে আমি রাগ করি নি।

এরপর সামান্য ভস্ম হাতে নিয়ে স্ত্রীলোকটিকে দিলেন। বললেন, এই ভস্মটুকু নিয়ে যা। তোর স্বামীর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দে। অসুখ ভাল হয়ে যাবে।

স্ত্রীলোকটি ভস্ম নিয়ে এলো। তার আগে বারবার প্রণাম জানালো স্বামিজীকে। স্বামিজীও আশীর্বাদ জানালেন। বললেন, তোর মঙ্গল হোক।

বাড়ী ফিরে দৌড়ে এলো স্বামীর কাছে।

স্বামী দারুণ রোগযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে!

স্ত্রী গিয়ে বললো, এই নাও, বাবা দিয়েছেন। এই ভস্মটুকু পেটে মাখিয়ে দিলে তুমি স্বস্তি পাবে।

যত্ন করে ভস্ম মাখিয়ে দিলো স্ত্রী স্বামীর যন্ত্রণাকাতর উদরে।

কি আশ্চর্য! মাখানোর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যথা কমে গেল।

দৈব ওষুধের এমনি গুণ বটে। দৈব শক্তি বড় শক্তি। তার তুলনা মেলা ভার।

মহাপুরুষপ্রদত্ত ওষুধ কি কখনো ব্যর্থ হয়। এ ওষুধের কাছে মানুষের তৈরী সমুদয় ভেষজ হয় ব্যর্থকাম।

কাশীর হনুমান ঘাট থেকে চলে এলেন স্বামিজী দশাশ্বমেধ ঘাটে। এখানে এসে কিছুদিন থাকলেন।

পবিত্র গঙ্গার জলে অবগাহন করতে লাগলেন। কেবল কি

অবগাহন। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় সাঁতার দিতেন ঐ জলে।

এই সময় রামাপুরা নিবাসী শিউপ্রসাদ মিশ্র এলো তাঁর কাছে। তার একমাত্র পুত্র পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে। অনেক রকম চিকিৎসা করেও ভাল হয়নি। তাই স্বামিজীর কাছে এসেছে যদি তাঁর দিব্যশক্তির বলে ছেলেটি আরোগ্যলাভ করে। অগতির গতি, ভবপারের কাণ্ডারী কৃপা করলে তার পুত্র নবজীবন পেতে পারে।

রুগ্ন ছেলেটিকে স্বামিজীর চরণপ্রান্তে শুইয়ে রেখে শিউপ্রসাদ বললো, বাবা, একে বাঁচান। আমি অনেক দিন ধরে এর চিকিৎসা করিয়েছি। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। আপনি একটু কৃপা করুন। যদি ও ভাল হয়ে ওঠে।

স্বামিজী ছেলেটিকে ভাল করে দেখলেন। ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করার পর গায়ে হাত দিলেন। পরে শিউপ্রসাদকে বললেন, ওকে বাড়ী নিয়ে যাও।

শিউপ্রসাদ বাড়ী নিয়ে এলো। ক্রমে ক্রমে ছেলেটি আরোগ্যের পথে এগিয়ে গেল।

শরীরে পেল বল। অফুরন্ত জীবনীশক্তি। প্রাণে জাগলো নতুন জীবনের আনন্দ—সংগীতময় ছন্দ।

স্বামিজীর অলৌকিক কাজ দেখে বারাণসীধামে তাঁর সুনাম চার-দিকে ছড়িয়ে পড়লো। বহুলোক তাঁর কাছে এসে নানা রকম উপকার পেতে লাগলো।

স্বামিজী লোকের চাপে বড় বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। শেষে কথা বন্ধ করে দিলেন। মৌন রইলেন কিছু দিন।

কেননা, সংসারী লোকদের নিয়ে রাতদিন মেতে থাকলে ঈশ্বরের কাজ করবেন কখন। তাই নীরব রইলেন। ওঁর মৌন অবস্থা দেখে অনেকে নিরাশ হয়ে সরে পড়লো।

এই সময় স্বামিজীকে অনেক রকম খাবার খাওয়াত অনেকে।

স্বামিজীও আগ্রহসহকারে খাবারগুলি খেতেন।

একবার একজনের কাছ থেকে নাকি আধ মণ ওজনের খাবার খেয়ে নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণই বারানসীতে গিয়ে তাঁকে আধ মণ ওজনের খাবার খাইয়েছিলেন।

আরও অনেকের কাছ থেকে খাবার খেয়েছেন। তিনি খুব ভোজনপটু ছিলেন। অথচ এবকম খাওয়ার জন্যে তাঁর কোন অসুখ করে নি।

যোগবলে সবকিছু হজম করে নিয়েছেন।

তিনি খুব খাইয়ে ছিলেন। তাই কতকগুলি দুষ্টপ্রকৃতির লোক একদিন একটা কুমতলব ফাঁদলো।

স্বামিজী একটা ঘরে বসেছিলেন।

বহু ভক্তজন এসে তাঁকে ভোগ দিলো। দু'চারজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক একটা হাঁড়িতে করে এক প্রকার পানীয় আনলো। স্বামিজীকে উপহার দেবে।

ওরা দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের দরজার কাছে। ইতস্তত করতে লাগলো ভেতরে আসতে। ভাবলো, হাঁড়ির মধ্যে জলের সঙ্গে চুণ আর আফিম গোলা রয়েছে। এটা কিভাবে নিয়ে যাবে স্বামিজীর কাছে? কেমন করে দেবে তাঁকে উপহার? দিলে যদি তিনি বুঝতে পারেন। ওদের সমস্ত কুমতলব ধরা পড়বে। পাঁচজনের কাছে হেয় হবে।

ওদের ওরকম ভাব দেখে স্বামিজী বললেন, কিগো, তোমরা ওরকমভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কি আছে তোমাদের কাছে?

ওরা স্বামিজীর কথা শুনে সবিনয়ে বললো, বাবা, আপনার জন্যে সামান্য কিছু এনেছি।

কৈ দাও। খেয়ে দেখি।

দু'হাত বাড়িয়ে চেয়ে নিলেন তৈলঙ্গস্বামী। ওরা তুলে দিলো স্বামিজীর হাতে সেই বিষাক্ত পানীয়।

স্বামিজী হাঁড়িটা নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে পান করলেন। কোনরকম বিকারলক্ষণ ফুটে উঠলো না তাঁর মুখেচোখে।

ওরাও মনে মনে খুব খুশী। ভাবলো, এতদিনে আমাদের মনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। এবার ভণ্ড সাধু অক্কা পাবে।

স্বামিজী ওদের মনোভাব বুঝতে পারলেন। অমনি চোখদুটো বড় বড় করে তাকালেন ওদের দিকে। তারপর বললেন, ছাখ্—

শিশুর মত সেখানে প্রস্রাব করলেন। প্রস্রাবের সঙ্গে আলাদাভাবে জল, আফিম ও চুন বেরিয়ে এলো!

ওরা অবাক হলো। বিস্মিত হয়ে ভাবলো, এ কার কাছে এসেছে! ইনি যে একজন মহাপুরুষ!

বারংবার প্রণাম জানালো। নিজেদের কুকাজের কথা স্মরণ করে লজ্জা পেল। আত্মগ্লানিতে মনপ্রাণ ভরে উঠলো।

সন্ধ্যের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে স্বামিজীর আশ্রম ত্যাগ করলো।

অনেক দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ একাধিকবার স্বামিজীকে সাধনমার্গ হতে ভ্রষ্ট করার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনবারেই সফলকাম হয় নি। তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। নির্বিকারচিত্ত মহামানব।

তৈলঙ্গস্বামী যে কত বড় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন তা নিম্নোদ্ধৃত কাহিনীটি পাঠ করলেই বেশ বোঝা যায়—

'অনেক দিনের কথা—স্বামিজী সবে মাত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়ে যেখানে সেখানে তখন প্রায়ই আলোচনা হইত। কাশীবাসী একটি অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি বাল্যাবধি স্বামিজীর সহিত নানা সূত্রে সঙ্গ করিতেন, আমরা অবসর মত তাঁহার নিকট বসিয়া অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব পুরাতন কথা শুনিতে পাইতাম। তিনিও বেশ ভগবদ্ভক্ত ও সরল হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন। একদিন তিনি সেই তৈলঙ্গস্বামিজীর জীবনকথা প্রসঙ্গে বলিলেন, 'আমরা তখন ছেলেমানুষ, সঁবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি। ২০।২৫ বৎসর মাত্র আমাদের বয়ঃক্রম হইবে। এ দেশে এই সময়কে 'গাধা-পচিশী' অবস্থা বলে। বাস্তবিক গাধার মত বুদ্ধি লইয়াই আমরা কতকগুলি সমবয়সী সঙ্গী মিলিয়া স্বামিজীকে একবার উৎকট

পরীক্ষা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলাম। সকলে মিলিয়া কিছু টাকা একত্র করিয়া স্বামিজীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক নিবেদন করিলাম—'মহারাজ, আমরা একদিন আপনার বিশেষরূপ সেবা করিতে চাই।' স্বামিজী তখন কথাবার্ত্তা কহিতেন। তিনি উত্তরে অনুমতি প্রদান করিলেন। আমরা তখন যৌবনের প্রথম বিকাশে উন্মত্তপ্রায় ও অতিশয় দুষ্টবুদ্ধিপরায়ণ। আমরা অধিকমাত্রায় উগ্রবীর্য্য মদ্য ও মাংসাদি সমন্বিত নানা আহার্য্য এবং ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করিলাম। সে সব একটি নির্জন বাটীতে রাখিলাম; ইহা ব্যতীত বাজারের একটি যুবতী বেশ্যাকেও দশটি টাকা দিয়া তথায় আনিয়া রাখিলাম। তাহার সহিত আমাদের এই সর্ত্ত ছিল যে, আমরা কেহই সম্মুখে থাকিব না—তুমি স্বামিজীকে মদ-মাংসাদি খাওয়াইয়া, তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া, তাঁহার কামের উদ্রেক করাইবে। যদি পার, তবে আরও দশ টাকা আমরা তোমাকে পুরস্কার দিব। বেশ্যা রাজী হইয়া হৃষ্টচিত্তে আসিয়া তথায় বসিয়া আছে। আমরা স্বামিজীকে পূর্ব কথামত সমাদরে তথায় আনিয়া দিলাম। তিনি উপবেশন করিলে—বেশ্যাটি খুব আনন্দসহকারে যেন অতি ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল, ও নানা ভাব-ভঙ্গীতে তাঁহাকে মদ্যাদি পান করাইতে আরম্ভ করিল। আমরা তাহা দেখিয়া একে একে সব বাহিরে সরিয়া পড়িলাম। আশে-পাশে খুব সাবধানে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। সে মদ-মাংস ক্রমাগত খাওয়াইয়া যাইতেছে। তিনিও অম্লান বদনে তাহা সমস্তই উদরস্থ করিতেছেন, সে মদ বোধ হয় বিশ জন পাঁড়-মাতালেও উদরস্থ করিতে পারে না। কিন্তু স্বামিজী আমাদের সমস্ত পান করিয়াও অচল অটল, যেন স্থির পাষাণ-মূর্ত্তি। তাহার সহিত সেই প্রচুর খাদ্য সামগ্রীও তিনি অবলীলাক্রমে সমুদয় উদরস্থ করিয়া যাইতেছেন। আমরা ত সেই সব ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অবাক। সেই বেশ্যাটিও টাকার লোভে তাঁহার কামোদ্দীপনার অভিলাষে যতদূর সম্ভব উত্তেজনাকর ক্রিয়া করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিতেছে না। সত্য বলিতে কি

'আমাদের সে ভাব দেখিয়া মনে হইতে লাগিল—'রক্ত-মাংসযুক্ত জীবদেহ কখনই এমনভাবে স্থির থাকিতে পারে না! প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এই ভাবে সে বেচারী ধস্তাধস্তি করিবার পর, নিজেই সম্পূর্ণ ক্লান্ত হইয়া অতি বিমর্ষ-অন্তরে উঠিয়া নিজ বস্ত্রাদিতে সৌষ্ঠব-সম্পন্না হইয়া বাহিরে আসিল ও তাহার অকৃতকারিতা জ্ঞাপন করিল। আমরা অন্তরাল হইতে স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়াছি, সুতরাং তাহার আর বলিবার কিছুই ছিল না। তাহাকে বিদায় দিয়া আমরা স্বামিজীর সম্মুখে ক্রমে ক্রমে সকলে উপস্থিত হইলাম।

তিনি পূর্বের ন্যায়ই নির্বিকার ও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে, আমরা বলিলাম—'মহারাজ কি এখন আশ্রমে যাইবেন?' (পঞ্চগঙ্গার ঘাটের নিকট তাঁহার আশ্রম, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'দক্ষিণ-কালিকা'র মূর্ত্তি ও সাধনার যন্ত্রাদি এখনও সমভাবে তথায় রক্ষিত আছে।) তিনি আমাদের কথার উত্তরে কিছুই বলিলেন না। আমরা যে তাঁহাকে সাধারণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানববোধে অতি ঘৃণা ও কদর্য্যভাবে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, সে কথা তিনি পূর্ব্বাহ্ণেই স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার তদবস্থার কি এক প্রকার ভীষণ গাম্ভীর্য দেখিয়া, তখন আমরাও যেন চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। তিনি আমাদের কোনরূপ বিশেষ শিক্ষা বা শাসন করিবার ছলেই যেন আমাদিগের দিকে একবার তীব্রভাবে চাহিয়া দেখিলেন ও কিয়ৎপরেই কি এক বিচিত্রভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তখন তিনি বলিলেন,—'সে কোথায়, সে কোথায় গেল? কে আমার কামের উদ্রেক করাইবে? আমি কি কামের অধীন? তোদের অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহরাও দুশো বছর আগে আমার এই অবস্থায় দেখে গেছে। আমি এত কালের বৃদ্ধ বলিয়াই কি বীর্য্যহীন, না তোদের মত নিস্তেজ নিষ্প্রভ? তবে এই দেখ—' বলিতে বলিতে তাঁহার সেই নিস্তেজ লিঙ্গ অসাধারণ দীর্ঘ হইয়া উঠিল। মানবলিঙ্গ এতাধিক দীর্ঘ হইতে পারে, তাহা কাহারও কল্পনাতেও আসে না। আমরা সকলেই তখন চিত্রিতবৎ স্থির হইয়া রহিলাম। মুখে কাহারও 'টু' শব্দটিও নাই, সকলেই ভীত ও অবাক্।

স্বামিজী তখন নিজ দক্ষিণকর কোষবদ্ধ করিয়াই তাহাতে অনায়াসে লিঙ্গভ্রষ্ট যথেষ্ট পরিমাণ শুভ্র পারদসম উজ্জ্বল প্রগাঢ় বীর্য্য গ্রহণ করিলেন আর বলিলেন—'দেখ, তোরা নিতান্ত বালক, প্রকৃত যোগী, সাধু-সন্ন্যাসী যে কি বস্তু, কিছুই তোরা জানিস না, তাই তোদের বলিতেছি—খবরদার, আর কখনও এমনভাবে সন্ন্যাসী বা যোগীসাধুকে পরীক্ষা করিতে যাস না। বীর্য্যহীন শিথিলেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনও জিতেন্দ্রিয় যোগী হইতে পারে না, জানিস? আমার হাতে এ কি দেখছিস? এ বিশ্ব-নাশক তেজঃঅগ্নি, ইহা ভূমিস্পর্শ হইলে, এখনই জ্বলিয়া উঠিবে, তোরা সবংশে তাহাতে একেবারে ভস্ম হইয়া যাইবি। তোদের আজ ক্ষমা করিলাম।'—এই বলিয়াই তিনি তাহা নিজের মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার মুখ তখন অলৌকিক ভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

এই সব কথা বলিতে বলিতে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যেন কাঁপিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখে তখনও ভয়-বিহ্বলতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল। আমিও যেন স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—'শিবের মদন ভস্ম কি এই?' (বিহারীবাবা—সচ্চিদানন্দ সরস্বতী পৃঃ ১৩১-১৩৫)

কাশীতে স্বামিজী ছিলেন।

ওঁর নামডাক ছিল প্রচুর। বহু গুণীজ্ঞাণী, অর্থবান লোক আসতো গঙ্গাস্নানে।

ওরা স্বামিজীকে দর্শন করে যেত। স্বামিজীকে ওরা বিশ্বনাথের মত ভাবতো। অনেক সময় ওরা স্বামিজীকে দামী বস্ত্র ও অলঙ্কার উপহার দিতো। স্বামিজী ওগুলি নামমাত্র পরতেন। পরে সবগুলি বিলিয়ে দিতেন গরীবদের মধ্যে।

একবার একজন ধনী ওঁকে বিশভরি ওজনের দু'গাছা সোনার বালা উপহার দিলো।

স্বামিজী ঐ বালাজোড়া ধারণ করলেন। কিন্তু একজন চোরের

মনে আসক্তি জাগলো। সে ঐ বালা চুরি করবে। যেমন করেই হোক নেবে।

একদিন স্বামিজীকে প্রচুর মদ খাওয়ালো ঐ লোকটি। তার ধারণা প্রচুর মদ খেলে স্বামিজী হতচৈতন্য হয়ে পড়বেন। তখন ওঁর বালা দু'গাছা চুরি করতে কোন রকম বেগ পেতে হবে না।

স্বামিজী পেট পুরে মদ খেলেন। তাঁর মধ্যে কোন রকম বিকার দেখা গেল না।

নির্বিকারভাবে হাসতে লাগলেন ওদের কুকীর্তি স্মরণ করে।

তারপর বললেন, ও, তোদের বুঝি এই বালা দু'গাছার ওপর নজব পরেছে! তা নে, নিয়ে যা।

বালা দু'গাছা খুলে দিলেন। ওরা তাই নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। সহজে অভীষ্ট কর্ম সিদ্ধ হয়েছে জেনে অপার আনন্দসাগরে ডুব দিলো।

এমনিভাবে কতবার কতলোক এসে ওঁর কাছ থেকে মূল্যবান জিনিসগুলি একে একে নিয়ে এসেছে। উনিও কিছু বলেন নি। এক কথায় দিয়ে দিয়েছেন।

কাশীতে ছিলেন স্বামিজী। একেবারে উলঙ্গ অবস্থায়। কয়েক-জন লোক তার জন্যে আপত্তি জানালো। ওরা বাঙালী। স্বামিজীর কাছে এসে বললো, আপনি এভাবে উলঙ্গ থাকেন কেন? কাপড় পরতে পারেন না। ঠিকমত কাপড় পরে থাকবেন। তা না হলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো।

স্বামিজী শুনলেন না ওদের কথা। নির্বিকারভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়ালেন। দেহের কোথাও এক টুকরো আচ্ছাদন সেই। নিরাবরণ শরীর।

যিনি তদ্‌গতপ্রাণ—ঈশ্বরের ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল তাঁর আবার ভয় কিসে?

স্বামিজী ওদের কথা শুনলেন না। ওরা থানায় এসে দারোগার

কাছে নালিশ জানালো। দারোগা পুলিশকে পাঠালো। বললো, এক্ষুণি গিয়ে সাধুটাকে ধরে আনো।

পুলিশ এলো। স্বামিজীর হাতে হাতকড়া দিতে এলো। স্বামিজী অকস্মাৎ ওখান থেকে অন্তর্ধান করলেন।

পুলিশ ব্যাপারটা দেখে অবাক হলো। বললো, একি! এই তাঁকে দেখলুম আবার তিনি কোথায় গেলেন?

আবাব ভাবলো, তবে কি তিনি মানুষ নন? ভূত না দেবতা?

নানারকম প্রশ্ন এসে জমা হলো পুলিশের মনে। বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলো থানায়।

পুলিশকে ফিরে আসতে দেখে দারোগা জিজ্ঞেস করলো, কি হলো? সাধুকে ধরে আনতে বললুম যে।

পুলিশটি বললো, হুজুর তিনি সেখানে নেই। আমি ধরতে যাবো এমন সময় দেখি তিনি অদৃশ্য হলেন।

দাবোগা বিস্মিত হলো। বললো, সে কি কথা!

কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে বসে রইলো চেয়ারে।

পুলিশের মুখেও কোন কথা নেই। ঘরময় এক বিরাট মৌনতা বিরাজ করতে লাগলো।

এমন সময় একজন লোক এসে খবর দিলো, ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম হয়েছে কেউ যেন সাধুটির গায়ে হাত না দেয় বা তাঁর ওপর কোন-রকম অত্যাচার না করে। এমন কি পুলিশ পর্যন্তও না। সাধুর যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারেন।

দারোগা শুনে সুস্থির হলো। মন থেকে সব অশান্তি চলে গেল। ভাবলো, হায়! আমি কি ভুল করেছি। একজন মহাপুরুষকে ওভাবে অপমান করতে গেছলুম!

ইতিমধ্যে স্বামিজী ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে সোজা চলে এলেন হাকিমের কাছে। হাকিম তাঁর অলৌকিক কাণ্ড দেখে মুগ্ধ হলেন। তখন তাঁর প্রতি ঐরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আর একবার স্বামিজীকে নিয়ে কাশীতে মহা হৈ চৈ পড়ে যায়।

একজন উগ্র প্রকৃতির দারোগা বদলী হয়ে এলো। তার কাছে কয়েক জন দুষ্ট প্রকৃতির লোক এসে বললো, মশাই, এক ভণ্ড সাধু এখানে আছে। সাধুটা সদাসর্বদা ন্যাংটা হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনি ওকে বন্দী করে হাজতে রেখে দিন।

দারোগা দলবল নিয়ে বন্দী করে আনলো। স্বামিজী হাজতে রইলেন। একরাত্রি মাত্র।

পরদিন সকালে তাঁকে হাজতের বাইরে বেড়াতে দেখা গেল।

প্রহরী স্বামিজীকে দেখে অবাক হলো। একটা দৃশ্য দেখে আরও বিস্মিত হলো। স্বামিজী যে ঘরে ছিলেন সেই ঘর জলে ভাসছে।

জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো, স্বামিজী রাত্তিরে ঘরে প্রস্রাব করেছেন। দরজা ছিল বন্ধ। তাই বাইরে আসতে পারেন নি।

খবরটি তখনি হাকিমের কাছে গেল। হাকিম এলেন দেখতে এই কৌতূককর ঘটনাটি।

স্বামিজীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে বাইরে এলে? আর ঘরের মধ্যে এত জল এলো কোথা থেকে?

স্বামিজী বললেন, রাত্তিরে আমার খুব প্রস্রাবের বেগ এসেছিল। দরজায় তালা লাগান ছিল। বাইরে আসতে পারি নি। তাই আমাকে বাধ্য হয়েই ঘরের মধ্যে প্রস্রাব করতে হয়েছে। তারপর সকালে যখন বাইরে আসবো ভাবলুম, দেখলুম দরজা খোলা রয়েছে। কোনরকম বাধা না পেয়ে আমি বাইরে এসেছি।

হাকিম শুনে বিস্মিত হলেন। দারোগাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কেউ দরজা খুলে রেখেছিলেন?

দারোগা বললো, না।

স্বামিজী মৃদু হেসে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, আপনি নিশ্চয় জানবেন চাবি বন্ধ করে কেউ কারও জীবন আবদ্ধ রাখতে পারে না।

তাহলে মৃত্যুর সময় হাজতে রাখলেই তো আর কেউ মরতো না। আপনার সে ক্ষমতা নেই। তবু এত রাগ কেন?

হাকিম তাই শুনে অনুচরদের বললেন, এঁকে তোমরা আর কেউ বিরক্ত করো না। ইনি স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছে বেড়ান।

স্বামিজী হাজতে যখন ছিলেন তখন দু'জন বিশিষ্ট লোক এসে হাকিমকে বললো, স্বামিজী একজন মহাত্মা। ওঁকে ওভাবে আটক না রেখে ছেড়ে দেওয়া হোক। ওঁর খুব কষ্ট হচ্ছে।

তাই শুনে হাকিম বিদ্রূপ করে মন্তব্য করলেন, যদি সত্যিই সে মহাত্মা হয় তাহলে তার তো কোন বিচার নেই। সে আমাদের খানা খেতে পারে।

স্বামিজী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইংরেজ হাকিমের কথা শুনে বললেন, আমি আপনাদের খানা খেতে পারি কিন্তু তার আগে আপনাকে আমার খানা খেতে হবে।

হাকিম বললেন, দাও তোমার খানা। আমরা খাবো।

স্বামিজী তখন একটু দূরে গিয়ে মলত্যাগ করলেন।

হাকিমের কাছে এসে বললেন, এই নাও আমার খানা।

হাকিম মলের দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারলেন না। নাকে রুমাল দিলেন। এদিকে রাগও হলো মনে মনে।

তখন তৈলঙ্গস্বামী হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। হাকিমের কাছে এসে বললেন, তোমরা আমার খানা খেতে পারছো না। দেখবে তবে আমি খেয়ে নেবো।

এই বলে স্বামিজী নিজের হাতে তাঁর খানা খেয়ে ফেললেন। মুখেচোখে কোন রকম বিকারভাব দেখা গেল না। মনে হলো, তিনি যেন পরমান্ন খাচ্ছেন। সেই সঙ্গে প্রকাশ পেল সুগন্ধ।

হাকিম তাঁর ঐ আলৌকিক ক্রিয়া দেখে মুগ্ধ হলেন। তখনি তাঁকে ছেড়ে দেবার আদেশ দিলেন।

কিন্তু দুষ্ট জনসাধারণ পুলিশের সাহায্য নিয়ে আবার স্বামিজীর পেছনে লাগলো।

একদিন একটি লোহার সিন্দুকের মধ্যে স্বামিজীকে আটক রাখার কল্পনা করলো।

একটি ছিদ্রবিশিষ্ট লোহার সিন্দুক তৈরী করলো। পরে সেটি স্বামিজীর কাছে নিয়ে এলো।

স্বামিজী ইতিমধ্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। আর উঠলেন না।

পুলিশের লোকেরা জলে জাল ফেলে স্বামিজীকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু পেল না।

ওরা হতাশ হয়ে চলে গেল।

সেদিন স্বামিজী আর জল থেকে ওঠেন নি। ভাসমান শিলাখণ্ডের ন্যায় জলের ওপর ভেসে যেতে থাকেন।

কেবল সেদিন কেন, এরপর অনেককাল অতিবাহিত হলো। দীর্ঘ তিনমাস চলে গেল।

স্বামিজী ওখান থেকে চলে এলেন ত্রিবেণীতে। ওখানকার গঙ্গার জলের ওপর পদ্মাসনে বসে থাকতে দেখা গেল তাঁকে।

এমনি অলৌকিক শক্তি ছিল তৈলঙ্গস্বামীর।

পুলিশের লোক স্বামিজীর অলৌকিক শক্তির কথা জানতে পারলো। তাঁকে যত্নসহকারে নিয়ে এলো কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে। ঘোষণা করলো, তৈলঙ্গস্বামী মহাত্মা। কেউ যেন তাঁর প্রতি বিদ্রূপ বা অন্যায় আচরণ না করেন। তিনি যেখানে সেখানে ভ্রমণ করতে পারবেন।

সাধারণ লোক সরকারের ঘোষণা শুনে স্বামিজীকে আর বিরক্ত করলো না।

এরপর থেকে বহু নরনারী স্বামিজীকে পুজো করতে এলো।

কিন্তু ওরা আগের মত অমন সুবিধে পেল না স্বামিজীর কাছ থেকে।

এখন থেকে তিনি নির্জন পরিবেশ আর সাধনভজন অধিক পছন্দ করতে লাগলেন।

খালিসপুরার বিখ্যাত পণ্ডিত দেবনারায়ণ বাচস্পতি তৈলঙ্গ-

স্বামীকে একবার নেমন্তন্ন করলো। নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে স্বামিজীকে খাওয়ালো।

খাওয়ানো শেষ হলো।

এবার জল পান করবেন স্বামিজী। কিন্তু পানীয় জল দেওয়া হয় নি।

সব দেওয়া হয়েছে। আহারের সব সামগ্রী। কিন্তু জল নেই। জলের অভাবে খাওয়া বন্ধ হলো না। স্বামিজী আগেই খাবার-গুলি খেয়ে নিলেন।

বাচস্পতি জল দেয় নি। তার জন্যে তৈলঙ্গস্বামী আগে থেকে কিছু বলেন নি। তাঁর অলৌকিক শক্তির বিকাশ প্রকাশ করার জন্যেই হয়তো তিনি মৌনী ছিলেন। বিস্মৃতি এনেছিলেন বাচস্পতির মনে। তা নাহলে খাবারের সঙ্গে পানীয় জল দেয় না এমন লোক ক'জন আছে সংসারে।

আহারান্তে পানীয় জল চাইলেন তৈলঙ্গস্বামী। বাচস্পতি নিজের ভুল বুঝতে পারলো। জল আনতে গেল।

ইতিমধ্যে তৈলঙ্গস্বামী জল পান করলেন।

বাচস্পতি ফিরে এসে দেখে স্বামিজী তৃপ্তির সঙ্গে জলপান করছেন।

অবাক হলো, একি ব্যাপার! একটু আগে দেখলুম ওঁর কাছে জলের গেলাস নেই। হঠাৎ কে আনলো ঐ জলের গেলাস?

চারদিকে তাকিয়ে দেখলো।

কাউকে দেখতে পেল না। তখন বুঝতে পারলো, এ তাঁরই অলৌকিক ক্রিয়া।

নিজের ভুল আর অক্ষমতার কথা স্মরণ করে মনে মনে লজ্জিত হলো বাচস্পতি।

হাতের জল হাতেই রয়ে গেল।

পরে জলের পাত্রটি হাত থেকে নামিয়ে রেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম

জানালো সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তৈলঙ্গস্বামীকে। মনে মনে সকাতর প্রার্থনা জানালো, আমার মত মূর্খকে ক্ষমা করো বিশ্বপতি। আমার অজ্ঞানতা দূর করো। আমার কোন শক্তি নেই। আমি শক্তিহীন। তোমার সেবা নেবার মত ক্ষমতা আমার নেই। তুমি কৃপা করলে সব হয়। তোমার সেবা তুমি করাও জীবের হাত দিয়ে। আমরা নিমিত্তমাত্র। সাধারণ জীব বোঝে না কিছু। মিথ্যা অহঙ্কার আর অভিমান আশ্রয় করে থাকে। তুমি এসে সে অহঙ্কার চূর্ণ করো। কী তোমার অপার লীলা। কী মহিমাময় তোমার করুণা।

আমি জ্ঞানান্ধ। তোমার সেবা করছি বলে আমার মনে অহঙ্কার জেগেছিল। আজ তুমি আমার মনের সেই নীরব অহঙ্কার খর্ব করলে। ধন্য তোমার কৃপা। ধন্য তোমার শক্তির অপূর্ব লীলা। তুমি আমার প্রকৃত জ্ঞানের গুরু। তোমার শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম।

একজন স্বাধীন দেশীয় রাজা এলেন কাশীতে। সঙ্গে ছিল রাণী, দাসদাসী এবং অনুচরবৃন্দ।

রাজা ও রাণীর একান্ত ইচ্ছে, দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নান করে পুণ্য সঞ্চয় করবেন। কিন্তু ওঁরা প্রকাশ্য দিবালোকে জনগণের মধ্যে বেরুবেন না। তাই রাজা যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখান থেকে গঙ্গার কোল বরাবর কাপড়ের পর্দা ফেলা হলো। পর্দার দু'পাশে প্রহরীরা পাহারা দিতে লাগলো। যদি কোন বাইরের লোক আসে এই আশঙ্কায়।

রাজা ও রাণী নির্বিঘ্নে চান করতে নামলেন জলে। এমন সময় তৈলঙ্গস্বামী উলঙ্গ অবস্থায় রাণীর সামনে আবির্ভূত হলেন। জ্যোতির্ময় সুপুরুষ দিগম্বর মূর্তি। বড়ই অপরূপ।

রাণী ওই দৃশ্য দেখে আশঙ্কা ও বিরক্তিতে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। লজ্জায় অবনত মস্তকে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরের দাসীরা তাঁর অনুগমন করলো।

রাজার মুখচোখও রাগে রক্তিম রূপ ধারণ করলো। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কিভাবে ঐ উলঙ্গ লোকটিকে শাস্তি দেওয়া যায়।

লোকজন এসে দাঁড়ালো একে একে।

রাজা তৈলঙ্গস্বামীর নাম ধাম জিগ্যেস করলেন।

তৈলঙ্গস্বামী নিরুত্তর রইলেন।

শেষকালে লোকজনকে ডেকে আদেশ দিলেন, এঁকে ওপরে নিয়ে যাও। আমি দেখছি কি করতে পারি।

অনুচররা তৈলঙ্গস্বামীকে ধরাধরি করে গঙ্গার ওপরে নিয়ে এলো।

রাজাও চান করে তীরের ওপরে এলেন।

তৈলঙ্গস্বামী তীরের ওপর দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর শরীর নিস্পন্দ। মন নির্বিকার। দৃষ্টি শান্ত ও প্রসারিত। স্মৃতি স্নিগ্ধ ও স্বাভাবিক।

হাসতে লাগলেন রাজাকে দেখে।

কি সুন্দর দিব্য হাসি। আনন্দের শতধারা মাখান রয়েছে সে হাসিতে।

রাজা সে হাসি উপেক্ষা করলেন। ভ্রূকুটি দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন তৈলঙ্গস্বামীকে, কি কারণে ও কি উপায়ে তুমি এখানে এলে ?

স্বামিজী কোন উত্তর দিলেন না।

যারা স্বামিজীকে চিনতো তারা বড় বিব্রত বোধ করলো।

কিভাবে স্বামিজীর মুক্তি আসে সেই উপায় চিন্তা করতে লাগলো। পরস্পর পরস্পরের কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলাবলি করলো।

রাজার কানে তার কিছু কিছু গেল।

রাজা দু'তিন জন অনুচরদের বললেন, ওঁকে ছেড়ে দাও।

অনুচররা স্বামিজীকে মুক্তি দিলো বটে কিন্তু নানারকম অত্যাচার উৎপীড়ন চালালো। মারধোর করলো স্বামিজীকে।

সারাদিন কেটে গেল। রাত এলো। রাজা শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

রাতে স্বপ্ন দেখলেন, একজন ভীমকায় শ্বেতাঙ্গ পুরুষ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে ত্রিশূল। গায়ে ব্যাঘ্রচর্ম। মাথায় জটা।

সেই শ্বেতাঙ্গ পুরুষ রাজাকে লক্ষ্য করে বলছেন, ওরে দুরাচার পামর তুই তৈলঙ্গস্বামীর প্রকৃত পরিচয় জেনেও দিনের বেলায় তাঁর অবমাননা করে আমার হৃদয়ে যে ব্যথা দিয়েছিস তার সমুচিত দণ্ড তোকে নিশ্চয়ই ভোগ করতে হবে। ওরে মূর্খ! তুই কিছুতেই এ পবিত্র স্থানের যোগ্য নস্। তাড়াতাড়ি স্থানান্তরে যা। নচেৎ আজ তোর কিছুতেই নিস্তার নেই।

রাজা ঐ রকম ভীষণ স্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠলেন।

অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে গেলেন খাট থেকে।

ভৃত্যগণ এসে তাঁকে সেবাযত্ন করতে লাগলো। তিনি অচিরে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

পরদিন লোক পাঠালেন স্বামিজীর সন্ধানে।

জানতে পারলেন, স্বামিজী আছেন অমুক জায়গায়।

সে জায়গায় এলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন, আমি না বুঝে অপরাধ করেছি। আমায় ক্ষমা করুন।

স্বামিজীর মুখে সেই আগের মত হাসি।

নিত্য হাস্যভরা আননে তাকিয়ে রইলেন রাজার মুখপানে। তারপর হাত নেড়ে বললেন, যা, আমি তোর অপরাধ ক্ষমা করেছি। দেখিস্, আর যেন কখনো এরকম ভুল না হয়।

দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে স্বামিজী চলে এলেন পঞ্চগঙ্গার ঘাটে।

ঘাটের কাছেই বিন্দুমাধবের মন্দির। তার কাছে তিনি অবস্থান করতে লাগলেন।

এই সময় স্বামিজী মৌনব্রত অবলম্বন করতেন। বহু লোক তাঁর কাছে আসতো। তিনি ইসারায় তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে লাগলেন।

মহারাষ্ট্রের লোক মঙ্গলদাস ঠাকুর স্বামিজীর শিষ্য হয়ে সেবার ভার নিলো। মৌনজীবনের শেষে ৮০ বছর ধরে তৈলঙ্গস্বামী মঙ্গলদাসের কুটিরে অবস্থান করতেন।

তার মা অম্বাদেবী ও ছোট ভাই কৃষ্ণপ্রসাদ স্বামিজীর সেবাকাজে যোগ দিলো।

অম্বাদেবী রান্নার কাজ করতো আর কৃষ্ণপ্রসাদ দেখাশোনা করতো স্বামিজীর গাভীটিকে।

তাঁর একটি গাভী ছিল।

মঙ্গলদাস ঠাকুর স্বামিজীর সঙ্গে সর্বদা থাকতো। তিনি তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

মঙ্গলদাস স্বামিজীর ইসারা বুঝতে পারতো। যদি কোন লোক স্বামিজীর কাছে ধর্মোপদেশ শুনতে আসতো তিনি মঙ্গলদাসকে বলে দিতেন ইসারা করে।

মঙ্গলদাস সেইটি কাগজে লিখে দেখাতো আগন্তুককে।

অনেক রকম উপদেশ লেখা থাকতো স্বামিজীর ঘরের দেওয়ালে। আর্তের সেবা, ঈশ্বরের করুণালাভের জন্যে সকাতর প্রার্থনা, প্রাত্যহিক জীবনে সংযম ও সাধনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ তাতে ছিল।

স্বামিজীর নির্দ্দেশমত মঙ্গলদাস সেগুলি যথাযথ ব্যাখ্যা করে দিতো সমাগত ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে।

এই সময় স্বামিজী পঁচিশ-ত্রিশখানা হাতে লেখা পুস্তক প্রণয়ন করেন।

বহুলোক যত্ন এবং শ্রদ্ধাভবে স্বামিজীকে ভোজন করাতো। তিনিও সাক্ষাৎ বিশ্বনাথের ধ্যানগম্ভীর মূর্তি নিয়ে একাসনে অবস্থান করে তাদের দেওয়া আহার্য দ্রব্য সানন্দে গ্রহণ করতেন। কখনো এক পোয়া দুধ, কখনো বা তার পরিমাণ হত একমণ। তাঁর গ্রহণ-সামর্থ্য ছিল অসাধারণ। অলৌকিক এবং যৌগিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন বলেই সাধারণ মানুষের কাছে যা অসম্ভব কাজ বলে মনে হতো তা তিনি অনায়াসে সম্ভব করতে পারতেন।

উজ্জয়িনীর মহারাজা এলেন কাশীতে ভ্রমণোদ্দেশ্যে। নৌকোয় আরোহণ করে মণিকর্ণিকার ঘাটে আসতে লাগলেন। সঙ্গে ছিল লোকজন—পাত্রমিত্র।

নৌকো এগিয়ে চললো। সুন্দর স্নিগ্ধ সকাল। চতুর্দিকে মলয় বাতাস বইছিল।

মহারাজার মনও সেদিন প্রকৃতির মত সুন্দর হয়ে উঠলো। খুশীর গভীর আমেজ স্পর্শ করে তাজা গোলাপের মত রূপ ধারণ করলো। নৌকোর ওপর গান-বাজনার বিরাট আয়োজন হয়েছিল। সকলে শুনছিল তন্ময়চিত্তে—ভাবভরা হৃদয়ে।

এমন সময় মহারাজার নজরে পড়লো অদূরে গঙ্গাজলের ওপর।

নিস্তরঙ্গ জলের ওপর বসেছিলেন তৈলঙ্গস্বামী। অক্লেশে ভেসে চলেছেন।

মহারাজা ঐ দৃশ্য দেখে অবাক হলেন। অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলেন মহাপুরুষের দিকে।

দেখলেন, যেমন ওঁর রূপ তেমনি অপরূপ লীলা। উনি কে? কি ওঁর নাম? এর আগে ওঁকে ত কখনো দেখি নি!

জনৈক লোককে প্রশ্ন করলেন মহারাজা, উনি কে?

লোকটি তৈলঙ্গস্বামীর ভক্ত।

বললো মহারাজাকে, উনি একজন প্রসিদ্ধ যোগী পুরুষ। জলেস্থলে ওঁর সমান অধিকার। ওরকম অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন যোগী পুরুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

মহারাজা কৌতূহলী হয়ে বললেন, যিনি নিজের শরীরের ভেতর শত্রুদের দমন করে নিজের বশে এনেছেন, বাইরের সামান্য শত্রুরা তাঁর কিঁ করতে পারে? ওঁকে নৌকোয় ওঠাবার ইচ্ছা করি। দয়া করে আসবেন কি?

মহারাজার কথা শুনে আনন্দিত হলো ভক্তটি।

তখনি মাঝিকে হুকুম দিলো, এই ওখানে নৌকো নিয়ে চ। স্বামিজী যেখানে বসে আছেন, হোথায়।

মাঝি আস্তে আস্তে নৌকো নিয়ে এলো যোগী পুরুষের কাছে।

যোগীপুরুষও নৌকো দেখে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হলেন না। চলে গেলেন না অন্যত্র। স্থিরভাবে জলের ওপর বসে রইলেন। যোগাসন। দেখছিলেন ব্যাপারটি কি।

অন্তর্যামী মহাপুরুষের পক্ষে কোন কিছু না বোঝা বা অজানা থাকে না। তিনি সবই জানেন বা বোঝেন! তবু নির্বিকার রইলেন। অপলক নেত্রে লক্ষ্য করতে লাগলেন নৌকোর গতিবিধি আর মহারাজার মনোভাব।

তিনি সবই জানতেন। পরের ঘটনা কি রূপ নেয় তা তাঁর অজানা ছিল না। তবু তাঁর লীলা ব্যক্ত করার জন্যে তিনি মৌন হয়ে রইলেন।

নৌকোটি স্বামিজীর কাছে ভিড়লো মাঝি।

ভক্তটি মহারাজার কথা স্বামিজীর কাছে বলতে যাবে এমন সময় দেখলো তিনি স্বয়ং নৌকোর ওপর উপস্থিত।

মহারাজা স্বামিজীর অলৌকিক ক্রিয়ার পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হলেন।

তাঁর হাতে একটি অমূল্য তরবারি ছিল। ওটি তিনি পেয়েছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে।

একবার একটি দুঃসাহসিক কাজে কৃতকার্য হয়েছিলেন মহারাজা। তার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি কোম্পানীর কাছ থেকে ওটি পুরস্কার হিসেবে পান।

তরবারির ওপর স্বামিজীর নজর পড়লো।

মহারাজাকে বললেন, দেখি তোমার তরবারিটি।

মহারাজা আনন্দসহকারে তরবারিটি তৈলঙ্গস্বামীর হাতে তুলে দিলেন। তিনি নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে ভাবতে লাগলেন। কারণ তৈলঙ্গস্বামীর মত একজন যোগী পুরুষ তাঁর তরবারি গ্রহণ করেছেন। কত বড় সৌভাগ্য থাকলে তবে এ কাজ সম্ভব হয়।

স্বামিজী তরবারিখানি নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন। তারপর ওটিকে জলে ফেলে দিলেন।

তাই দেখে মহারাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ভক্তটিকে বললেন, এ আবার কি রকম সাধু যিনি পরের জিনিস দেখতে নিয়ে তার গুণাগুণ না জেনে অনায়াসে তা নষ্ট করতে পারেন! ধিক্ তাঁর সাধুতা। জানিনা কোন গুণে আপনি এঁকে একজন প্রসিদ্ধ সাধু ও মহাপুরুষ বলে কিছুক্ষণ আগে প্রশংসা করলেন। ইনি একজন কপট ভণ্ড তপস্বী। যোগবলে জলে ভাসতে পাবেন বলেই কি ইনি বিখ্যাত?

ভক্তটি বড় মর্মাহত হলেন মহারাজার কথা শুনে। তখনি বললেন, আপনি ওবিষয়ে কিছু ভাববেন না। আমি এক্ষুণি আপনার তরবারি তুলে দিচ্ছি ডুবুরীকে বলেকয়ে।

ক্রমে নৌকো মণিকর্ণিকাঘাটে এসে লাগলো। স্বামিজী নৌকো থেকে নামতে গেলেন। মহারাজা নামতে দিলেন না। বাধা দিলেন। বললেন, কোথায় যাচ্ছেন আপনি? আগে আমার তরবারি তুলে দিন তাবপর যাবেন।

স্বামিজী বড় বিব্রত বোধ করলেন। তবু মুখে অফুরন্ত বিমল হাসি তাঁর সর্বশরীরে এক অপূর্ব রূপ ফুটিয়ে তুললো। তিনি হেসে বললেন, একটা তরবারির মায়া তুমি ভুলতে পারছো না মহারাজা।

স্বামিজীর ঐ কথা শোনামাত্র মহারাজা দ্বিগুণ রেগে উঠলেন। বললেন, আপনার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়। আপনি একটি দামী জিনিস জলে ফেলে দিয়ে বড় বড় কথা বলচেন আর হাসচেন। ধিক্ আপনাকে।

স্বামিজী দ্বিতীয় কথা না বলে অনাবিল হাসিতে মহারাজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মহারাজার ক্রোধের সীমা ক্রমশই বেড়ে গেল।

স্বামিজী ভাবলেন, এবার তাঁর পরীক্ষা শেষ হয়েছে। মহারাজার

হয়েছে হার। সামান্য ও তুচ্ছ বিষয়বাসনা তিনি তখনো ভুলতে পারেন নি ; পরমার্থ লাভ তো দূরের কথা।

তিনি তখনি জলের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। দু'হাতে করে দু'টি তরবারি তুললেন। ঠিক আগের মত দেখতে। সামান্য পরিবর্তনও চোখে পড়লো না।

তরবারি দুটো মহারাজার চোখের সামনে তুলে ধরে প্রশ্ন করলেন, এ দুটোর মধ্যে কোনটি তোমার ?

মহারাজা ঐ দৃশ্য দেখে অবাক হলেন। ভাবলেন, একি ব্যাপার ! দুটো তরবারি কোথা থেকে এলো ? আর কি আশ্চর্য, দুটোই এক-রকমের দেখতে। তবে কি এ লোকটা যাদু জানে ?

নিজের তরবারি চিনতে পারলেন না মহারাজা। নীরব হয়ে তাকিয়ে রইলেন স্বামিজীর মুখপানে।

স্বামিজী হেসে বললেন, এই নাও তোমার তরবারি। একটি তরবারি তুলে দিলেন মহারাজার হাতে আর একটি জলে ফেলে দিলেন।

তারপর বললেন, তোমার নিজের জিনিস যখন তুমি চিনে নিতে পারলে না, তখন তোমার জিনিস বলছো কেন ? তোমার জিনিস হলে তুমি নিশ্চয়ই চিনে নিতে পারতে। যা তোমার নিজের নয় তার জন্যে এত রাগ প্রকাশ করছো কেন ? তোমার মত অহঙ্কারী ও মূর্খ এ জগতে আর কেউ নেই।

মহারাজা বুঝতে পারলেন নিজের অজ্ঞতা। ভাবলেন, আমি না জেনে এমন মহাপুরুষকে যা তা বলেছি। দ্বিধাহীনভাবে অপমান করেছি। আমি বড় মূর্খ !

স্বামিজীর পদতলে পড়ে গিয়ে ক্ষমা চাইলেন মহারাজা।

স্বামিজী তাঁকে ক্ষমা করলেন। তারপরই গঙ্গাগর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এবার মহারাজা ঐ ভক্তটিকে গভীর আলিঙ্গন দান করে বললেন, ভাই, তুমিই যথার্থ মানুষ—তুমিই প্রকৃত ভক্ত। তুমি ধন্য। তুমি

তাঁর করুণা লাভ করেছ। আর আমরা অধম। মূর্খ। কেবল অর্থ ও মান-যশের অহঙ্কার করেছি। ক্ষুদ্রমতি আমরা।

অতঃপর তরবারিখানি হাতে নিয়ে বললেন, এই যে আমার তরবারি। এ আগে আমার কতবড় প্রিয় জিনিস ছিল। কিন্তু এখন দেখছি এর মত অর্থহীন বস্তু জগতে আর দ্বিতীয় নেই। আমার প্রকৃত আনন্দ—একান্ত অমূল্য বস্তু হচ্ছেন তিনি—ঐ স্বামিজী। আমি তাঁর দাসানুদাস।

মহারাজা করুণ স্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। মহাপুরুষের সান্নিধ্যলাভ করে অন্তরে পেলেন অতীন্দ্রিয় সুখ আর দিব্যানন্দ। নয়নদ্বয় হতে দৈবপ্রেমের পুলকাশ্রু নেমে এলো। ভাবে গদগদ চিত্ত। কিছুক্ষণ অনাবিল আনন্দস্রোতে ভাসিয়ে দিলেন নিজেকে। ভুলে গেলেন পার্থিব সুখের বিচিত্র অনুভূতি।

মহারাজার অনুচরগণ বলাবলি করলো, ইনি কি মানুষ, না দেবতা! এ সব অসম্ভব কাজ মানুষের দ্বারা কি সম্ভব?

মানসসরোবরে বহু দিন রইলেন তৈলঙ্গস্বামী। তিব্বতীয় বহু দেশ এবং বস্তু পরিদর্শন করলেন। নিত্য নব নব বস্তুর সঙ্গে পরিচয় হতে অন্তরাত্মা আনন্দ এবং জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

তারপর ওখান থেকে প্রথমে এলেন বেণুকাতীর্থে। পরে বরাহতীর্থে।

এরপর জঙ্গত্রি এবং গঙ্গত্রি হয়ে গেলেন বদরিকাশ্রমে। বদরিকাশ্রমে দু'এক দিন কাটিয়ে আবার যাত্রা করলেন অন্য দেশের উদ্দেশ্যে।

কিছুকাল যাবৎ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালেন। এমন কি একসময় তিনি সুমেরু প্রদেশে গিয়ে বহুকাল সাধনভজন করেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগী শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী। দেবভূমি হিমালয়ের স্বর্গীয় শোভার আকর্ষণ তাঁকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করলো। সেই কারণে তিনি বেশ কিছুদিন কাটালেন ওদেশে।

ওখানকার গরীব পার্বত্য জাতি এবং উপজাতিদের অনেক উপকার করলেন নিজের বিভূতির পরম প্রকাশ দেখিয়ে।

হিমালয়ের কাজ সমাপ্ত করে মহাপুরুষ এলেন বারাণসীধামে।

এখানে তাঁর অলৌকিক কর্মের বিচিত্র ধারা অনেকের মনকে আকৃষ্ট করলো। গঙ্গার তীরে বসে ধ্যানজপ করতে লাগলেন। কখন তিনি চারপাঁচ ঘণ্টা গঙ্গায় ডুবে থাকতেন। কখন উত্তপ্ত বালির ওপর শুয়ে পড়তেন। কখন প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও নিরাবরণ শরীরে সহাস্য বদনে গঙ্গাতীরে উপবেশন কবতেন।

তিনি ছিলেন পরম যোগী। যোগের বিচিত্র শক্তি প্রয়োগ করে অনেক অসাধ্য সাধন কবেছেন। বহুলোক উপকৃত হয়েছে তাঁর ঐ শক্তিপ্রভাবে। সাধারণ মানুষ যোগী নয়। তাই তারা স্বামীজীর ঐ প্রকার কার্যকলাপ সন্দর্শন করে মাঝে মাঝে বিস্মিত হতো। কাবণ বা প্রমাণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে হতো ব্যর্থকাম।

আরে দূর দূর! ওসব ভণ্ডামী আব ভাল লাগে না। ঈশ্বব এক এবং অনন্ত। তাঁর নিরাকার রূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে রয়েছে। সেই রূপকে নিয়ে মূর্তি গড়ে ছেলেখেলা করা কি উচিত! যারা ওসব করে তারা সমাজের পাপ—ধর্মের শত্রু, বললো একজন পণ্ডিত। কাশীতে এসেছে সে।

তৈলঙ্গস্বামীর কানে কথাগুলি পৌছুলো। প্রথমে তিনি মৌনী রইলেন। একটি বাক্যের অস্ফুট ধ্বনিও তাঁব শ্রীমুখ হতে নিঃসৃত হলো না।

কেবলমাত্র হাসলেন। সে হাসি অনাবিল এবং অলৌকিক। দর্শনমাত্রে আসে অন্তরেব পরিবর্তন—অব্যক্ত আলোড়ন।

কাশীধামের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ঐ পণ্ডিতের যুক্তি এবং ধর্মমত সমর্থন করলো। ছুটে গেল পণ্ডিতের কাছে আরও ধর্মব্যখ্যা শোনবার আশায়।

এমন সময় আর এক পণ্ডিত এলো যুক্তিতর্ক নিয়ে। সে বললো তোমার ব্রাহ্মধর্ম তো হিন্দুধর্মেরই একটি শাখামাত্র। হিন্দুধর্মে

সাকার নিরাকার দু'রকম উপাসনার কথা বলা আছে। তোমরা কেবল নিরাকার নিয়ে আছ। সাকারকে বিশ্বাস করো না।

এই পণ্ডিতের নাম বিশুদ্ধানন্দ। আগের জনের নাম স্বামী দয়ানন্দ।

নিরাকারবাদী দয়ানন্দ হুঙ্কার ছেড়ে বললো, বটে! এত বড় কথা। আমি ওসব মানি না। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য আর সব মিথ্যে।

বিশুদ্ধানন্দও যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝালো দয়ানন্দ স্বামীকে। বললো, অনন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ কল্পনা করা সাধারণ ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তার খণ্ডরূপ কল্পনা করে যে উপাসনা করা হয় তাকেই সাকার উপাসনা বলে। হিন্দুধর্মে এই পূজোকে বিধিগতভাবে স্বীকার করা হয়েছে। এই উপাসনা সম্পূর্ণ বৈধ।

গর্জে উঠলো দয়ানন্দ। কিছুতেই মানতে চাইলো না। বললো না। আমি তোমার একথা স্বীকার করি না।

নিরুপায় হয়ে চলে এলো বিশুদ্ধানন্দ স্বামী তৈলঙ্গর কাছে। বললো, আমি আর আমার বিচারে সমর্থ হচ্ছি না। উপরন্তু তার যুক্তিসিদ্ধান্ত বড়ই জটিল।

তৈলঙ্গস্বামী বললেন, আমার পাঠাগারে বেদান্তের বই রয়েছে। সেগুলি নিয়ে এসো। তার ঠিকমত ব্যাখ্যা করো। তারপর সে যদি ওসব মানতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে বলে দিও পবিত্র কাশীধামে তার মত মূর্খের স্থান হওয়া উচিত নয়।

স্বামিজীর কথা বিশুদ্ধানন্দ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো।

আরে আমাদের প্রভু কোথায়?

দর্শনার্থীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো শূন্য আশ্রমের দিকে। বললো, আমরা এত কষ্ট করে এতদূর এলুম। অথচ ওঁর সঙ্গে দেখা হলো না।

প্রসিদ্ধ রাজঘাটে জমায়েত হয়েছে ভক্তের দল। ভারতের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে রাজঘাট একটি সুন্দর তীর্থস্থান। অথচ স্বামিজী

রাজঘাট থেকে সোজা চলে এসেছেন কাশীধামে। তাঁর একান্ত ইচ্ছে কাশীর সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে দেখা করেন।

একবার একজন ভক্তকে বললেন বিদ্যানন্দ সরস্বতী, কাশীতে দেখার মত জিনিস একটিমাত্র আছে। তাঁর নাম তৈলঙ্গস্বামী।

এতদিন মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে বিদ্যানন্দ সরস্বতীর। একদিন সকালবেলায় তৈলঙ্গস্বামীর আশ্রমে এলেন।

কয়েকজন গৃহী ও ত্যাগী শিষ্য পরিবৃত হয়ে তৈলঙ্গস্বামী বসে ছিলেন আশ্রমের প্রাঙ্গণে।

বিদ্যানন্দকে দেখে তৈলঙ্গস্বামী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। গভীরভাবে আলিঙ্গন দিলেন। তারপর অন্য দৃশ্য ঘটলো।

ভক্তরা অবাক হলো ব্যাপারটি পরিদর্শন করে। কি হলো? স্বামিজীরা গেলেন কোথায়?

এইতো ওঁরা দু'জনে এখানে ছিলেন! এর মধ্যে গেলেন কোথায়? বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো তৈলঙ্গস্বামীর শিষ্যগণ। আধ ঘণ্টাকাল এমনিভাবে কাটলো। তারপর ওরা দেখলো স্বামিজীকে। জ্যোতির্ময় দেহধারী বিরাট মূর্তি এগিয়ে আসছেন তাদের দিকে।

ধীর পদক্ষেপে আশ্রমে প্রবেশ করলেন তৈলঙ্গস্বামী।

অথচ বিদ্যানন্দ সরস্বতী নেই।

ভক্তরা জিগ্যেস করলো, তিনি গেলেন কোথায়?

তৈলঙ্গস্বামী বললেন, তিনি গেছেন রাজঘাটে। সেখানে যে তোমাদের মত অনেক ভক্ত এসে অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্যে।

গৃহী ভক্তগণ স্বামিজীর কথা শুনে হতবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, এতো অল্প সময়ে এতদূর পথ কিভাবে অতিক্রম করা যায়?

স্বামিজী ওদের মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন, একমাত্র যোগবলে এরকম অঘটন ঘটানো সম্ভব।

বাবা! তোমার চরণে মাথা রাখি। আমায় কৃপা করো, আমার মন বড় খারাপ।

এই কথাক'টি বলতে বলতে কাতরাতে লাগলো একটি অসহায়া স্ত্রীলোক। সঙ্গে একটি শিশু। পাঁচ বছর বয়েস মাত্র। কোলে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে আছে! পুত্রের পাণ্ডুর মুখটির পানে বারংবার তাকাচ্ছে ব্যাকুল হৃদয়ে রোরুদ্যমানা অসহায়া জননী।

দয়াময় মহাপুরুষের প্রাণ গেল গলে। বিগলিত করুণা নেমে এলো তাঁর হৃদয়গিরিকন্দর হতে। ফিরে তাকালেন। দেখলেন, একটি অসহায়া নিঃসম্বলা স্ত্রীলোক পুত্রের শুষ্ক বিবর্ণ মুখপানে তাকিয়ে অজস্রধারায় ক্রন্দন করছে।

ধীরে ধীরে উঠে গেলেন স্বামিজী ব্যথিতমনা স্ত্রীলোকটির নিকটে।

কৌতুহল এবং প্রেমভরা সুললিত বাক্যে প্রশ্ন করলেন, কিরে, কি হয়েছে তোর?

বাবা, আমার এই ছেলের বড় অসুখ। কিছুতেই ভাল হচ্ছে না। করুণ সুর এবং ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো কথা ক'টি ব্যথাতুরা জননীর অন্তর মথিত করে।

আবার বললো, বাবা, অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। অনেক জায়গায় গেছি। কিছুতে ভাল হচ্ছে না। অবশেষে অগতির গতি আপনার কাছে এসেছি।

গম্ভীর অথচ স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন স্বামিজী, তা আমি কি করতে পারি?

শুনেছি, আপনার কৃপা অসীম। আপনি কৃপা করলে অসাধ্যও সাধ্য হয়। পঙ্গু লঙ্ঘন করতে পারে গিরি।

স্বামিজী শুনলেন দীর্ণহৃদয়া জননীর কাতরোক্তি। ক্ষণকাল মৌনী রইলেন। লক্ষ্য করলেন স্ত্রীলোকটির হাবভাব।

বড় দুঃখী ও মেয়েটি। ওর স্বামীর মনেও নেই শান্তি। পুত্রের কঠিন ব্যাধির দুঃসহ পরিণাম আশঙ্কা করে দু'জনেই মনে মনে নিদারুণ দুঃখজ্বালা বহন করছে। অশান্তির দাবদাহ দু'জনের মনকে ভস্মীভূত করার উপক্রম করছে।

একমাত্র পুত্র। সে পড়ে গেছে মাটিতে। পাঁজরার একটা হাড় ভেঙে গেছে। সেই থেকেই এই অসুখের উৎপত্তি।

ভেলুপুর হাসপাতালে রেখে অনেক দিন ধরে চিকিৎসা করিয়েছে। তথাপি আরোগ্যের পথে যায়নি। তারপর এসেছে কোলকাতায়। এখানেও অনেক রকম চিকিৎসা করিয়েছে। তথাপি তার ঐ অবস্থার কোনরকম পরিবর্তন দেখা গেল না।

অবশেষে অগতির গতি ভবপারের কাণ্ডারীর কাছে এসেছে। যদি তিনি শেষ রক্ষা করেন।

প্রায় একমাস ধরে দম্পতি যাতায়াত করলো স্বামিজীর আশ্রমে।

প্রতিদিন ওরা এসে ধ্যানে বসতো। স্বামীজীর মূর্তি কল্পনা করে ধ্যান করতো।

বেশ কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর ভক্তিভরে প্রণাম জানাতো স্বামিজীকে। স্বামিজী সহাস্য বদনে ইঙ্গিত করতেন, এখন যাও।

ওরা চলে আসতো।

এমনি ভাবে একটি মাস কেটে গেল। ওরা দয়াময় স্বামিজীর থেকে তখনো পর্যন্ত কোন রকম মঙ্গলজনক পরিণাম বোধ করতে পারলো না। মনের অশান্তি আগের মতই থেকে গেছে। অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না মহাপুরুষের কাছে।

অবশেষে শুভদিন এলো। দুঃখী দম্পতির ভাগ্যাকাশে প্রকাশ পেল সুখের নব অরুণোদয়।

একদিন স্বামিজী জলদগম্ভীর কণ্ঠে স্ত্রীলোকটিকে জিগ্যেস করলেন, তোমরা এখানে রোজ রোজ আসো কেন? কি খবর তোমাদের?

মেয়েটি তখন হৃদয়বিদীর্ণ ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়লো। একমাত্র পুত্র—নয়নের মণির কথা নিবেদন করলো কল্যাণকারক স্বামিজীর কাছে। বললো, বাবা, আমার স্নেহের বাছাটি বড় কঠিন অসুখে ভুগছে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। অনেক ডাক্তারকে দেখিয়েছি। এখন আপনি যদি দয়া করেন। শুনেছি, আপনি বড় দয়াবান। আপনার শক্তিও অসীম।

স্ত্রীলোকটির কথা শুনে স্বামিজী হো হো শব্দে একগাল হাসলেন। পরে নিজের হাতে একটু মাটি তুলে নিয়ে স্ত্রীলোকটির হাতে দিলেন। বললেন, এটি মিয়ে যাও। বাড়ি ফিরে ছেলেটির ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দাও।

তারপর বললেন, এখন তোমাব ছেলেকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাও। কিছুক্ষণ পরে এর খুব জ্বর আসবে। তাই দেখে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। অতি অল্পকালেব মধ্যেই ওর জ্বর ছেড়ে যাবে। তখন ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির হবে। সেই সময় তোমার ঘরে যা থাকবে তাই ওকে খেতে দেবে। এতেই তোমার ছেলে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে।

স্ত্রীলোকটি ছেলেটিকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো। স্বামীর কাছে সব ব্যাপারটি খুলে বললো।

স্বামী সবকিছু শুনে নিয়ে বললো, স্বামিজী যা করতে আদেশ দিয়েছেন তাই করো। ওঁর নির্দেশ কখনো ব্যর্থ হবে না! শুনেছি উনি নাকি সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।

এই কথা উচ্চারণ করতে করতে দু'টি গণ্ডদেশ বেয়ে প্রেমাশ্রু ঝরতে লাগলো স্নেহপ্রাণ পিতার।

করজোড়ে দেবাদিদেব ত্রিলোকনাথ শিবশম্ভু বিশ্বনাথকে উদ্দেশ্য করে বললো, ঠাকুর, এ তোমার অশেষ করুণা। এই অধমের প্রতি তোমার কৃপা হয়েছে। তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

স্বামিজীর কথামত স্ত্রীলোকটি পুত্রের সেবাশুশ্রূষায় নিজেকে সমর্পণ করলো। ধীরে ধীরে সোনার চাঁদ—নয়নের মণি—একমাত্র পুত্র সুস্থ হয়ে উঠলো।

পীঠস্থানের মাটির গুণ আছে। দেবতা যেখানে জাগ্রত সে জায়গাকে তো পীঠস্থান বলে। জাগ্রত দেবতা সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তৈলঙ্গস্বামীর আশ্রম তেমনি এক পীঠস্থান। এখানকার মৃত্তিকা অতিশয় পবিত্র। গ্রহণ করলে সব মঙ্গল হয়। ভবব্যাধি আরোগ্য লাভ করে।

একদিন ভবনীচরণ বাচস্পতি এলো তৈলঙ্গস্বামীর কাছে। কে যেন তাকে বলেছে, তুমি অমনভাবে জ্বর আর পিলেতে ভুগছো কেন? অনেক ডাক্তারবদ্যি তো করলে। এবার একবার যাও না তৈলঙ্গস্বামীর কাছে। উনি তোমার অসুখ ভাল করে দেবেন। উনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। যাকে যা বলেন তাই ঠিক হয়। যা দেন তাই সত্য ও প্রত্যক্ষ ফলদায়ী।

জ্বর, পিলে এবং যকৃতের ব্যাধিতে অনেক দিন ভুগছে ভবানী-চরণ। অনেকবার অনেক রকম চিকিৎসা করিয়েছে। কোন কিছুতে ফল পায় নি।

তাই হতাশ হয়ে এসেছে কাশীধামে সাক্ষাৎ শিব ভবকাণ্ডারী তৈলঙ্গস্বামীর কাছে। যদি তার একটু কৃপা মেলে, জীবন হয় ধন্য।

প্রতিদিন স্বামিজীর কাছে আসাযাওয়া করে ভবানীচরণ: প্রণাম জানিয়ে চলে যায়। মুখ ফুটে কিছু প্রকাশ করে না।

স্বামিজী একদিন হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছে তোমার?

ভবানীচরণ বললো, আজ্ঞে আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি। পেটে দারুণ ব্যথা। কিভাবে ভাল হবে জানি না। অনেক বার অনেক রকম চিকিৎসা করিয়েছি। কোন রকম সুফল দেখিনি। এখন আপনার কাছে এসেছি। আপনি কৃপা করুন।

তৈলঙ্গস্বামী বললেন, আমি কৃপা করার কে? তুই মার কাছে কৃপা চা। তিনি তোকে দেখবেন।

আমি মাকে জানি না। আমি জানি তোমাকে। তাই তো তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমায় কৃপা করো। ওগো করুণাময়, তুমি আমার পাপতাপ নাশ করে দুরূহ যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে ভগবান তাকে আশীর্বাদ করেন। গুরু তো ভগবানের প্রতিনিধি।

গুরু তৈলঙ্গস্বামী ভবানীচরণকে কৃপা করলেন। সে কৃপা অন্য রকম।

একদিন তিনি ভবানীচরণকে গুটিকয়েক সিদ্ধির পাতা দিয়ে বললেন, এগুলি বাট দেখিনি।

ভবানীচরণ বেটে দিলো। মণ্ড মতন করলো।

তৈলঙ্গস্বামী তাই থেকে মটরসমান গোল্লা তৈরী করে ভবানীকে দিলেন। বললেন, এটি খেয়ে নে।

এমনিভাবে প্রতিদিন একটি করে সিদ্ধির গুলি খেয়ে নিতো ভবানীচরণ। প্রায় একমাস কাটলো এইভাবে।

একদিন ভবানীচরণ এসে দেখলো, ঘরের মধ্যে গুরুদেব বমি করে রেখেছেন।

ভবানীচরণ সেই বমি পরিস্কার করলো। তারপর গঙ্গাস্নান করে এলো।

আর একদিন তৈলঙ্গস্বামী ঘরের এককোণে বাহ্যে করলেন।

ভবানীচরণ এসে পরিস্কার করলো। কোনরকম মনোবিকার দেখা গেল না তার অন্তরে।

এদিনও তৈলঙ্গস্বামী ভবানীচরণকে যথারীতি সিদ্ধি বাটতে বললেন।

ভবানীচরণ বাটতে লাগলো সিদ্ধির পাতা। স্বামিজী তার থেকে কিছু অংশ নিয়ে খেয়ে বললেন, আ! বেশ সুন্দর হয়েছে তো।

তারপর ভবানীচরণকে খেতে দিলেন।

ভবানীচরণ গ্রহণ করলো।

অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো ভবানীচরণ।

তারপর স্বামিজী ভবানীচরণকে কাছে ডেকে বললেন, তোকে আর এখানে আসতে হবে না। যা—এখন তোর ছুটি।

ভবানীচরণ আরও অবাক হলো। ভাবলো, একি কথা বলছেন স্বামিজী! আমার অসুখ যে এখনো ভাল হলো না। উনি এখনি যেতে বললেন কেন?

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ভবানীচরণ।

তৈলঙ্গস্বামী বুঝতে পারলেন তার মনোভাব। অমনি বললেন, কি রে? কি ভাবছিস অমন করে?

ভবানীচরণ বললো, কৈ, আমার অসুখ তো সারলো না?

তৈলঙ্গস্বামী হেসে বললেন, বাড়ী যা। দেখবি আস্তে আস্তে তোর এ অসুখ সেরে গেছে। কোন ভাবনা নেই। আমি বলছি, তুই অচিরে নিরাময় হবি।

ভবানীচরণ গুরুদেবের কাছ থেকে চরম আশ্বাস পেল। আনন্দে নাচতে নাচতে চলে এলো নিজের বাড়ীতে।

কিছুদিন পরে গুরুদেবের কথামত সে আরোগ্যলাভ করলো। দেখলো, তার আর কোন অসুখ নেই।

ধন্য তৈলঙ্গস্বামী। তোমার অশেষ কৃপা। মানবদেহে তুমি অতিমানব—দেবতা। তোমায় কোটি প্রণাম।

গীতায় বলেছে, 'প্রণিপাতেন—পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।' এই গুণে গুণী হয়েছে ভবানীচবণ। তাই তো পেয়েছে মহাপুরুষের অকৃপণ কৃপা। অযাচিত আশীর্বাদ। মহাপুরুষের কৃপাই জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় বস্তু। তাকে লাভ করলে ভবসংসার সুখের হয়। জীবের সমস্ত রকম ভয়, বাধা, বিঘ্নের হয় বিনাশ।

আরে দূর—ওখানে যাচ্ছি নিছক বিদেশ ভ্রমণে। পুণ্য অর্জনের জন্যে নয়। কাশীতে যাবো, মন্দির দেখতে নয়, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে, বললো কোলকাতা হাইকোর্টের জনৈক আইন-ব্যবসায়ী তার সুহৃদকে।

বন্ধুটি বললো, বারে, এ আবার কেমন কথা! লোকে কাশীতে যায় পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যে। আর এ দেখছি সেখানে গিয়ে স্ফুর্তি করবে।

আইন-ব্যবসায়ী কাশীতে এসেছে। নানা দেবদেবীর মন্দিরে গেল। বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা আর মণিকর্ণিকার ঘাট দর্শন করলো। কিন্তু কোথাও প্রণাম করলো না বা পূজো দিলো না।

কাশীতে আপন মনে বেরিয়ে বেড়ালো আইনজীবি। এমন সময় তার কানে এলো তৈলঙ্গস্বামীর কথা। শুনলো, তাঁর নাকি অলৌকিক শক্তি। অনেক রুগ্ন লোকের অসুখ ভাল করেছেন তিনি। অনেকে অনেক রকম ভাবে উপকার পেয়েছে।

আইনজীবির মনে কেমন কৌতুহল হলো এ হেন সাধুর দর্শনের জন্যে। সে এলো তৈলঙ্গস্বামীর আশ্রমে।

দেখলো, বহু লোক আসছে যাচ্ছে। কেউ তাঁকে প্রণাম করছে, কেউ এসে তাঁর কাছে করজোড়ে বসে শাস্ত্রকথা এবং তত্ত্ব উপদেশ শুনছে। কেউ বা তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকারভাবে —নিশ্চল হয়ে। যেন কাষ্ঠপুত্তলিকা।

আইনজীবি ঐসব দৃশ্য দেখলো। মনে মনে এক বিশেষ কৌতূকানুভূতি বোধ করলো। ভাবলো, বারে, এ সাধুটিকে তো বেড়ে দেখতে! এমন সোনার মত রং—গোলগাল নধর চেহারা! তার ওপর সুন্দর সুন্দর কথা! বা! সুন্দর লাগছে তো!

এইরকম ভাব জাগলো আইন-ব্যবসায়ীর মনে। এমন সময় সে বোধ করলো যেন তার গলায় কে এসে ধাক্কা মারছে। বলছে, ওরে নরাধম! ওরে পাপিষ্ঠ—দুরাচার! তুই দু'পাতা ইংরেজী পড়ে নিজের ধর্ম একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েছিস, এঁকে প্রণাম কর।

এরপর থেকে আইন-ব্যবসায়ীর মনে এলো পরিবর্তন। তৈলঙ্গস্বামীর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লো। বললো, বাবা, না জেনে তোমায় অবজ্ঞা করেছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করো।

তৈলঙ্গস্বামী বললেন, আমি আর কি করবো। সবই মা জানেন। তিনিই তোকে ক্ষমা করবেন।

আইনজীবি স্বামিজীর আশীর্বাদ লাভ করলো। বাড়ী ফিরে এলো। নিজের মধ্যে নানা রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করলো। অন্তরে ধীরে ধীরে ভক্তিভাব জাগলো। দেবতার প্রতি এলো বিশ্বাস। তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য স্বীকার করলো।

পরে স্বামিজীর জনৈক ভক্ত মঙ্গলদাসকে জানালো, আমি স্বামিজীর জন্যে মাসে মাসে কিছু সাহায্য পাঠাবো। এতে উনি রাজি আছেন কি ?

মঙ্গলদাস এসে তৈলঙ্গস্বামীকে বললো, উকিলবাবু আপনাকে মাসিক কিছু টাকা সাহায্য দিতে চান। আপনি তা গ্রহণ করবেন কি ?

অচল-অটল গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত গর্জে উঠলেন স্বামিজী, না। তাকে বারণ করে দিও ওসব যেন সে না দেয়।

তখনকার মত কিছু দিল না আইন-ব্যবসায়ী। পরে স্বামিজী নশ্বর দেহ রাখলেন। তাঁর অবর্তমানে আশ্রমের খরচ চালাবার জন্যে আইন-ব্যবসায়ী ভক্ত মঙ্গলদাসের হাতে মাসে মাসে কিছু অর্থ পাঠাতো।

বাংলার স্বনামধন্য পুরুষ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন বারাণসী-ধামে। সঙ্গে ছিল ভাগ্নে হৃদয়। ঠাকুর তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে দেখা করলেন। সেই সময় তিনি মৌনী ছিলেন। ইসারায় উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হলো। কিছুক্ষণ ওভাবে চললো। হৃদয় তার কিছু বুঝতে পারলো না। ভাবজগতের মানুষ তাঁরা। ভাবময় মন-প্রাণ নিয়ে দু'জনে কত কথা বললেন। হৃদয় সাধারণ মানুষ। সে তাঁদের ঐ মৌনী কথোপকথনের বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারলো না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদায় নিলেন মহাপুরুষের কাছ থেকে। আসার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি নস্যির ডিবে উপহার দিলেন তৈলঙ্গস্বামী। ঠাকুর সেটি হাসতে হাসতে গ্রহণ করলেন। তাও নিজের জন্যে নয়। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর সিঁদুর রাখবার জন্যে ওটি নিয়ে এলেন।

বারাণসী ধাম থেকে ফিরে এলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। কোলকাতায় এসে মন্তব্য করলেন, ওখানে সাক্ষাৎ শিবকে দেখে এলুম। স্বয়ং বিশ্বনাথ তৈলঙ্গস্বামীরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে এমন মন্তব্য শুনে দলে দলে

ভক্তপ্রাণ নরনারী ছুটলো বারণসীধামের দিকে। সার্থক করলো তাদের জীবন সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করে এবং তাঁর মৌন আশীর্বাদ লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকের ব্রত গ্রহণ করে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেন তখন একসময় তিনি কাশীতে আসেন এবং এই মহাপুরুষকে দর্শন করেন। সেই সময় ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে নির্বাক কথোপকথন চলে এই দুই যুগমানবের মধ্যে।

মহামানব তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে একাধিকবার দেখা করেন পরম বৈষ্ণব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের যে কথোপকথন হয় তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি,—

'প্রশ্ন। তৈলঙ্গস্বামীও নাকি আপনাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন?

'ঠাকুর। তৈলঙ্গস্বামীও আমাকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। সে, বহুকাল পূর্বে। একবার কাশীতে গিয়ে একমাস ছিলাম। কেদার ঘাটের নিকটে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার লোকনাথ বাবুর বাসায় উঠেছিলাম। তিনি খুব আগ্রহ ক'রে আমাকে তাঁর বাসায় থাকতে বললেন। আমি বললাম, 'আপনাদের খুব অসুবিধা হবে। আমি সারা দিন রাত ঘুবে ঘুরে বেড়াব; প্রয়োজনমত বাসায় আসব। দিনে রাত্রে কখন একটা নির্দিষ্ট সময়ে আহার করতে পারব না। আর ঘরও আমার একখানা প্রয়োজন হবে; তাতে অন্য লোক থাকলে চলবে না।'

'লোকনাথ বাবু আমার সমস্ত কথায় রাজি হয়ে, তাঁর বাসায় থাকতে জেদ করতে লাগলেন। আমাকে একখানা নির্জন ঘর দিলেন। আমি দিনে রাত্রে ইচ্ছামত ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম; প্রয়োজনমত বাসায় আসতাম। অধিকাংশ সময়ই তৈলঙ্গস্বামীর নিকটে থাকতাম। প্রথম প্রথম কয়দিন তিনি আমাকে অনেক পরীক্ষা করেছিলেন। গায়ে কুকুরের বিষ্ঠা, ময়লা, কাদা মেখে থাকতেন, নিকটে গেলে উহা ছড়াতেন। পরে নাছোড়বান্দা দেখে খুব আদর করতেন, যাওয়া মাত্রই কাছে বসতে বলতেন। বেলা অধিক হ'লে, ক্ষুধা পেয়েছে কি না

ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করতেন ; নিকটে যাঁরা থাকতেন তাঁদের কিছু খাবার আনতে বলতেন। একজনকে খাবার আনতে একটু ইঙ্গিত করামাত্র পাঁচ ছয় জন দৌড়াইতেন। প্রচুর পরিমাণে খাবার আসতো। আমার মত খাবার রেখে অবশিষ্ট স্বামিজীকে খেতে বলতাম। তিনিও আমাকে উহা মুখে দিতে ইঙ্গিত করতেন! আমি মুখে তুলে দিতাম। তিনি বেশ খেতে পারতেন। শরীর খুব সরল ও সুস্থ, ডানপিটের মত ছিল। কখন কখন তিনি কেদার ঘাটে গঙ্গায় প'ড়ে ডুব দিতেন, একেবারে মণিকর্ণিকায় গিয়ে ভুস ক'রে ভেসে উঠতেন। আমি তখন গঙ্গার পাড়ে পাড়ে দৌড়াতাম।

'একদিন দেখি, তিনি একটি কালীমন্দিরে গিয়ে কালীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছেন, আর গণ্ডুষে গণ্ডুষে ঐ প্রস্রাব নিয়ে 'গঙ্গোদকং, গঙ্গোদকং' ব'লে কালীর গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কি করছেন?' বললেন, 'পূজা'। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এই পূজার দক্ষিণা কি?' উত্তর দিলেন, 'যমালয়'। রাত্রিতে অনেক সময়েই তৈলঙ্গস্বামীর নিকটে থাকতাম। তিনি আমাকে নানাপ্রকার অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য দেখাতেন। একদিন বললাম, 'আপনি আমাকে এত দেখাচ্ছেন, কিন্তু আমার কিছুই বিশ্বাস হয় না। দয়া ক'রে আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন বিশ্বাস হয়। তিনি আমাকে স্নান ক'রে আসতে বললেন। রাত্রি প্রায় একটা, ভয়ানক শীত, আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। অমনি তিনি আমার ঘাড়টি ধ'রে আলগা করে তুলে নিয়ে ঝুপ করে গঙ্গায় চুবায়ে নিলেন। পরে আমার মাথায় হাতখানা রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'বিশ্বাস বন যায়।' সেইদিন থেকে সত্য বিষয়ে আর আমার সংশয় হয় নাই। আশ্চর্য! আমাকে তিনি মন্ত্র দিতে চাইলেন। আমি বললাম 'আনি আপনার নিকট মন্ত্র নিব কিরূপে? আপনি সাকার উপাসক, দেখছি আপনি ১০০টি বেল পাতা ও গঙ্গাজল শিবের মাথায় চড়ান, শিবপূজা করেন, আর আমি নিরাকার ব্রহ্মোপাসক। আমি আপনাকে গুরু করব না।' তিনি সাবলম্ব ও নিরবলম্ব উপাসনা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। পরে

বললেন, 'নল রাজাকে যেমন সর্পে দংশন করেছিল, আমিও সেই প্রকার তোমাকে একটু স্পর্শ করে রাখছি। ইহার গূঢ় তাৎপর্য আছে। আমি তোমার গুরু নই ; তোমার গুরু নির্দিষ্ট আছেন তিনিই তোমাকে যথাসময়ে দীক্ষা দিবেন। এই ব'লে তিনি আমার কানে তিনটি মন্ত্র দিলেন। একটি রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনার মন্ত্র। এই মন্ত্র পূর্বে মাঠাকুরুণও আমাকে দিয়েছিলেন। অপরটি সর্বদা জপ করতে, ভগবানের নাম। আর একটি আপৎ-বিপদে পড়লে জপ করতে বললেন। পরমহংসজীর নিকটে দীক্ষালাভের পর যখন তৈলঙ্গস্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হ'লো, প্রায় বিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা সম্বন্ধে হাতের তেলোতে লিখে, জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়াদ হ্যায় ?'

'জিজ্ঞাসা করিলাম—'তৈলঙ্গস্বামী না মৌনী ছিলেন ?'

'ঠাকুর। হাঁ, কথা বলতেন না, ইঙ্গিতে সব জানাতেন, কখন কখন লিখেও দিতেন। রাত্রে অনেক সময়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন। তখন তিনি অজগর ব্রত নেন নাই। শেষকালে অজগর ব্রত নিয়ে সমস্ত ছেড়েছিলেন। কোন প্রকার ইঙ্গিতও করতেন না। এক স্থানেই ব'সে থাকতেন। শরীর স্থূল হয়ে পড়ল ; বাত হ'লো। তার উপরে তাঁকে জীবন্ত শিব মনে ক'রে সকলে তাঁর মাথায় দুধ-গঙ্গাজল ঢালতে লাগলেন। রাত চারটা হ'তে বেলা বারটা পর্যন্ত পৌষমাঘের শীতেও এই জলঢালার বিরাম ছিল না। দেহের ধর্ম—শেষকালে ঘা হ'য়ে দেহটি পচে পচে গেল। একভাবে নির্বিকার অবস্থায় থেকে, দেহটি ছেড়ে দিলেন। গঙ্গায় তাঁকে জল-সমাধি দেওয়া হয়।

(শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ—দ্বিতীয় খণ্ড—ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ—পৃঃ ১০৯-১১১)

কুলদানন্দজীর এই মন্তব্য খণ্ডন করেছেন স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী। তাঁর মতে তৈলঙ্গস্বামী নির্দ্ধারিত দিনে নিজের জন্মতিথিতে নিরোগ শরীরে ও নিটোল স্বাস্থ্যে অলৌকিক যোগাবলম্বনে দেহ রক্ষা করেন।

কাশীর পঞ্চগঙ্গার ঘাটের ওপর বিন্দুমাধবের মন্দির। তার পাশেই যুগপুরুষ তৈলঙ্গস্বামীর আশ্রম। এই আশ্রমে থাকতেন তৈলঙ্গস্বামী।

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এক ভক্ত এলেন স্বামিজীকে দেখতে।

উমাচরণের কর্মস্থল মুঙ্গেরে। একটি ডাক্তারখানার কর্মচারী তিনি। তাঁর মনের একান্ত ইচ্ছে কিভাবে মানুষ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ও তার কারণ কি এই তত্ত্ব জানবেন।

এযাবৎ অনেক রকম শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। একাধিক পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছেন। অথচ এই ব্যাপারে সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য তত্ত্ব জানতে অক্ষম হয়েছেন। মনের মধ্যে দোলা দিয়েছে সন্দেহ। কখন পুনর্জন্মবাদকে মেনে নিয়েছেন কখন বা মানতে রাজী হন নি। মনে করতেন ওসব মিথ্যে। স্রেফ কল্পনাজাল মাত্র।

একদিন তাঁকে কে একজন বললো, তুমি যদি জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করতে চাও তাহলে যাও কাশীধামে। সেখানে একজন ত্রিকালজ্ঞ সাধু আছেন। তাঁর নাম তৈলঙ্গস্বামী। তাঁর কাছে গেলে তোমার মনের বাসনা মিটবে। সবকিছু জানতে পারবে।

উমাচরণ তখন ভাবলেন, হরিদ্বারের পথে রওনা হবেন। মাঝপথে কাশীধামে নেমে ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের কাছে নিজের মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবেন। তাঁর কাছে জানবেন, মানুষ পুনর্জন্ম লাভ করে কিনা বা কর্মফল অনুসারে বিভিন্ন যোনিপথ ভ্রমণ করে কিনা।

কিছুদিনের ছুটি নিয়ে উমাচরণ বেরিয়ে পড়লেন তীর্থযাত্রায়। শিক্ষক সুরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী মুঙ্গেরে। ঐ বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলেন উমাচরণ। তাঁর সাহায্যে কাশীধামের পবিত্র তীর্থস্থানগুলি দেখে এলেন। রামচন্দ্র তাঁকে বিভিন্ন তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করলেন।

শেষকালে এলেন তৈলঙ্গস্বামীর আশ্রমে। স্বামিজীর অপরূপ দিব্য মূর্তি দেখে উমাচরণ আহ্লাদিত হলেন। তাঁর মনেপ্রাণে জেগে উঠলো অসাধারণ ভাব। অদ্ভুত ও অনাস্বাদিত এক অলৌকিক অনুভূতির সন্ধান পেলেন। মনে জাগলো অপরূপ বিস্ময়। মহা-ভাবের বিজলী স্পর্শ। মনের সে গোপন কথা বা হৃদয়ের সে সুন্দর ও অনির্বচনীয় অনুভূতি প্রকাশ করলেন না রামচন্দ্রের কাছে।

কেবলমাত্র তাঁকে প্রশ্ন কবলেন, আপনি ওঁব মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে কিছু বলতে পারেন কি?

রামচন্দ্র সাধারণ মানুষেব বুদ্ধি নিয়ে বললেন, ওর কথা কেন জিগ্যেস করছো। ওর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। একটা পাগল ছাড়া আর কিছু নয়। ওর জাতিবিচার নেই। যা পায় তাই খায়। উলঙ্গ থাকে। গরমকালে রোদে তপ্ত বালির ওপর শুয়ে থাকে। শীতকালে ভয়ানক শীতে বসে থাকে জলে। কখনো কখনো দু'তিন ঘণ্টা জলে ডুবে থাকে। আবার কখনো কখনো জলে ভাসতে থাকে। সকলে ওকে বলে কুম্ভক যোগী। ওর বয়েস অনেক। অনেক দিন ধরে ও ঐভাবেই আছে।

সেদিন উমাচরণ নীরবে বাসায় ফিরে এলেন। পরদিন সকালে মণিকর্ণিকার পবিত্র ঘাটে প্রাতঃস্নান করে এলেন তৈলঙ্গস্বামীর আশ্রমে। মনে বড় আশা, তাঁর প্রতি মহাপুরুষের কৃপা হবে কবে?

ধীরে ধীরে এসে স্বামিজীর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিপ্রণাম নিবেদন করলেন ভক্ত উমাচবণ।

স্বামিজী কিছু বললেন না। একবার ফিরেও তাকালেন না উমাচরণের দিকে।

প্রণাম করা হয়ে গেলে একটি থামের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বামিজীর অপরূপ অলৌকিক মূর্তি দেখতে লাগলেন। মনে মনে ভাবলেন, স্বামিজীকে পুনর্জন্ম তত্ত্বের কথা জিগ্যেস করে নিজের মনের সংশয় দূর করবেন।

এদিকে তাঁব কাছে এসে ওকথা জিগ্যেস করবেন সে সাহস

হলো না। ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। মনে ভয়, এতবড় একজন জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে যদি কোন রকম বেফাঁস কথা বলে ফেলেন। তাহলে উনি কি ভাববেন? যদি পুনর্জন্ম সত্যি হয় তাহলে উনি কি ভাববেন? তিনি তা বিশ্বাস করেন না জানতে পারলে তাঁর ওপর হয়ত বিরূপ ভাব পোষণ করবেন। এভাবে তাঁর করুণা হতে বঞ্চিত হবেন।

এই সব সাতপাঁচ ভাবতে লাগলেন উমাচরণ। এমন সময় তৈলঙ্গস্বামী ইসারা করে উমাচরণকে বললেন, তুমি এখান থেকে চলে যাও।

তিনি মৌনী থাকতেন। কথা বলতেন না। কিন্তু ইসারায় সবাইকে সবকিছু জানিয়ে দিতেন।

উমাচরণের একটি পাও নড়লো না। বিস্ময়ের রাশি মুখের মধ্যে নিয়ে তাকিয়ে রইলেন তৈলঙ্গস্বামীর দিকে।

কিন্তু স্বামিজীর মন তাতে টললো না। নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। একবার যা বলে দিয়েছেন সেইটিই সত্যি। তার একচুল নড়চড় হবার উপায় নেই।

ভক্ত মঙ্গলদাস স্বামিজীর মনোভাব বুঝতে পারলো। উমাচরণকে বললো, আপনি এখন বাড়ী যান। পরে আসবেন।

উমাচরণ নিরুপায় হয়ে ফিরে এলেন আশ্রম থেকে। মনের আশা মনের মধ্যেই গুমরে উঠলো। শতদল নিয়ে বিকশিত হতে পারলো না পরম আশ্বাসের শান্তসুন্দর বাতাসে।

কিন্তু তবু ভেঙে পড়লেন না উমাচরণ। দুঃখিত হলেন মনে মনে।

ঐদিন বিকেল বেলায় আবার এলেন উমাচরণ তৈলঙ্গস্বামীর আশ্রমে। আগের মত ঐরকম প্রশ্ন রয়েছে অন্তরে। পুনর্জন্মবাদ কি সত্যি? মানুষ মরলে কি আবার জন্মায়?

ধীরে ধীরে স্বামিজীর কাছে এসে প্রণাম জানালেন উমাচরণ। তারপর থামের কাছে এসে বসলেন।

অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলেন। ভাবলেন, কখন স্বামিজী তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন? পূরণ করবেন তাঁর আশা তাঁর প্রশ্নগুলির উত্তরদানে।

একমনে বসে বসে ভাবতে লাগলেন উমাচরণ। মাঝে মাঝে আশা-আনন্দের বিজলীদ্যুতি নিরাশার ঘোর অন্ধকারের বুক চিরে চমকে ওঠে। মন-প্রাণ নেচে ওঠে ক্ষণিক আনন্দের স্ফূর্তিতে। ভাবেন এবার বুঝি মহাপুরুষের মুখপদ্ম হতে উৎসারিত হবে প্রেমের শীতল বন্যা—প্রাণ-শান্তকরা প্রলেব, সুমধুব ধারা।

কিন্তু সফল হলো না মনোষ্কামনা উমাচরণেব। এবারও স্বামিজী ইঙ্গিতে চলে যেতে বললেন।

উমাচবণ চলে এলেন।

পথে একবার বেজে উঠলো তাঁর ভগ্ন মনোবীণায় করুণ বিলাপ। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে বাড়ী ফিরে এলেন। আশাভঙ্গ মনের কোণে জ্বালিয়ে রাখলেন নব আশার ক্ষীণদ্যুতি।

পরদিন সকালে উমাচরণ পুনরায় এলেন আশ্রমে। আজ তাঁর মনে দৃঢ়সঙ্কল্প দানা বেঁধে উঠেছে। স্থির করলেন, যেমন কবে হোক আজ স্বামিজীর কাছ থেকে শুনবেন তাঁর প্রশ্নের জবাব। নীরবে বসে বইলেন আশ্রমের এক কোণে। যেন অতল জলধি। নিস্তরঙ্গ জলভরা বিরাট হৃদয় তার। বাইরে কোন উচ্ছ্বাস নেই কিন্তু অন্তরে রয়েছে প্রবল আন্দোলন—বেগবতী ধারা।

ঐদিন তিনি কিছুতেই আশ্রম ত্যাগ করতে চাইলেন না।

স্বামিজীর আদেশমত মঙ্গলদাস এলো তাঁর সামনে। সরোষে বললো, স্বামিজী বললেন, আপনি এখান থেকে চলে যান।

উমাচরণ নির্বিকার ভাব নিয়ে অপলক দৃষ্টি দিয়ে তাকালেন একবার মঙ্গলদাসের দিকে। আর কিছু বললেন না। তাঁর ঐ দৃষ্টির মধ্যে জমে উঠেছে একরাশ প্রশ্ন। মঙ্গলদাস সে খবর রাখে না।

তবে সে মনে মনে উপলব্ধি করলো, উমাচরণ যেন কি বলতে

চান। কি যেন প্রশ্ন রয়েছে তাঁর অন্তরের নিবিড় গহন কন্দরে।

তাই আর কিছু না বলে ধীর পদক্ষেপে চলে এলো মঙ্গলদাস স্বামিজীর কাছে। তাঁব কাছে নিবেদন করলো, প্রভু, উনি আমার কথা শুনছেন না। আশ্রম থেকে চলে যেতে চান না।

মঙ্গলদাসের কথা শুনে স্বামিজীর বদন আরক্ত হয়ে উঠলো। তিনি তখন তাঁর গোসেবককে ডাকলেন।

গোসেবক যথাসময়ে হাজির হলো।

স্বামিজী তাকে আদেশ দিলেন। দক্ষিণ হস্তের তর্জনী উত্তোলন করে উমাচরণকে দেখিয়ে দিয়ে সরোষে বললেন গোসেবককে, একে বের করে দাও।

সহজে নড়তে চাইলেন না উমাচরণ। আশ্রমের স্থির স্তম্ভের মত তিনিও অচল অটল। একচুলও সরলেন না ওখান থেকে।

অবশেষে গোসেবক বলপূর্বক উমাচরণকে বের করে দিলো আশ্রম থেকে।

মুখের কথা নষ্ট হলে শেষে অবলম্বন থাকে বলপ্রয়োগ। গোসেবক অবশেষে তাই দেখালো।

তার কাছ থেকে নির্দয় ব্যবহার পেয়ে ক্ষুন্ন মনে এবং রোরুদ্যমান হৃদয় নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন উমাচরণ। কিন্তু মনে জেগে রইলো দুর্জয় সঙ্কল্প—মহাকৃপা লাভ করার জন্যে দুস্তর আশা—অসম্ভব কল্পনা।

ঐদিন বিকেলে পুনরায় এলেন উমাচরণ। মনে আশা, এবার প্রভু তাড়িয়ে দিলেও কোন ক্ষতি নেই। তাঁর তিরস্কার হবে আমার জীবনে পরম পুরস্কার। শ্রেয়কে লাভ করার প্রকৃষ্ট উপায়।

এবারও ঐ একই ঘটনা ঘটলো।

গোসেবক স্বামিজীর নির্দেশমত তাড়িয়ে দিলো উমাচরণকে। উমাচরণ ব্যথিত হৃদয়ে ফিরে এলেন নিজের বাসায়।

আসার সময় পথে ভাবতে লাগলেন, কি করলে স্বামিজীর ঐ দু'জন অনুচরকে বশ করা যায়। তার ফলে নিজের অভিলাষ হবে

সাফল্যমণ্ডিত। লাভ করবেন শ্রেয়কে পরম গুরুর কৃপালাভ করে।

অমনি মাথায় বুদ্ধি এলো। ভাবলেন, টাকার দ্বারা অনেক অসাধ্য সাধ্য হয়। টাকা থাকলে অনেক দুষ্ট লোকের মন জয় করা যায়।

এবার ঐ দু'জনকে কিছু কিছু টাকা দিয়ে বশ করার মতলব আঁটলেন।

তিন দিন কেটে গেল।

তিন দিনের দিন সকালে যথারীতি শয্যা ত্যাগ করলেন উমাচরণ। মণিকর্ণিকাঘাটে পবিত্র জাহ্নবীসলিলে অবগাহন করে দেহ-মন করলেন পবিত্র। আশ্রমে আসার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করলেন এভাবে।

স্নানের পর অনেকক্ষণ ধরে পবিত্র গঙ্গাতটে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে করুণ প্রার্থনা জানালেন। বললেন, জগৎপতি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি যেন সেই মহাপুরুষের কৃপালাভ করতে সক্ষম হই।

অবশেষে আশ্রমে এলেন উমাচরণ।

তৈলঙ্গস্বামীকে ভক্তিপ্রণাম জানিয়ে ভক্ত মঙ্গলদাসের কাছে এসে বসলেন।

পরে মঙ্গলদাসকে চার টাকা আর গোসেবককে দু'টাকা দিয়ে বললেন, তোমরা আর আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিও না।

প্রথমে ওরা দু'জন উমাচরণের কথা রাখবার জন্যে মনস্থির করলো। কিন্তু পরে মঙ্গলদাস বললো, বাবা অনুমতি না দিলে এখানে থাকা বড় শক্ত, আমরা কি করবো? বাবার আদেশ পালন করতেই হবে।

গোসেবক বললো, আমি আর সামনে হাজির থাকতে পারবো না।

উমাচরণ ওদের আর কিছু না বলে স্বামিজীর কাছে এলেন। তবু মনে সঙ্কোচসূঁচ বিদ্ধ করতে লাগলো। তার ভীষণ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠলো সর্বাঙ্গ।

স্বামিজীর সঙ্গে কথা বলবেন এমন সময় কোলকাতা থেকে দু'জন লোক এলো স্বামিজীকে দেখতে।

স্বামিজী তাদের চলে যেতে বললেন।

তাদের মধ্যে একজন বড় একরোখা।

সে গেল না। বললো, আমি এখন কোন মতে যাবো না। সাধুদর্শন করতে এসেছি। আমি এখানে থাকতে আসি নি। কিছুক্ষণ পরে চলে যাবো। এর জন্যে এত রাগ কেন?

ঐ কথা শোনামাত্র স্বামিজী পূর্বাপেক্ষা অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন।

মঙ্গলদাসকে আদেশ দিলেন, গোসেবককে দিয়ে একে শিগ্‌গীর বের করে দাও।

গোসেবক বাবুটির গায়ে হাত দিয়ে বললো, শিগ্‌গীর বাইরে যাও। বাবাকে দেখেছ। আর এখানে বৃথা ভীড় করার দরকার নেই।

বাবুটি তাকে ধাক্কা দিয়ে বললো, তুমি বাইরে যাও। আমি এখন কোনমতে যাবো না।

উভয়ের মধ্যে বচসা চললো। বেশ খানিকক্ষণ কাটলো ঐভাবে।

স্বামিজী সব শুনলেন। মঙ্গলদাসকে সঙ্কেতে একটি লেখা দেখিয়ে দিলেন।

দেওয়ালের গায়ে দেবনাগরী হরফে একটি লেখা ছিল।

মঙ্গলদাস সেইটি লিখে নিলো। পরে পাঠ করে শোনালো স্বামিজীকে।

স্বামিজী ইসারা করলেন মঙ্গলদাসকে লক্ষ্য করে, তুমি ওকথা বাবুটিকে পড়ে শোনাও।

মঙ্গলদাস তাই করলো। পড়তে লাগলো, তোমার আঠারো টাকা দামের জুতো জোড়াটি বাইরে খুলে রেখে আমাকে দেখতে এয়েছ। যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যায় তাহলে খালি পায়ে বাসায় যেতে মহা কষ্ট হবে আর নতুন জুতো জোড়াটিও যাবে। তাই ভাবছো। এতএব তুমি আমাকে দেখছো কি তোমার সেই বহুমূল্যের জুতো দেখছো? কি ভাবছো সত্যি করে বলো। তোমার এই বৃথা দুর্ভাবনার দরকার

নেই। তোমার জুতো নিয়ে শিগ্‌গীর চলে যাও। কেউ চুরি করে নি।

স্বামিজীর ঐ কাণ্ড দেখে উপস্থিত ভক্তরা বিস্মিত হলো। ভাবলো, স্বামিজী সত্যিকার অন্তর্যামী পুরুষ। তাঁর শক্তি অনন্ত।

উমাচরণ প্রশ্ন করলেন লোকটিকে, মশাই, সত্যি সত্যিই কি আপনি জুতোর কথা ভাবছিলেন?

লোকটি বললো, হ্যাঁ মশাই, যথার্থই আমার জুতোর ভাবনা হচ্ছিল।

অবাক হলেন উমাচরণ।

এরপর থেকে তৈলঙ্গস্বামীর ওপর থেকে বিদ্বেষভাব চলে গেল। আর বাবুরাও স্বামিজীর নির্দ্দেশমত ওখান থেকে সরে পড়লো। আর থাকতে সাহস করলো না।

এর কিছুক্ষণ পরে তৈলঙ্গস্বামী উমাচরণকে বললেন, চলে যাও।

মুখে বললেন না। ইসারায় জানিয়ে দিলেন।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওখান থেকে সরে পড়লেন উমাচরণ। তথাপি মনের আশা ত্যাগ করলেন না।

ঐদিন বিকেলে আবার এলেন আশ্রমে। তখনো ঐ একই অবস্থা।

তেরো দিনের দিন সকালে পুনরায় এলেন উমাচরণ স্বামিজীর আশ্রমে। এবার নীরবে বসা নয়, অঝোরে অশ্রুবিসর্জন। নয়নে ধারা বইতে লাগলো।

স্বামিজী ইসারা করলেন, তুমি অমন করে কেঁদো না। চুপ করে বোসো।

উমাচরণ শান্ত হলেন। নীরবে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। কিন্তু স্থির হয়ে কি বসতে পারেন! হৃদয়ের উৎকণ্ঠা তাঁকে অস্থির করে তুললো। অন্তরে উঠলো প্রবল ভাবের তুফান। ভাবাবেগে লুটিয়ে পড়লেন স্বামিজীর পদপ্রান্তে। পরিতাপে প্রাণ পুড়ে যেতে লাগলো। বললেন, দয়াময় কৃপা করুন। আর ধৈর্য ধরতে পারি না।

উমাচরণের ঐ অবস্থা দেখে তৈলঙ্গস্বামী মঙ্গলদাসকে বললেন. আজ একে যেতে বলো। কাল সকালে আসতে বলে দাও।

মঙ্গলদাস এসে উমাচরণকে বললো স্বামিজীর কথা। বললো, কাল আপনি আসবেন। স্বামিজীর আদেশ।

আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো উমাচরণের ম্লান মুখ। আশাহত নীরস প্রাণে জাগলো আনন্দপ্লাবন। রসের বিগলিত ধারা। করুণার স্বতঃস্ফূর্ত শিহরণ—প্রেমের বেগবতী ধারা—শাশ্বত উন্মাদনা।

এতদিন পরে স্বামিজীর করুণা হয়েছে। তিনি আমাকে দেখবেন : এ বড় কম কথা নয়।

দীর্ঘ ত্রয়োদশ দিবস অতিক্রান্ত হলো। এলো চতুর্দ্দশ দিবস। এতদিন ধরে তিনি কেবল মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছেন, করুণা পান নি। এই দিনটি উমাচরণের জীবনে এক মহাদিন। ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল ভিত্তি গড়ে উঠলো এই দিনে। তামসিক জীবনের ঘোর অন্ধকার ঘুচে গেল এই মহাদিনকে স্মরণ করে। এলো ঊষার উজ্জ্বল আলোক স্বপ্নময় রঙিন দিনের হাতছানি নিয়ে। স্বচ্ছ এবং সুন্দর আনন্দধারা। স্নিগ্ধ করলো প্রাণমন। উমাচরণ বুঝতে পারলেন, তাঁর মন আজ সত্যিকার আনন্দে ভরপুর।

সকাল সকাল গঙ্গাস্নান করে আশ্রমে চলে এলেন উমাচরণ। স্বামিজীর দিব্য অঙ্গ স্পর্শ করলেন ভক্তিভরে। দিব্য করুণাভরা মহামানবের পদযুগল স্পর্শমাত্রে নিজের দেহের এবং মনের আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। এক অভূতপূর্ব আনন্দের লহরী হৃদয়-সাগরে অপরূপ নৃত্য করে বেড়াতে লাগলো। সে নৃত্যে মন চঞ্চল এবং উদ্বিগ্ন হয় না। শান্ত, সমাহিত এবং আনন্দময় হয়ে ওঠে।

তৈলঙ্গস্বামী মঙ্গলদাসকে আদেশ করলেন, একটা পাথর, কিছু গেরিমাটি আর এক লোটা জল এনে দাও।

মঙ্গলদাস তাই এনে দিলো।

উমাচরণ গেরিমাটি ঘষতে লাগলেন পাথরের শিলে। একটা পাথরের বাটিতে ঐ ঘষা গেরিমাটি রেখে দিলেন।

দুপুরবেলায় খেতে এলেন বাসায়।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর পেলেন বিশ্রাম। আবার যেতে হবে কাজে। আশ্রমে এসে মহাপুরুষের কাজ করবেন উমাচরণ। তবে তো কৃপা হবে তাঁর। লাভ করবেন শ্রেয়কে।

মনে মনে খুসী হলেন উমাচরণ। কর্মের জন্যে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। কারণ তিনি জানতেন কর্মের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় ভক্তিকে। সেই ভক্তি এনে দেবে ঈশ্বরের করুণা—মহাপুরুষের দিব্যশক্তি।

খাওয়াদাওয়ার পর পুনরায় এলেন উমাচরণ স্বামিজীর আশ্রমে।

সন্ধ্যে পর্যন্ত গেরিমাটি ঘষলেন। সন্ধ্যের সময় আবার বাসায় ফিরলেন।

বিকেলে একজন ব্রহ্মচারী এলেন ঐ আশ্রমে। তৈলঙ্গস্বামী তাঁর হাতে চন্দনের একটি বাটি দিলেন। তার সঙ্গে দিলেন একটি লেখা কাগজ।

ইসারায় বললেন, দেওয়ালে চন্দন দিয়ে ওটি লিখে দাও।

ব্রহ্মচারী তাই করলেন। ঐ কাগজে দেবনাগরী অক্ষরে ধর্মোপদেশ লেখা ছিল। সেটি দেওয়ালে লিখে দিলেন, যাতে ভক্তজন কেউ এলে নজরে পড়ে।

পনেরো দিনের দিন উমাচরণ এলেন আশ্রমে। আবার গেরিমাটি ঘষতে লাগলেন।

এবার হাতটা একটু ধীরে চালালেন। স্বামিজী তাই দেখে বললেন, জোরে ঘষো।

তাঁর তেজোময় মূর্তি লক্ষ্য করে ভয় পেলেন উমাচরণ। জোরে জোরে হাত নাড়তে লাগলেন।

এ যে স্বামিজীর নির্দেশ। লঙ্ঘন করা যায় কি! আগের দিনের মত গেরিমাটি ঘষলেন উমাচরণ।

অপরাহ্নে জনৈক ব্রহ্মচারী এলেন। তিনি চন্দন সহযোগে আশ্রমের দেওয়ালগাত্রে শ্লোকগুলি লিপিবদ্ধ করলেন।

এমনিভাবে প্রায় একমাস অতিবাহিত হলো। প্রতিদিন চন্দন ঘষার ফলে উমাচরণের ত্ব'হাত অবশ হয়ে পড়লো।

মনে মনে প্রকাশ করলেন অক্ষমতা। কিন্তু তা মুখ ফুটে বলতে পারলেন না স্বামিজীর কাছে। আশঙ্কা হলো, যদি তিনি রেগে ওঠেন।

নীরবে স্বামিজীর সামনে বসে কাঁদতে লাগলেন উমাচরণ। মনের ভাব, কবে তাঁর কৃপা হবে? আর তিনি কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না।

অবশেষে কৃপাময়ের কৃপা হলো।

তৈলঙ্গস্বামী মঙ্গলদাসকে ইসারায় জিগ্যেস করলেন, ও কি দেবনাগরী জানে?

উমাচরণকে জিগ্যেস করলো মঙ্গলদাস। বললো, স্বামিজীর কথা শুনেছেন কি? আপনি পড়তে জানেন কি দেবনাগরী?

উমাচরণ বললেন, হ্যাঁ।

স্বামিজী তাঁর বেদীর কম্বলের ভেতর থেকে একটা বাঁশের চোঙা বের করলেন। তার মধ্যে কিছু কাগজ ছিল।

মঙ্গলদাসকে দিয়ে বললেন, উমাচণকে বলো এগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে।

স্বামিজীর কথা পালন করলো মঙ্গলদাস।

উমাচরণ স্বামিজীর এ ধরণের কৃপা লাভ করে আনন্দিত হলেন।

ভাবলেন, এবার থেকে তাঁকে আর চন্দন ঘষতে হবে না। অমানুষিক শ্রমের হাত হতে পাবেন পরিত্রাণ।

শ্লোকগুলি একে একে অনুবাদ করলেন উমাচরণ। অনুবাদের নীচে নিজেব নাম সই করলেন।

এমনিভাবে পাঁচদিন ত্ব'বেলা পরিশ্রম করার পর উমাচরণ অনুবাদের কাজ শেষ করলেন।

স্বামিজী পাঠ করতে বললেন। বললেন, কেমন অনুবাদ করলে? পড়ো সব। আমি শুনবো।

উমাচরণ পাঠ করলেন সেগুলি।

বড় ভাল লাগলো তাঁর।

বললেন, বেশ লিখেছ।

স্বামিজী সেগুলি চোঙায় ভরে রেখে দিলেন কম্বলের তলায়। পরে আর একটি চোঙা বের করলেন। তার মধ্যে ছিল কিছু সংস্কৃত শ্লোক।

সেগুলি অনুবাদ করার ভার নিলেন উমাচরণ।

তিনদিন কেটে গেল। তারপর সমাপ্ত হলো অনুবাদের কাজ। স্বামিজীর কাছে নিয়ে এলেন অনুবাদগুলি উমাচরণ।

স্বামিজী বললেন, পাঠ করো। আমি শুনবো।

শ্লোকগুলির অনুবাদ পাঠ করলেন উমাচরণ।

স্বামিজী মন দিয়ে শুনলেন। পরে সেগুলি আবার চোঙায় ভরে বেদীর নীচে কম্বলের তলায় রেখে দিলেন। তারপর উমাচরণকে বললেন, এবার তুমি বাড়ী যাও। আহার করো গে।

হৃষ্টচিত্তে বাসায় ফিরে এলেন উমাচরণ। আহার করলেন। তারপর একটু বিশ্রাম নিলেন।

অপরাহ্নে আবার এলেন আশ্রমে। এসে দেখলেন, স্বামিজী শুয়ে রয়েছেন। ঠিক যেন শিব শুয়ে আছেন।

এবার উমাচরণ বিনা আদেশেই স্বামিজীর সেবা করতে লাগলেন। অধরাকে ধরার মধ্যে পেয়েছেন তিনি। অরূপকে পেয়েছেন রূপের মাঝে। তাঁর মনে আনন্দ আর ধরে না। উৎফুল্ল হৃদয় নিয়ে মহা-মানবের পদসেবায় লেগে গেলেন।

স্বামিজী তাঁর সেবায় তুষ্ট হলেন। তাঁর মধ্যে তখন ছিল না কোন রুষ্ট ভাব—প্রতিবাদের শর। শান্ত অথচ অনাবিল ভাবে অনুগত ভক্তের সেবা গ্রহণ কবতে লাগলেন।

পরে মঙ্গলদাসকে কাছে ডেকে ইসারায় বললেন, ওকে বলো কাল থেকে দিনের বেলায় না এসে সন্ধ্যের সময় যেন আসে।

মহামানবের—গুরুর যেমন নির্দেশ তা পালন করতেই হবে। এখন থেকে উমাচরণের মনের সমস্ত রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব তিরোহিত হলো। নির্দ্বন্দ্ব মনে গুরুদেবের সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন। এতদিন পরে গুরুদেবের প্রতি এলো বিশ্বাস—ভক্তি।

সেদিন বাসায় চলে এলেন উমাচরণ।

পরদিন সন্ধ্যের সময় পুনরায় এলেন আশ্রমে। এসে দেখলেন, তৈলঙ্গস্বামী দেবতার উদ্দেশ্যে আরতি নিবেদন করছেন। দেবী দক্ষিণা-কালি আর মহাদেবের আরতি করলেন তৈলঙ্গস্বামী।

আহা, কি সুন্দর আরতি। কি গম্ভীর আর অচল ভাবাবেশ। পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে নাচতে নাচতে ভাবের ঘোরে আবতি করতে লাগলেন তৈলঙ্গস্বামী। সে আরতি যে দেখলো তারই মন-প্রাণ মুগ্ধ হয়ে গেল। জ্ঞানানলে তপ্ত চঞ্চল হৃদয়মন ভক্তিহিমে জমাট বেঁধে মহাপুরুষের পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়লো।

ভক্ত উমাচরণও দেখলেন গুরুদেবের ভাবময় আরতি। তারপর প্রণাম জানালেন দেবতাব উদ্দেশ্যে।

আরতি সমাপ্ত হলে তৈলঙ্গস্বামী নিয়ে এলেন উমাচরণকে একটি ছোট ঘরে। সেখানে আর কেউ ছিল না। ঘরের মেঝে একটি আসন পাতা। তার সামনে জ্বলছে একটি প্রদীপ। ঘরময় পবিত্র সুবাস বইছে। একটি সুন্দর ধ্যানস্তিমিত ভাব রয়েছে ঘরে। ধ্যানী মহাপুরুষেব দিব্যস্পর্শে ঘরটিও হয়ে উঠেছে ধ্যানগম্ভীর।

তৈলঙ্গস্বামী সেখানে এসে ধীরে ধীরে বসলেন। উমাচরণকে বললেন, বসো।

উমাচরণ তাঁর সামনে আসন গ্রহণ করলেন।

এবার অন্তর্যামী স্বামিজী তাঁর কানে কানে বললেন, তুমি যে বিষয় মনে করে আমার কাছে এসেছ তাতে তোমার এত সংশয় কেন? তুমি বামুনেব ছেলে হয়ে পুনর্জন্ম বিষয়ে সন্দেহ করো। এ বড় আশ্চর্যের কথা। ত্রিকালদর্শী, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, মহর্ষি, সিদ্ধ, শুদ্ধ মহাত্মাগণ তপোবলে, জ্ঞানবলে ও যোগবলে যেসব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

করে গেছেন তাতে কি সংশয় করতে আছে? তাঁরা যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্যি। জীবের সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করার জন্যে জন্ম-জন্মান্তর পরিগ্রহ করতে হয় এও সম্পূর্ণ সত্যি। মানুষ মাত্রেই যদি একটু চিন্তা ও চেষ্টা করে তবে পূর্বজন্ম, বর্তমান জন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্ম এই তিন জন্মের খবর সহজে জানতে পারে আর স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাও বেশ বুঝতে পারে। দুঃখের বিষয় আসল তত্ত্ব জানবার বা বোঝাবার কারও চেষ্টা নেই। আমি তোমাকে যা বলবো বা বোঝাবো তাই যে সত্যি হবে তাব প্রমাণ কি? আর তাই তোমার বিশ্বাস হবার কারণ কি?

চিত্রার্পিতেব মত শুনতে লাগলেন উমাচরণ স্বামিজীর অলৌকিক কথাবার্তা। মুখে কোন কথা নেই। নিস্কম্পমান ওষ্ঠপুটে দেখা গেল না বাক্‌স্ফূর্তির চঞ্চলতা।

মেঘগর্জনের মত স্বামিজী একটানা বলে গেলেন। ভক্তের মনের সন্দেহ দূব করার অজুহাত নিয়ে তিনি ভঙ্গ করেছেন দীর্ঘকালেব মৌনতা। এখন তাঁকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। মুক্ত ত্রিবেণীব মত তাঁর বাক্‌স্ফূর্তি উমাচরণকে বিস্মিত এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত করে তুললো। সেই অসাধারণ এবং অলৌকিক মিষ্ট এবং গাম্ভীর্য-পূর্ণ ভাষণ শুনে উমাচরণ আন্তরিক আনন্দ অনুভব করলেন। মন চলে গেল ভাবনাবিহীন রাজ্যে, সুখদুঃখের গণ্ডীর ওধারে। বাইরের কোলাহল—জগৎসংসারের সর্ববিধ অশান্তির ঝঞ্ঝারব তাঁর কানে প্রবেশ করতে সাহস পেল না। যোগীবরেব ধ্যাননিমীলিত স্থির নয়নদু'টিব প্রতি অবিচল—অনিমেষ দৃষ্টি সংস্থাপন করে শুনে যেতে লাগলেন।

স্বামিজী পুনরায় শুরু করলেন বলতে, তুমি যখন আমার কাছে এসেছ আর এত কষ্ট স্বীকার করেছ তখন আমি তোমাকে পুনর্জন্ম ভাল করে বুঝিয়ে দেব। কেবল বোঝান নয় দিব্য চোখে তা দেখতে পাবে।

প্রথমে তোমার পূর্ব ঘটনা কতকগুলি বলবো যা তুমি ছাড়া

এখানে আর কেউ জানেন না। তোমার যদি তা বিশ্বাস হয় পরে যা বলবো তাও সত্যি বলে জানবে। আর এর জন্যেই তোমার চিত্ত এমন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। আমার কথায় বিশ্বাস এলে তোমার মন শান্ত হবে।

এবার উমাচরণের অন্তর আরও হাল্কা হয়ে উঠলো। এতক্ষণ অন্তরে যে অবিশ্বাসেব পাষাণ আপন বজ্রাসন করে বসেছিল, আজ মহামানবের কাছ থেকে পরম আশ্বাস পেয়ে শারদাকাশে ভাসমান শুভ্র জলদকণাব মত লঘুভার হয়ে উঠলো।

আবার মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন।

স্বামিজী বলে গেলেন, দেখো, লোকের যখন পুনর্জন্ম হয় তখন ইহজীবনের মালমসলা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাণু সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয়। সেইজন্যে এই জীবনে যে বিদ্বান পরজন্মে সে বিদ্বান হয়েই জন্মগ্রহণ কবে। এই জন্মে যে ভাল বাজাতে পাবে পবজন্মে সে নিশ্চয় বাজাতে পারবে। এই জন্মে যিনি ধার্মিক পবজন্মে তিনি নিশ্চয়ই ধার্মিক হবেন। এই জন্মে যে চোর পরজন্মে সে সাধু হতে পারে না। যদি একটু ভেবে দেখ তবে বেশ বুঝতে পারবে যে পরকাল যদি না থাকতো তবে ভগবানকে দয়াময় ও সর্বশক্তিমান বলা যেতে পারতো না। সকলেই বলতো, ঈশ্বব যত অবিচাব করেন এত অবিচার কোন পাপিষ্ঠ মানুষের দ্বারা সম্ভব হয় না।

স্বামিজী আবার বললেন, যদি কেবলমাত্র এক জীবন অর্থাৎ এই জীবনই শেষ জীবন হতো তাহলে কেউ রাজা, কেউ প্রজা, কেউ ধনী, কেউ নির্ধন, কেউ বেহারা, কেউ মেথর কেন? তাছাড়া কেউ যোগী, কেউ নিরোগ, কেউ মহা ঐশ্বর্য ভোগ করছেন, কেউ অতিকষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। জীবনের এত প্রভেদ কেন? অন্যায় কাজ না করলে ঈশ্বর কাউকে সাজা দেন না। ঈশ্বর ভালমন্দ বিচার করে দণ্ড দেন। সাধারণের বুদ্ধি কম। তাই ঠিকমত বিচার করতে পারে না। তিনিই একমাত্র যোগ্য বিচারক। কর্মফল অনুসারে জীবনের এত প্রভেদ হয়ে থাকে।

এরপর স্বামিজী পুনর্জন্ম বিষয়ে আরও অনেক কথা বললেন উমাচরণকে।

মনের সংশয় কাটতে লাগলো। উমাচরণ এবার স্বামিজীর কথায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন। পুনর্জন্মবাদ মানলেন। মনে মনে ভক্তিপ্রণাম নিবেদন করলেন স্বামিজীর উদ্দেশ্যে।

স্বামিজী সব বুঝতে পারলেন। তিনি পুনরায় হাস্যদীপ্ত বদনে বললেন, তুমি পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস করো। আমি পরে তোমাকে এ বিষয়ে আরও অনেক তত্ত্বকথা শোনাবো। তবে এখন তোমার নিজেব বিষয়ে কিছু বলবো। শোন।

স্বামিজী বললেন, তোমার নাম অমুক। তোমার বাবার নাম অমুক। তোমার নিবাস অমুক গ্রামে। তোমার বাড়ীতে এতগুলি ঘর আছে। বাড়ীর অমুক দিকে একটি পুকুর আছে। তার কাছে অমুক অমুক গাছ আছে। বাড়ীতে অমুক অমুক লোক বাস করে।

উমাচরণ অবাক হয়ে গেলেন তৈলঙ্গস্বামীর কথা শুনে। এমন আপনার জনের মত বলছেন যে শুনলে মন-প্রাণ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

স্বামিজী আবার বললেন, তুমি আগের জন্মে বামুন ছিলে। অমুক গাঁয়ে তোমার বাড়ী ছিল। তুমি বিখ্যাত জমিদার ছিলে। তুমি বড় ভদ্র ছিলে। ঐ বাড়ির দোতলার ওপর দক্ষিণদ্বারি তোমার শয়নঘর ছিল। তার ভেতর দরজার ওপর তোমার নিজের হাতের লেখা তিনটি সংস্কৃত শ্লোক এখনো আছে। সুবিধামত সেগুলি পাঠ করো। সেগুলি হচ্ছে—

১। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানী দেহী॥

২। রূচিনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথ জুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব॥

৩। নির্ম্মমস্যা প্রমেয়স্য নিস্কলস্যা শরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা॥

অর্থাৎ। মানুষ যেমন জীর্ণ কাপড় ত্যাগ করে নতুন কাপড় ধারণ

করে সেরকম দেহী জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর আশ্রয় করে।

নদীসকল নানা পথে ধাবিত হয়। শেষকালে এক জায়গায় এসে মিলিত হয়। তেমনি মানুষের প্রবৃত্তি ও উপাসনার পথ আলাদা হলেও পরিণামে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সকলেরই শেষ উদ্দেশ্য হয়।

ব্রহ্ম অহঙ্কার ও পরিণামশূন্য, নিত্য, শুদ্ধ, শরীরহীন হলেও সাধক সকলের মঙ্গলের জন্যে তাঁর নানা রকম কল্পিত রূপ হয়ে থাকে।

স্বামিজী আবার বললেন, অমুক গাঁয়ে অমুক নামে যে লোকটি বাস করেন তিনি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। তুমিও তাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাস ও স্নেহ করো। এর কারণ কি জানো?

উমাচরণ বললেন, কি কারণ স্বামিজী?

স্বামিজী বললেন, তিনি তোমার আগের জন্মের পিতা ছিলেন। তুমি পুত্র আর তিনি পিতা বলে আগের যেমন স্নেহ তেমনই আছে, কেবলমাত্র দেহ পরিবর্তনের জন্যে কেউ কাউকে চিনতে পারছো না। আর তোমার খুড়ো অমুক নাম ধারণ করে মুঙ্গেরেই আছেন। তিনি তোমাকে বড় ভালবাসেন। তার জন্যে প্রতিদিন সন্ধ্যের পর তোমার কাছে এসে রাত নটা দশটা পর্যন্ত থাকেন। তোমাকে একবার না দেখলে তাঁর মনে শান্তি হয় না। তুমিও তাঁকে বড় ভক্তি করে থাক। এর কারণ কি জানো?

কি কারণ স্বামিজী? প্রশ্ন করলেন উমাচরণ কৌতূহলী হয়ে।

স্বামিজী বললেন, এর কাবণ হচ্ছে আগের জন্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। স্নেহ যেমন তেমনি আছে, দেহ পরিবর্তন হয়েছে মাত্র।

স্বামিজী আবার বললেন, উমাচরণ! তোমার আগেব জন্মের সুকৃতিগুণে অবকাশ নিয়ে কাশীধামে এসেছ। ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছ। তাই নিজের উচিতমত সদ্‌কর্ম কবো। যাতে জন্মজন্মান্তবে আব কোনরকম যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়। তুমি যদি ভালভাবে এবার জীবন অতিবাহিত করো তবে পুনর্জন্মে মুক্তি পাবে। বাসনা ত্যাগই মুক্তির সোপান। বাসনা ত্যাগ করতে না পারলে মুক্তিব আশা নেই।

উমাচরণ শুনলেন স্বামিজীর কথা। বিশ্বাস এলো। এতদিন যার ওপর অবিশ্বাস ছিল এবার স্বামিজীর মুখে তাই শুনে বিশ্বাস জন্মাল।

এদিকে তত্ত্বকথা শুনতে শুনতে অনেক রাত হলো।

স্বামিজী উমাচরণকে বললেন, তুমি বাসায় যাও। শৌচক্রিয়াদি শেষ করে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আজ আমরা উভয়ে একসঙ্গে স্নান করতে যাবো।

পরের দিন উমাচরণ তৈলঙ্গস্বামীর আশ্রমে এলেন। পঞ্চগঙ্গার তীরে সুন্দর আশ্রম। পূর্বকথামত ঐ ঘাটে স্নান করতে নামলেন।

স্নান করতে করতে স্বামিজী বললেন, উমাচরণকে, দেখো উমাচরণ। আজ রাত্তিরে যখন আসবে একখানা খাতা সঙ্গে এনো। আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দেবো। সেগুলি তুমি লিখে নেবে। তাতে তোমার বিশেষ উপকার হবে। কেবল শুনে গেলে মনে করে রাখতে পারবে না। অনেক ধর্মশাস্ত্র পড়ার দরকার হবে না। আমি যা লিখে দেবো তা পাঠ করে মনে রাখতে পারলে যথেষ্ট জ্ঞান হবে।

জীবের মুক্তির চেয়ে সারবস্তু আর কিছু নেই। আত্মজ্ঞানের চেয়ে আর জ্ঞান নেই। সেই মুক্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্যে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার কোন দবকার হয় না। কেবল আসল কথাগুলি জানতে পাবলেই কাজ হয়।

স্বামিজী আবাব বললেন, মুক্তি ভিন্ন মানবের গতি নেই। সর্বদা মুক্তি কামনা করবে। যদ্দিন না জ্ঞানের উদয় হয় তদ্দিন কেবল যাতায়াত ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। পৃথিবীতে যা কিছু দেখেছো বা করছো তা সমস্তই ভুল। সংসারে রাজা অথবা প্রজা কারুর কোনরকম নির্মল সুখভোগ করার ক্ষমতা নেই।

উমাচরণ স্বামিজীর কথা শুনে আনন্দিত হলেন। স্বামিজী এবার স্নান করতে লাগলেন।

প্রথমে চিৎ হয়ে জলের ওপর ভাসলেন। তারপর স্রোতের

বিপরীত দিকে ভেসে চললেন। এইভাবে কিছুদূর যাবার পর অদৃশ্য হলেন। মহাযোগীর যৌগিক লীলার প্রকাশ হলো।

উমাচরণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। স্বামিজীকে এই তো এখানে দেখলুম। তিনি গেলেন কোথায়?

দু'ঘণ্টা পরে স্বামিজী জলের ওপর ভাসতে লাগলেন। উমাচরণের কাছে এলেন।

পরে জল থেকে উঠে পড়লেন।

উমাচরণ তাঁকে সিঁড়ির ওপর বসালেন। গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দিলেন।

তারপব ‘াশ্রমে চলে এলেন দু'জনে। গুরু আর শিষ্য। তৈলঙ্গস্বামী আর উমাচবণ।

তৈলঙ্গস্বামী বসলেন একটি বেদীর ওপর। উমাচরণ তার ঠিক সামনে নীচে বসলেন।

স্বামিজী উমাচরণকে বললেন. বেলা অনেক হয়েছে। এবার বাড়ী যাও। আহার করে সন্ধ্যের সময় এসো। একটা খাতা আনবে।

উমাচরণ চলে এলেন নিজের বাসায়। আজ তাঁর অন্তরে আনন্দ-সাগর ফেনিল উচ্ছ্বাসে ক্রীড়োন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। বাড়ী গিয়ে তাড়াতাড়ি আহারনিদ্রা সমাপন করে গুরুদেবের আশ্রমে আসার জন্যে তৈরী হতে লাগলেন।

দিন শেষ হয়ে এলো। সন্ধ্যের ধূসর আঁচল প্রকৃতির কোলে বিছিয়ে দিল মুহূর্তের চঞ্চলতা। শ্রান্ত বিহঙ্গকুল শেষবারের মত সমস্বরে কাকলিধ্বনি করতে করতে আপনাপন বাসায় ফিরতে লাগলো। শ্বাপদ, চতুষ্পদাদি জীবগণও যে যার ঘরে ফিবলো। ওদিকে উমাচরণ পরম শান্তির আশায় আনন্দময় ধাম তৈলঙ্গস্বামীর আশ্রমের দিকে ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগলেন।

এবার স্বামিজীর কথামত উমাচরণ একটি খাতা নিয়ে এলেন। আশ্রমের একটি ছোট ঘরে স্বামিজী উমাচরণকে নিয়ে বসলেন।

বললেন নানারকম শাস্ত্রীয় তত্ত্বকথা আর ধর্মোপদেশ। ঈশ্বরতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সংসারতত্ত্ব, ধর্ম, আত্মবোধ, পুনর্জন্ম ইত্যাদি।

উমাচরণ একে একে সেগুলি লিখে নিলেন।

স্বামিজী ঈশ্বরপ্রসঙ্গে প্রথমে বললেন।

উমাচরণ প্রশ্ন করলেন, ঈশ্বর কথাটিতে কোন গুণ বোঝায় কি কোন বস্তু বোঝায়? তাঁকে জানবার বা দেখবার কোন উপায় আছে কি না?

স্বামিজী বললেন, সকলেই স্বীকার করে ঈশ্বর কথাটিতে সর্বব্যাপী বস্তুই বোঝায়। যখন বলি ঈশ্বর সর্বব্যাপী, ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী তখন ঈশ্বরের যে স্থানব্যাপকতা গুণ আছে তাতে আর কারও সন্দেহ নেই। একখানা বই জায়গা জুড়ে আছে। সেই জন্যে তাকে সাকার বলি। কিন্তু ঈশ্বর স্থান ব্যেপে আছেন। অথচ তাঁকে নিরাকার বলি এর কারণ কি? যে দ্রব্য কোন সীমা-বদ্ধ স্থান ব্যেপে থাকে তাকেই সকলে সাকার বলে বোঝেন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ঈশ্বর কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যেপে নেই। এই বিশ্ব যে অনন্ত ও অসীম, ঈশ্বর যে স্থান ব্যেপে আছেন তার সীমা নেই। তা অনন্ত ও অসীম। এর জন্যে তিনি নিরাকার।

যদি বলো কল্পনায় বিশ্বের একটি সীমা দিতে পারি, কিন্তু ঐ সীমা দিয়ে একবার ভাব দেখি, যে ঐ সীমার বাইরে আর স্থান আছে কি না? এ কেউ কখনো ভাবতে পারবে না আর কারও বুদ্ধিতে আসবে না। এই জন্যেই বিশ্বের সীমা নেই আর সেই জন্যেই ঈশ্বর নিরাকার। এই বিশ্বে যত জায়গা আছে, তত জায়গা তিনি ব্যেপে আছেন। এই কারণেই তিনি নিরাকার। মানুষের জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা এমন কোন বস্তু স্থির করবার ক্ষমতা নেই যার দ্বারা তাঁর আকারের তুলনা হয়। সুতরাং তাঁর আকারের তুলনা নেই বলেই তিনি নিরাকার।

উমাচরণ লিখতে লিখতে প্রশ্ন করলেন, ঈশ্বর নির্গুণ কেন?

তৈলঙ্গস্বামী বললেন, যাঁর এত গুণ যা বুদ্ধির অগোচর তা কিভাবে নির্গুণ হতে পারে? ঈশ্বরের গুণেব সীমা নেই আর কত রকমের গুণ তারও সীমা নেই। অতুলনীয় গুণ বলেই তিনি নির্গুণ। আমার এই কথাটি অনেকের কাছে নতুন বলে মনে হতে পাবে। কারণ অসীম মানে সাধারণত লোকে বোঝে যে যার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, যার পরিমাণের ইয়ত্তা নেই। তাকেই লোকে অসীম বা অনন্ত বলে। এখানে যে অসীম কথাটি ব্যবহার হয়েছে তার অর্থ, যার কোন বিশেষ সীমা নেই, যার দ্বারা তাঁকে অন্য কোন গুণ হতে বিশেষরূপে ভাবা যায়, যে গুণের এমন কোন সীমা নেই তাই অসীম গুণ ঈশ্বর নির্বিশেষ এই জন্যে তিনি নির্গুণ। এই জগতে যতরকম গুণ আছে সবই ঈশ্বরে একমাত্র গুণ হতে উদ্ভূত হয়েছে। সুতবাং এই গুণটি তাতে আছে, এবং তার বিপরীত ভাবাপন্ন গুণটি তাঁতে নেই, এ-কথা কেউই বলতে পারবেন না। এই জগতে যত গুণ আছে সমস্তই তাঁর এক অনির্বচনীয় গুণের অন্তর্গত। এই জন্যে তাঁর গুণের সীমা নেই। এই জন্যে তাঁর গুণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হতে পারে না বলেই তিনি নির্গুণ।

উমাচরণ প্রশ্ন করলেন, ঈশ্বরের রূপ কি রকম?

তৈলঙ্গস্বামী বললেন, এই জগতের যতরকম রূপ আছে সকলই তাঁর একমাত্র রূপ হতে উৎপন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন রকম রূপ নেই যা সেই রূপের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তিনি জ্যোতির্ময় আনন্দস্বরূপ বলে তাঁকে বিশ্ব-রূপ বলা হয়ে থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দেবদেবী সমস্তই তাঁর স্থূলরূপ। প্রথমে এই সব স্থূলরূপ ধ্যান না করলে সূক্ষ্মরূপ দর্শনে অধিকার হয় না। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমে স্থূল রূপের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে বিশ্বরূপ যে কি প্রকার তা অনুভব করতে পারবেন। সে রূপের মাধুরী যিনি দেখেন নি তাঁর তো কথাই নেই। আর যিনি দেখেছেন তাঁরও লিখে প্রকাশ কবার সাধ্য নেই। কারণ

সেই প্রকার ভাষা নেই আর সে রূপ দেখলেই লোকে মোহিত হয়ে বাক্যহীন ও জ্ঞানহারা হয়।

উমাচরণ জিজ্ঞেস করলেন, ঈশ্বর চেতন না অচেতন?

স্বামিজী বললেন, ঈশ্বর চেতনও নন, অচেতনও নন। তাঁর নির্গুণ অনবচ্ছিন্ন গুণকে চৈতন্য গুণ বলা হয়ে থাকে। চেতন গুণ কাকে বলে সকলেই তা জানেন। কিন্তু অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যগুণ কিরূপ তা আমরা অন্তরে ধারণা করতে অক্ষম। ঈশ্বর বিশ্বরূপ; নিরাকার ও নির্গুণ। তাঁর আকার ও গুণ সম্বন্ধে চিন্তা করা আমাদের সাধ্যাতীত। সেইজন্যে তাঁর উপাসনা করাও বড় শক্ত। বাস্তবিক নিরাকার ঈশ্বরকে আমরা ভাবতে পারি না। ঈশ্বর মনের অগোচর। যদি কেউ বলেন, তিনি মনে মনে নিরাকার ঈশ্বরকে ভাবতে পারেন তবে এটা ঠিক যে তিনি নিরাকার শব্দের মানেও বোঝেন নি। নিরাকার ও নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই ভাবা যায় না বলে সগুণ ঈশ্বর ধারণা করে চিন্তা করতে হয়। সগুণ ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে চিত্ত যত নির্মল হবে ততই সেই আত্মার উজ্জ্বলতা অন্তরে জাগবে। তখন মনের সাহায্য ছাড়াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।

স্বামিজী বললেন, ঈশ্বরের স্বরূপ উন্নতির চরম সীমা। যিনি উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়েছেন তিনিই ঈশ্বরে লীন হয়েছেন। তাঁর আর পরিবর্তন নেই। এই উন্নত মানুষ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে দেখতে পান আর এই উন্নত মনুষ্যদশার চরম আদর্শ পুরুষই সগুণ ঈশ্বর। এক মনুষ্যরূপ আধারে সমগ্র বিশ্ব যাঁতে একেবারে প্রতিবিম্বিত রয়েছে তিনিই সগুণ ঈশ্বর। যিনি কর্ম করেও নিষ্ক্রিয়, যিনি মানুষের আকার ধারণ করেও অন্তরে বিশ্বরূপ, যাঁর জ্ঞানে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জন্মেছে, যিনি আমিই ব্রহ্ম, এরূপ জ্ঞান করেন সেই আত্মজ্ঞানী পুরুষই ভগবানের স্বরূপ। তিনিই সগুণ ঈশ্বর।

যদি ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান জন্মে থাকে তবে এরূপ উন্নত পুরুষ সম্বন্ধে

অবিরাম চিন্তা করো। নিজের আমি জ্ঞান, এরূপ মুক্ত আত্মার গুণে মেশাতে চেষ্টা করো। ক্রমে দেখবে চিত্ত নির্মল হচ্ছে আর কোথা হতে কে যেন তোমাকে পথ দেখিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। একই ঈশ্বর ইনি নির্গুণ নিরাকার বিশ্বব্যাপী এবং সচ্চিদানন্দ তা বেশ বুঝতে পারবে।

স্বামিজী আরও বললেন, আমার চারদিকে, অন্তরে ও বাইরে যিনি নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে অধিষ্ঠান করছেন, যাঁর ইঙ্গিত মাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, সূর্য, বায়ু ও বরুণাদি নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য পালন করতে তৎপর হচ্ছেন, যাঁর সত্তা প্রভাবে আমরা জীবিত রয়েছি, যিনি চরণশূন্য অথচ সর্বত্র গমন করেন, কর্ণহীন অথচ মনের কথা পর্যন্ত শুনতে পান, নেত্রহীন কিন্তু সমস্তই প্রত্যক্ষ করেন, যিনি আমাকে দেখেছেন অথচ আমি তাঁকে দেখতে পাই না; কাম, ক্রোধ, লোভ, দুরাশা, বিষয়বাসনা ইত্যাদি প্রতারকগণ যাঁর সমাগমে ভয়ে ভীত হয়ে দেশ ত্যাগ করে পলায়ন করছে; জ্ঞান যাঁর স্বরূপ নির্ণয় করতে অক্ষম, কল্পনা যাঁর পরিমাণ করতে অক্ষম, মন ও আত্মা যাঁর কাছে গেলে আর ফিরে আসে না, মায়া যাকে আবরণ করতে পারে না, বাক্য যাঁর ব্যাখ্যা করতে পারে না, তিনিই ঈশ্বর।

যাঁর আরতি করার জন্যে চন্দ্র, সূর্য্য দীপ জ্বলছে, পবন চামর ব্যজন করছে, তরুলতা পুষ্পরাশি নিয়ে সুগন্ধি দান করছে, বিহঙ্গসকল কীর্তন করছে, বজ্র শঙ্খনিনাদ করছে, ভক্তি, শ্রদ্ধা, শান্তি, করুণা, মুক্তি যার পদসেবা করছে, বৈরাগ্য, জ্ঞান, যোগ, ধর্ম যাঁর দ্বারে প্রহরী রয়েছে; যিনি জীবের কর্মানুসারে ফল বিধান করছেন, যাঁকে লোকে বিস্মৃত হলেও তিনি তাকে ত্যাগ করেন না, যিনি মায়ানিদ্রা ভঙ্গ করে জাগ্রত করার জন্যে সকলকে আহ্বান করছেন, যিনি নিজে নির্গুণ হয়ে ত্রিগুণে ত্রিজগৎ বেঁধে রেখেছেন, অরূপ হয়ে আশ্চর্যরূপে ত্রিভুবন মোহিত করে রেখেছেন, চৈতন্যস্বরূপ হয়ে জীবকে মোহিনী মায়ায় অচেতন করে রেখেছেন তিনিই ঈশ্বর।

ব্রহ্ম জগৎ হতে অতিরিক্ত কিন্তু ব্রহ্ম হতে ভিন্ন কোন বস্তুই নেই। তবে যে ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ সকল দৃশ্য হচ্ছে সেই সমস্ত মরুভূমিতে মরীচিকার মত মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। যে কোন বস্তু দৃশ্য বা শ্রুত হয় তা ব্রহ্ম ছাড়া নয়। কারণ জ্ঞানের উদয় হলে সেই সমস্ত বস্তুকে অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বব্যাপী নিত্য ও জ্ঞানরূপ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করেন। জ্ঞানচক্ষুশূন্য মানুষ তাঁকে দেখতে পারে না, যেমন অন্ধ মানুষ দেখতে পায় না সূর্যকে। যিনি সূক্ষ্ম নন, স্থূল নন, হ্রস্ব নন, দীর্ঘ নন, জন্মবিনাশবিহীন এবং রূপ, গুণ, বর্ণ ও নামরহিত, নিত্য, একই রূপে পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে ও চতুর্দিকে অবস্থান করেন যিনি পূর্ণ, সত্য, চৈতন্য, আদি, অন্তরহিত, অদ্বিতীয়, আনন্দময় তিনিই ঈশ্বর।

যে লাভের পর আর লাভ নেই, যে সুখের পর আর সুখ নেই, যে জ্ঞানের পর আর জ্ঞান নেই, যাঁতে দৃষ্টি হলে আর কোন বস্তু দৃষ্ট হয় না, যা হলে আর তার পুনর্বার জন্ম হয় না এবং যাঁকে জানলে আর কিছুই জানতে হয় না, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি কোন দীপ্যমান বস্তু যাকে প্রকাশ করতে পারে না, যাঁর প্রকাশে সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি প্রকাশ হয়, যাঁর দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পায়; যে প্রকার অগ্নি লৌহপিণ্ডে প্রবিষ্ট হয়ে প্রদীপ্ত করে সেই প্রকার স্বয়ং ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুর অন্তরে ও বাইরে ব্যাপ্ত থেকে সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করেন, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যিনি মনুষ্য, দেবতা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহী, ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ এবং রাজা বা ভিক্ষুক নন কিন্তু সর্বব্যাপী সর্বান্তর্যামী, জ্যোতির্ময়, জ্ঞানস্বরূপ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় পদার্থসকল যে অদ্বিতীয়, নিশ্চল, অগ্নির উষ্ণতার মত নিত্য জ্ঞানস্বরূপ, আত্মাকে আশ্রয় করে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন সূর্যোদয় লোক সকলের ব্যবহারের কারণ হয়, সেই

প্রকার যিনি মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত এই চারি অন্তরেন্দ্রিয়ের ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তির কারণ, আর সমস্ত উপাধি-রহিত ও আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী এবং মনোহ্বব সৃষ্টিকার্য দ্বারা সর্বদা প্রত্যক্ষভাবে রয়েছেন তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন দর্পণ, জল, তৈল প্রভৃতি বস্তুতে মুখ প্রতিবিম্বের দর্শন হয়, কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব মুখ হতে ভিন্ন নয়, তেমনি বুদ্ধিতে যে আত্মার প্রতিবিম্ব তা জীবাত্মা হতে ভিন্ন নয়, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যিনি স্বরূপত মনশ্চক্ষু ইন্দ্রিয় হতে ভিন্ন এবং মনের মন, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, কিন্তু মন, চক্ষু ইত্যাদি কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নন, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন নানাপ্রকার পাত্রস্থ জলে এক সূর্যের প্রতিবিম্ব নানা প্রকার হয় তেমনি যিনি স্বয়ং প্রকাশ, বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় হয়েও নানা প্রকার জীবের নানা প্রকার বুদ্ধিতে, নানা প্রকারে কল্পিতের মত হয়ে রয়েছেন, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন সাধারণ প্রকাশক সূর্য এক হয়েও অনেক চক্ষুর বিষয়কে এককালে প্রকাশ করেন, সেই প্রকার এক হয়ে অনেক বুদ্ধির বিষয়কে যিনি এককালে প্রকাশ করছেন, সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন চক্ষু সূর্য কিরণ দ্বারা প্রকাশিত রূপকে গ্রহণ করে এবং অপ্রকাশিত রূপকে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি এক সূর্য যে চৈতন্য জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত হয়ে রূপাদিকে প্রকাশ করে, সেই সর্বপ্রকার নিত্য জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন সূর্য এক হয়েও চঞ্চল জলেতে অনেক দৃষ্ট হয় কিন্তু স্থির জলেতে একরূপই দেখায়, সেই প্রকার স্বরূপত এক হয়েও চঞ্চল বুদ্ধিতে নানাপ্রকারে প্রতীত হন সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন অতি অজ্ঞান ব্যক্তি স্বয়ং মেঘাবৃত নয়ন হয়ে এই অসম্ভাবিত কথা বলে, যে সূর্য মেঘে আচ্ছাদিত হয়ে প্রভাশূন্য হয়েছে সেই প্রকার অজ্ঞানদের কাছে যে নিত্য শুদ্ধ-চৈতন্য বদ্ধরূপে প্রতীত হন সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যিনি গভীর নন, ধীর নন, একমাত্র নির্বাণরূপী পুণ্যময়, যিনি জগতের সার, যিনি পাপ ও পুণ্যবিহীন, যিনি ব্যক্ত, অব্যক্ত, রূপশূন্য এবং সর্বময় তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যিনি এক হয়েও তাবৎ বস্তুর অন্তরে অন্তর্যামীরূপ হয়ে অবস্থিত করেন কিন্তু তাবৎ বস্তু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, বরং যিনি আকাশের মত সর্বব্যাপী, সেই নিত্য চৈতন্যস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

'আত্মাকে পৃথিবী বলা যায় না, কারণ পৃথিবীতে গন্ধগুণ আছে, আত্মায় সে গুণ নেই. আত্মা সেই গন্ধের প্রকাশক। আত্মা জল নয়, কেননা জলে রসগুণ আছে, আত্মাতে তা নেই, আত্মা রসের বিজ্ঞাতা। আত্মাকে তেজ বলা যায় না, কারণ তেজে রূপ গুণ আছে আত্মায় তা নেই, তিনি রূপের দর্শক। আত্মাকে বায়ু বলা যায় না, যেহেতু বায়ুর মত আত্মাতে স্পর্শগুণ নেই, আত্মা স্পর্শগুণের বিজ্ঞাতা। আকাশকেও আত্মা বলা যায় না, কারণ আকাশে শব্দগুণ আছে, আত্মার তা নেই, আত্মা শব্দের উচ্চারণ কর্তা। আত্মা কোন প্রকার ইন্দ্রিয় হতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয় অনেক, আত্মা এক এবং সর্ব অবস্থাতে এক ভাবাপন্ন। যিনি ভূমি প্রভৃতি হতে পৃথক, কেবল নিত্য সর্ব মঙ্গলময়, তাঁকেই আত্মা বলে জানবে এবং তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের স্থান, পরিণাম, রূপ, বর্ণ, কিছুই নেই, যিনি কোন প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট নন, যাঁর দ্রষ্টা, দৃশ্য, শ্রবণ, শ্রাব্য, কিছুই নেই, যে ব্রহ্ম বৃক্ষস্বরূপ, অথচ তাঁর মূল, বীজ, শাখা, পত্র, লতা, পল্লব, পুষ্প, গন্ধ, ফল ও ছায়া কিছুই নেই, তিনিই নিত্য জ্ঞানময় ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

কি বেদ, কি শাস্ত্র, কি শৌচ, কি সন্ধ্যা, কি মন্ত্র, কি জপ, কি ধ্যান, কি ধ্যেয়, কি হোম, কি যজ্ঞ, যার এ সকল কর্মের কিছুই নেই, যিনি উর্দ্ধ নন, অধঃ নন, শিব নন, শক্তি নন, পুরুষ নন, নারী নন, ব্রহ্মা নন, বিষ্ণু নন, কি গ্রহ, কি তারা, কি মেঘজ্বালা কিছুই নন, যিনি চন্দ্র নন, সূর্য নন যাঁর উদয়-অস্ত কিছুই নেই, যিনি স্বর্গে' নগরে বা ক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন না, কি জাতিগত, কি অজাতিগত, যাঁর কোন ভিন্নতা নেই যিনি একমাত্র নির্বাণরূপী পুণ্যময়, যিনি জগতের সার, যিনি পাপপুণ্যবিহীন, সর্বময় চৈতন্যস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

আলোকের প্রকাশে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, কিন্তু অন্ধকারের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, সেই প্রকার অজ্ঞানের নাশ হলেই, জ্ঞান আপনি প্রকাশ পায়, ব্রহ্মই সর্বশক্তিমান বলে, তিনিই জীবাত্মা এবং সত্য, চৈতন্য তাঁর স্বরূপ। ব্রহ্মই সর্ব স্বরূপে জানবে, কিছুই তাঁহা হতে ভিন্ন নয়। আকাশে মেঘ হতে আকাশের স্বরূপ অনুভব হয় না, মেঘ দূর হলে, আকাশ আবার আগের মত স্বচ্ছ হয়ে থাকে। এই আকাশের অস্তিত্বও আকাশরূপেই প্রতীয়মান হয়। তেমনি দৃশ্য প্রপঞ্চের অবসান হলে, চিৎ শক্তির স্বাভাবিক সত্তা উদিত হয়ে থাকে। এই সত্তা বা অস্তিত্বও উহা হতে ভিন্ন নয়। যে পদার্থ যা হতে উৎপন্ন, সেই পদার্থ তা হতে কখনও ভিন্ন নয়। চিৎস্বরূপ, ইক্ষুরসের মধুরতা, অনলের উষ্ণতা, তুষারের শীতলতা, সর্ষপে তৈল স্বরূপ, চিৎ সত্তাই জগতের সত্তা। জগৎ সত্তাই চিৎ সত্তার আকার। পল্লবের অন্তরে যেমন শিরা রেখা থাকে, তা পল্লব হতে অভিন্ন হলেও বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় তেমনি ব্রহ্ম জগৎ হতে অভিন্ন। ব্রহ্ম জগৎ হতে এবং জগৎ ব্রহ্ম হতে অভিন্ন হলেও এই জগৎকে ব্রহ্ম ধারণ করছেন।

রাগ, দ্বেষ, বায়ু, মন, বুদ্ধি, মায়া, আশা, বাসনা, চিন্তা প্রভৃতি বিষয়গুলি কেউ দেখতে পান না। এরা অপ্রত্যক্ষ হলেও এদের কাজ দেখে প্রত্যক্ষ বলে বোধ হয়। সেই রকম ঈশ্বরকে কেউ

দেখতে পান না কিন্তু তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপ দেখে তিনি অপ্রত্যক্ষ হলেও তাঁকে প্রত্যক্ষ বলে বোধ হয়।

উমাচরণ বললেন, এবার আপনি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলুন।

স্বামিজী বললেন, বিশ্বপতিব বিশ্ব সৃষ্টির অপার কৌশল সাধারণতঃ মনুষ্যবুদ্ধিব অতীত হলেও নিয়মগুলি এত সরল যে অনুশীলন করলেই হৃদয়ঙ্গম হয়ে মন ভক্তিরসে মগ্ন হয়। জীব সৃষ্টির প্রারম্ভে এই জগতে কেবল পঞ্চভূতের ও পরমাত্মার অস্তিত্ব বর্তমান ছিল, সেই পঞ্চভূতই জীব সৃষ্টির উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছে।

সেই নিত্য চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা হতে প্রথমে আকাশ সৃষ্টি হয়। তারপর আকাশ হতে বায়ু, বায়ু হতে অগ্নি, অগ্নি হতে জল, জল হতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে। উৎপত্তির পরে, আকাশ ইত্যাদিতে কারণগুণ ক্রমে তারতম্য বিশেষে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ উৎপন্ন হয়। সেই অবস্থাপন্ন আকাশাদিকে সূক্ষ্মভূত, মহাভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র বলা যায়। এই সকল সূক্ষ্মভূত হতে সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থূল ভূত সকল উৎপন্ন হয়েছে।

সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট যে শরীর, তাকে সূক্ষ্ম শরীর বলে। সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট শরীর যথা :—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি! পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা :—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় পৃথক পৃথক আকাশাদির সাত্ত্বিক অংশ হতে উৎপন্ন হয়, যথা আকাশের সত্ত্বাংশ হতে কর্ণ, বায়ুর সত্ত্বাংশ হতে ত্বক্, তেজের সত্ত্বাংশ হতে চক্ষু, জলের সত্ত্বাংশ হতে জিহ্বা এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হতে ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়েছে। এই সূক্ষ্মশরীর সুখ ও দুঃখ ভোগের কারণ।

বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি। মন সংকল্প বিকল্পাত্মক অর্থাৎ সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি। চিত্ত ও অহঙ্কার এরা উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত দুই বৃত্তি মাত্র। চিত্ত অনুসন্ধানাত্মক বৃত্তি এবং অহঙ্কার অভিমানাত্মক বৃত্তি। বুদ্ধি ও মন আকাশাদি পঞ্চ

ভূতের সাত্ত্বিক অংশ হতে উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এরা প্রকাশ স্বভাব বলে সাত্ত্বিক অংশের কাজ বলা যায়।

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যথা:—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, এবং উপস্থ। এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পৃথক পৃথক আকাশাদির রজঃ অংশ হতে উৎপন্ন হয়, যথা আকাশের রজঃ অংশ হতে বাক্য, বায়ুর রজঃ অংশ হতে পাণি, তেজের রজঃ অংশ হতে পাদ, জলের রজঃ অংশ হতে পায়ু, এবং পৃথিবীর রজঃ অংশ হতে উপস্থ উৎপন্ন হয়েছে।

পঞ্চ বায়ু যথা:—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান। উর্দ্ধে গমনশীল নাসাগ্র স্থায়ী বায়ুকে প্রাণবায়ু বলে। অধো-গমনশীল পায়ু আদি স্থানে স্থায়ী বায়ুকে অপান বায়ু বলে। ভুক্ত পীত অন্ন জলাদির সমীকরণকারী বায়ুকে সমান বায়ু বলে। উর্দ্ধ গমনশীল কণ্ঠে স্থায়ী বায়ুকে উদান বায়ু বলে এবং সর্ব নাড়ীতে গমনশীল সমস্ত শরীর, স্থায়ী বায়ুকে ব্যান বায়ু বলে।

সাংখ্য মতাবলম্বী লোকেরা বলেন যে নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় নামে আরও পঞ্চ বায়ু আছে। নাগ উদ্-গীরণকারী বায়ু, দেবদত্ত, হাফিকাজনক অর্থাৎ হাইতোলা বায়ু এবং ধনঞ্জয় পুষ্টিকারক বায়ু। বৈদান্তিকেরা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুতে এই নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অন্তর্ভাব করে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুই বলেন। এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু আকাশাদি পঞ্চভূতের মিলিত রজঃ অংশ হতে উৎপন্ন হয়। গমনাগমন ক্রিয়া স্বভাববশতঃ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে রজঃ অংশের কাজ বলা যায়।

শরীর তিন রকম, স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর। এই তিন প্রকার শরীর মধ্যে পাঁচটি কোষ আছে, যথা:—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ।

(১) স্থূল শরীর অন্ন রসে উৎপন্ন হয়, অন্ন রসে বৃদ্ধি পায় ও বিনষ্ট হয়ে অন্নরূপ পৃথিবীতে লয় পায় এই কারণে তাকে অন্নময় কোষ বলে।

(২) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলিত এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে প্রাণময় কোষ বলে।

(৩) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলিত মনকে মনোময় কোষ বলা যায়।

(৪) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলিত এই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা যায়। সেই বিজ্ঞানময় কোষ কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি অভিমানী ইহলোক পরলোকবাসী জীব বলে উক্ত হয়।

(৫) কারণ শরীর সুষুপ্তি কালে, আত্মা প্রচুর আনন্দ ভোগ করেন এই কারণে ঐ কারণ শরীরকে আনন্দময় কোষ বলা যায়। সন্তোষই কারণ শরীর।

জীবের কর্মের দ্বারা সঞ্চিত ও পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা নির্মিত এই স্থূল শরীর সুখ দুঃখের ভোগ স্থান হয়েছে। অনির্বচনীয় ও অনাদি যে অবিদ্যা, যা সমস্ত প্রপঞ্চের কারণ, তাকে কারণ শরীর বলা যায়। যিনি কারণ শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর হতে ভিন্ন, তিনিই আত্মা।

যে প্রকার স্ফটিক অতি নির্মল, নীলবর্ণাদি বস্ত্রের যোগে তাকে নীলবর্ণাদি বোধ হয়, সেই প্রকার আত্মা অতি নির্মল কিন্তু অন্নময় প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চ কোষ প্রভৃতির যোগে তাকে তত্তৎ কোষময় প্রভৃতি বলে বোধ হয়।

এই পঞ্চ কোষের মধ্যে জ্ঞানশক্তি বিশিষ্ট বিজ্ঞানময় কোষ কর্তা। ইচ্ছা শক্তি বিশিষ্ট মনোময় কোষ কারণ। ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট প্রাণময় কোষ কার্য। একত্রিত এই কোষত্রয়কে সূক্ষ্ম শরীর বলা যায়। যেমন বনেতে বৃক্ষের অভেদ, বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশে ভেদ নেই। জলাশয়েতে জলের ভেদ নেই, জলাগত প্রতিবিম্বিত আকাশের সঙ্গে জলাশয়গত প্রতিবিম্বিত আকাশের ভেদ নেই। এই প্রকারে সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়।

পঞ্চীকরণ ঃ—প্রত্যেক পঞ্চভূতকে সমান দুই ভাগ করবে। পরে সেই দশ ভাগের মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চভূতের প্রত্যেক প্রথম পঞ্চ

ভাগকে সমান চার অংশে বিভাগ করে সেই প্রত্যেক চার অংশ স্বকীয় দ্বিতীয় অর্দ্ধ ভাগের সঙ্গে মিশ্রিত করণ।

এই পঞ্চীকরণকালে আকাশে শব্দগুণ উৎপন্ন হয়। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ; জলেতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ; পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ উৎপন্ন হয়।

স্থূল শরীর চার প্রকার, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। মনুষ্য পশু প্রভৃতি জরায়ু হতে উৎপন্ন হয়। পক্ষী সর্পাদি অণ্ড হতে উৎপন্ন হয়। ক্লেদাদি হতে মশক, উকুন ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। ভূমি হতে বৃক্ষ লতা ইত্যাদি সকল রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

জরায়ুজ দেহ তিন প্রকার, পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক। শুক্রের ভাগ অধিক থাকলে পুরুষ হয়। শোণিতের ভাগ অধিক থাকলে নারী হয়। শুক্র শোণিত উভয়ের ভাগ সমান থাকলে নপুংসক হয়। অনন্তর ঋতুকালে পুরুষের স্ত্রী সংসর্গ হলে জীব শুক্রের সঙ্গে মাতৃ-গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। যুগ্ম দিবসে সংসর্গ হলে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তা পুরুষ, অযুগ্ম দিবসে সহবাসে যে সন্তান হয় তা নারী। ঋতু-স্নাতা নারী যার মুখাবলোকন করে সেই ঋতুকালে উৎপন্ন সন্তানের আকার তার মত হবে। অতএব তখন স্বামীর মুখাবলোকন করাই কর্তব্য। তারপর পাঁচ দিনে বুদ্বুদাকার হয়। সাত দিনে মাংস-পেশীরূপে পরিণত হয় পরে সেই পেশী একপক্ষ মধ্যেই শোণিতাপ্লুত হয়ে থাকে। পঞ্চবিংশতি দিনে অঙ্কুরাকার হয়। এক মাসে ক্রমে স্কন্ধ, গ্রীবা, মস্তক, পৃষ্ঠ এবং উদর এই পাঁচটি অঙ্গ হয়। দ্বিতীয় মাসে হস্ত-পদাদি, তৃতীয় মাসে সমুদয় অঙ্গ সন্ধি এবং চতুর্থ মাসে জীব শরীরে রক্ত সঞ্চার হয়। পঞ্চম মাসে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, নখ-শ্রেণী এবং গুহ্য উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠ মাসে গুহ্যছিদ্র, স্ত্রী-চিহ্ন, পুং-চিহ্ন কর্ণ-ছিদ্র এবং নাভি উৎপন্ন হয়। সপ্তম মাসে কেশ রোমাদি হয়। অষ্টম মাসে জীব গর্ভমধ্যে বেশ বিভক্ত অবয়ব হয়। কেবল দন্ত ও গোঁফ-দাড়ি ইত্যাদি ছাড়া সমস্ত অবয়ব গর্ভ মধ্যেই হয়। নবম মাসে সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য লাভ করে। তখন জীব জননীর ভোজন অনুসারে

গর্ভ মধ্যেই বাড়তে থাকে। তারপর গর্ভ হতে বের হয়ে মাংসপিণ্ডবৎ কোন কর্ম করতে পারে না। যতদিন সুষুম্না নাড়ী শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত থাকে, ততদিন কথা বলতে পারে না, গমন করতেও পারে না কালক্রমে বালকের সকলই হয়, ক্রমে মায়াতে মুগ্ধ হয়ে গর্ভ-যন্ত্রণা ভুলে যায়।

বাল্যাবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর। কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না। ইচ্ছামত কিছুই করা যায় না! সময়ে সময়ে বিষ্ঠা মেখেও থাকতে হয়, কোন সুখ নেই। শৈশবকাল তার তুলনায় আরও কষ্টকর। সম্পূর্ণ পরাধীন।

লেখাপড়া শেখবার সময় নানা রকম পরিশ্রম করতে হয়। সকলের কাছে ধমক ও মার খেতে হয়। যেমন কারও বশীভূত হতে ইচ্ছে হয় না তেমনি ঐ সময় সকলেই বশীভূত রাখতে চায়। কখন পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে হয়, কখন ছুরী বা কাটারীতে হাত পা কেটে কষ্ট পেতে হয়। নানা প্রকার অত্যাচার করতে ইচ্ছে হয়, সেই জন্যে খুব পীড়া ভোগও করতে হয়।

যৌবনকাল তার চেয়েও কষ্টকর। অধঃপাতে যাবার সময়। কেবলমাত্র দেহের একটু চাকচিক্য হয়। যতরকম মন্দ কাজ লোকে এই সময় করে থাকে। নানা প্রকার নেশা, বেশ্যাবৃত্তি, লোভ, চুরি, বিষয়ে আসক্তি, মারামারি, কাটাকাটি, বিবাদ, মোকর্দমা, যা কিছু মন্দ কাজ আছে সমস্ত এই সময় করে থাকে। সমুদ্র সাঁতার কেটে পার হওয়া সম্ভব কিন্তু যৌবন শান্তভাবে কাটান কোন মতেই সম্ভবপর নয়। অধিকাংশ লোকেই এমন যন্ত্রের দেহ নানা রকম অত্যাচার করে মাটি করে ফেলে। যিনি ভালভাবে কাটাতে পারেন তিনিই মহাপুরুষ। লোকে যৌবনে পদার্পণ করলেই নারীতে আসক্ত হওয়া প্রধান কাজ বলে মনে করে যতদিন না স্ত্রীসংসর্গ হয় ততদিন তার সংসার অসার, নানাপ্রকার বৃথা বৈরাগ্য, জীবনে কোন সুখ নেই বলে মনে হয়। বিবেচনা করে ছাখো রমণীতে কি আছে? পঞ্চভূত নিয়ে একটা আকার

ছাড়া আর কিছু নয়। স্তনযুগল দুটো মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। সংসর্গ করা নরক ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের শরীর মাত্রই বিষ্ঠা ও প্রস্রাবপূর্ণ একটি চামড়ার ভিস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। মনুষ্য মৎস্য, চিত্ত তার জল, বাসনা তার সূতা বঁড়শি, চিন্তা তার টোপ। সংসার-তরুণীর প্রতি আসক্ত যুবা, বিন্ধ্য শৈলের গহ্বরে করিণী-লোলুপ করীর মত আবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত শোচনীয় দশা লাভ করে। যার বাসনা আছে তারই ভোগ ও কামনা আছে। বাসনা পরিত্যাগ করলেই জগৎ পরিত্যাগ করা হয়। জগৎ পরিত্যাগ করলেই মহা সুখী হওয়া যায়।

যৌবন পূর্ণ হতে না হতে জরা এসে যৌবনকে গ্রাস করে বার্দ্ধক্য অবস্থায় নিয়ে আসে। জরা আক্রমণ করলেই লোভ বাড়ে, শ্রীহীন, তেজোহীন ও শক্তিহীন হয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়; সেই সময় আত্মীয় লোক ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করে থাকে। যত বার্দ্ধক্য বেশী হয় ততই ভাল খাবার ইচ্ছে বলবতী হয় কিন্তু কাজে তা পারে না। সেই সময় নানারকম চিন্তা উপস্থিত হয়, আগে যা কিছু অন্যায় কাজ করেছে সবই একে একে মনে উদয় হয়। আর কি করলুম, কি হবে, কি করা উচিত, পরকালেই বা কি হবে, এই প্রকার ভেবে অত্যন্ত ভীত হয় ও শেষে চুপ করে থাকাই স্থির করে। কারণ এই অবস্থায় নিরুৎসাহ এবং কাতরতা উপস্থিত হয়। বল শক্তিহীন, আহারেও অশক্ত হয়ে দুঃখে হৃদয় দগ্ধ হতে থাকে। শরীরে জরা উপস্থিত হলে মৃত্যু তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। শ্বাস, কাশ, মূর্চ্ছা, বাত, ভেদ, আমাশয় ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাধির যাতনায় চীৎকার করে কাঁদতে থাকে। চোখের জলে বুক ভেসে যায়। যে দেহের এত যত্ন, এত আদর, এত ভালবাসা, আজ সেই দেহ মৃত্যুমুখে পতিত। আত্মীয়স্বজন স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, সম্পত্তি সবই পরিত্যাগ করে কোথায় যেতে হবে ভেবে কেঁদে আকুল হয়।

দেহের অল্পেই আনন্দ এবং অল্পেই দুঃখ হয়ে থাকে। অতএব দেহের মত নীচ, শোচনীয় এবং গুণহীন আর কিছুই নেই। দেহের

সম্বন্ধ আমাতে নেই। আমার সম্বন্ধও দেহেতে নেই। এই দেহ ও আমি এক নয়। যিনি সৎপথ অবলম্বন করে ঈশ্বর সেবায় রত থেকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন তিনি শেষে ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হন, আর যিনি বিষয় বাসনায় ও ভোগবিলাসে মজে যান তাঁর এ জন্মটা বিফলে যায়। ঈদৃশ সংসারেও যাদের অসার সুখ ভাবনা, কালে তাদেরকেও ছেদন করে থাকে। জগতে উৎপন্ন এমন কোন্ বস্তু নেই যা কালের কবাল গ্রাসে পতিত না হয়।

ভগবান সৃষ্টির জন্যে নিজের রূপকে স্বেচ্ছাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষ এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। শিব প্রধান পুরুষ, শিবা পরমা শক্তি; তত্ত্বদর্শী যোগিগণ তাঁকে শিব শক্তি উভয়াত্মক পরাৎপর পরম ব্রহ্ম বলে কীর্তন করেন। তিনিই ব্রহ্মারূপে এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনিই বিষ্ণুরূপে এই সমস্ত জগৎ পালন করেন, আবার তিনিই অন্তকালে শিবরূপে সমস্ত জগৎ সংহার করেন।

এই চার রকম স্থুল শরীর স্থুল ভোগের হেতু জাগ্রত বলা যায়। জাগ্রতকালে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমেতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এই পঞ্চ বাহ্য বিষয় সকল অনুভূত হয়।

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রমেতে বচন, গ্রহণ, গমন, ত্যাগ ও আনন্দ এই পঞ্চ বাহ্য বিষয়ের অনুভব হয়।

মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত এই চার অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমে সংশয়, নিশ্চয়, অহংকার, চৈত্ত এইসব বিষয় অনুভূত হয়।

তারপর জীব শরীরে জীবন বা প্রাণ অর্থাৎ জীবাত্মা, আত্মা পরমাত্মা, বা চৈতন্য এই সমস্তই এক চৈতন্য বলে জানবে। যেমন গাছ বনছাড়া নয়, জল জলাশয় ছাড়া নয়, দগ্ধ লৌহখণ্ড আগুন ছাড়া নয়।

জীব চৈতন্যেতে নানারকম মতাবলম্বী ব্যক্তিরা নানাপ্রকার মত

প্রকাশ করে থাকেন। অতি অজ্ঞানী ব্যক্তিরা পুত্রকে আত্মা বলেন ; কেউ স্থূল শরীরকে আত্মা বলেন। কেউ কেউ বলেন ইন্দ্রিয়গণই আত্মা, কেউ প্রাণকে আত্মা বলে। কেউ মনকে আত্মা বলেন। কেউ বুদ্ধিকে আত্মা বলেন। কেউ অজ্ঞানকে আত্মা বলেন। কেউ চৈতন্যকে বলেন আত্মা। অনেকে শূন্যকেও আত্মা বলে থাকেন। এভাবে অতি অজ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা পুত্র হতে আরম্ভ করে শূন্য পর্যন্ত আত্মার ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। বাস্তবিক পুত্র, স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি, অজ্ঞান বা শূন্য কখনই আত্মা হতে পারে না। কেবল সত্যস্বরূপ চৈতন্যই মাত্র আত্মা। ঐসকল যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হলে পরে ভ্রম নাশ হলে, সর্প জ্ঞানের উচ্ছেদ হয়ে কেবল বস্তুমাত্র থাকে তেমনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তুতে, অবস্থারূপ অজ্ঞানাদি জড় বস্তুর ভ্রম, তার নাশ হলে পরে ব্রহ্মমাত্রেই অবস্থিতি হয়।

তত্ত্বমসী অর্থাৎ তৎ, ত্বং, অসি। তৎ পদের অর্থ অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য, ত্বং, পদের অর্থ প্রত্যক্ষ চৈতন্য, এই উভয় পদের অর্থ শোধনকরতঃ তৎ, তং, অসি, এই বাক্য দ্বারা অখণ্ড চৈতন্য জানতে পারলে আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বরূপ, পরমানন্দ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এরূপ অন্তঃকরণে উদয় হয়। সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিকে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হলে তৎ প্রকাশে অভিন্ন পরব্রহ্ম বিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট হয়, যেমন প্রদীপের প্রভা সূর্য—প্রভাকে প্রকাশ করতে অক্ষম। মনোবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয়, কিন্তু প্রতিবিম্বিত চৈতন্য তাকে প্রকাশ করতে পারে না। যেহেতু পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ স্বরূপ, অতএব তাঁর অন্য কর্তৃক প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। সর্বব্যাপী, প্রকাশস্বরূপ জন্মরহিত, বিনাশ-রহিত, অলিপ্ত, সর্বগত, সর্বদা বিমুক্ত স্বভাব তাই অদ্বিতীয় চৈতন্য।

মায়াময় অচেতন সত্ত্বঃ, রজঃ, এবং তমঃ গুণ ও ইন্দ্রিয়গণ এরা সমস্ত কর্ম করে। ঐ গুণত্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা আত্মা সচেতন হয়েও কিছুমাত্র করেন না। যে প্রকার লৌহই অচেতন

হয়েও চুম্বক পাথরের নিকটস্থ হলে গমন করে সেইরূপ দেহ-মধ্যে সকল অচেতন হয়েও চৈতন্যের অধিষ্ঠানে নিজের নিজের কর্ম করে। যে প্রকার সূর্যের প্রকাশে লোক সকল কাজ করে, কিন্তু সূর্য নিজে কোন কাজ করেন না, এবং কাউকেও কাজে নিয়োগ করেন না, আত্মাও ঠিক সেই প্রকার জানবে।

আত্মা স্বভাবত নির্মল ও সর্বব্যাপী হয়েও সদাসৎ কর্ম সকলের আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা এরূপ জ্ঞান করেন। যে প্রকার স্ফটিক স্বভাবত নির্মল হয়েও নানারকম বর্ণের কাছে নানা রকম বর্ণ ধারণ করে তেমনি আত্মা সর্বব্যাপী ও স্বভাবত নির্মল হয়ে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও শরীরাদি স্বভাব ধারণ করে।

যে প্রকার বাষ্পজালে জল ভ্রান্তি, শুক্তিকাতে রৌপ্য ভ্রান্তি, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, দৃষ্টিদোষে দিক্‌ভ্রান্তি এবং দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য দ্বারা এক চন্দ্র দুই চন্দ্র দেখায়, সেই প্রকার সমস্ত এই জগৎও ভ্রান্তি মাত্র হয়। ধর্ম, অধর্ম, সুখ, দুঃখ, কল্পনা, স্বর্গ ও নরকবাস, জন্ম, মরণ, বর্ণ এবং আশ্রম এই সকল সংসার অবস্থায় হয়। পরমাত্মায় এসব নেই। যে প্রকার এক সূর্য সমস্ত জলাশয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেখায় সেই প্রকার এক আত্মা সমস্ত উপাধিতে অর্থাৎ মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও শরীরাদিতে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হন।

যে প্রকার জলে পতিত সূর্যবিম্ব, জল গমন করলে গমন করে, জল স্থির থাকলে স্থির থাকে, ইহা সেই প্রকার। অন্তঃকরণ গমন করলে আত্মা গমন করেন আর অন্তঃকরণ স্থির থাকলে আত্মা স্থির থাকেন। যে প্রকার রাহু অদৃশ্য হয়ে চন্দ্র বিম্বে প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার সর্বব্যাপী আত্মা অদৃশ্য হয়েও জীবের বুদ্ধিতে দৃশ্য হন। যে প্রকার নির্মল দর্পণে মনুষ্য নিজের রূপ দর্শন করে; সেই প্রকার নির্মল বুদ্ধিতে আত্মা আত্মস্বরূপ দর্শন করেন।

পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধি, মন এবং অহঙ্কার এরা মায়া-বশতঃ সংসারের সৃষ্টি ও রক্ষা করণে সমর্থ এই জন্য এরা ত্যাজ্য কারণ এরা কেবল বন্ধনের কারণ। যে প্রকার আকাশ ঘটাদি বস্তুর অন্তরে ও বাইরে স্থিতি করে সেই প্রকার পরমাত্মা সমস্ত বস্তুর অন্তরে ও বাইরে স্থিতি করেন, অতএব তাঁর বন্ধন কি মোক্ষ অসম্ভব, কিন্তু দেহ এবং আমি এই প্রকার জ্ঞানই বন্ধনের কারণ। যে প্রকার গুড়, শর্করা ও রস এক ইক্ষুরই বিকার মাত্র, সেইপ্রকার এক আত্মাতেই নানা রকম অবস্থা হয়।

পরমাত্মা প্রাণ প্রভৃতি অসংখ্য অবস্থাভেদে আপনাকে জালের মত কখন বিস্তার কখন বা সংহার করে নিজের ঐশ্বর্য দ্বারা যেন ক্রীড়া করছেন। প্রথম জাগ্রত অবস্থায় বিশ্ব, দ্বিতীয় স্বপ্না-বস্থাপন্ন তৈজস, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীর উপাধি বিশিষ্ট যে চৈতন্য এবং তৃতীয় সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন প্রাজ্ঞ অর্থাৎ স্থান উপাধি বিশিষ্ট সুষুপ্তি অবস্থায় যে চৈতন্য এই তিন প্রকার ভ্রান্ত চৈতন্য দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্য আচ্ছাদিত হয়ে আছেন। এইরূপ জ্ঞানের স্বয়ং আত্মাই বুদ্ধিস্থ পুরুষ অর্থাৎ আত্মা বলে উপলব্ধি করেন।

যে প্রকার অগ্নি হতে ধূমের ঊর্দ্ধগতির দ্বারা আকাশে নানারকম আকৃতি প্রকাশ পায় সেই প্রকার সর্বব্যাপী পুরুষের নিজের মায়াতে সৃষ্টিরূপ দ্বৈত বিস্তার প্রকাশ পায়। মন শান্ত হলে যেন আত্মা শান্ত, মন প্রফুল্ল হলে যেন আত্মা প্রফুল্ল এবং মন মুগ্ধ হলে যেন আত্মা মুগ্ধ হন। আত্মার এসকল ভাব সংসার অবস্থায় ব্যবহারিক মাত্র, বাস্তবিক তা সত্য নয়। যে প্রকার মেঘজনক ধূমের ঊর্দ্ধগতিতে গগনতল মলিন হয় না সেই প্রকার আত্মা প্রকৃতি বিকারে লিপ্ত হন না। যে প্রকার ধূমাদির মালিন্য দ্বারা এক ঘট মলিন হলে অন্য ঘট সকল মলিন হয় না, সেই প্রকার এক দেহস্থ জীব মলিন হলে অপর দেহস্থ জীব মলিন হয় না।

এক ব্যক্তির দোষগুণে অন্য ব্যক্তি যে লিপ্ত হয় না এখানে এ

আশঙ্কা হতে পারে. আত্মা একই, দুই নন। তিনিই সকল দেহে. আছেন, কেবল উপাধি গুণের সংসর্গে তাঁরই জীব সংজ্ঞা হয়েছে. তবে এক ব্যক্তির দোষগুণে অন্য ব্যক্তি লিপ্ত হয় না কেন? আগে বলা হয়েছে আত্মা এক বটে কিন্তু আকাশের মত নির্মল ও উপাধি-গুণে কখনো লিপ্ত হন না এবং বন্ধন কি মুক্তি তার কখনই নেই। এক আত্মার অধিষ্ঠান সকল জীবে থাকাতে যে আত্মাকে জীব ও সকল জীবকে এক বলে বিবেচনা করা এ নিতান্ত অসঙ্গত। অতএব ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ভাবাপন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম দ্বারা শুভাশুভ ফল ভোগ ভিন্ন ভিন্ন জীবেরই অবশ্য হবে, আত্মার সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই, সুতরাং এক ব্যক্তির দোষগুণে যে অন্য ব্যক্তি লিপ্ত হয় না এ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত।

জীবের কর্মানুসারে আত্মকৃত ফল, সুখ, দুঃখ, স্বর্গ বা নরক তার এই জগতেই ভোগ হয়ে থাকে। নরক ও স্বর্গ আলাদা জায়গা নয়। তার প্রমাণ আবশ্যক করে না। কারণ জীবের অসংখ্য প্রকার কষ্ট-পীড়া সুখ দুঃখ ভোগ হচ্ছে তা সকলেই দেখেছেন। স্বর্গ বা নরক অন্য জায়গায় হলে সুখ দুঃখ ইহজীবনে ভোগ করতে হতো না এবং পরকাল অর্থাৎ পরজন্মও থাকতো না। জীবন্মুক্ত আত্মার কোনও কষ্ট ভোগ নেই।

মনোবৃত্তির সঙ্গে মানবের অবয়বের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বৃত্তি ও স্বভাব অনুসারে মানবের অবয়বের তারতম্য হয়ে থাকে। যার অতি ক্রুদ্ধ স্বভাব তার অবয়ব হতে শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবের অবয়বে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা মানবের বাহ্য দৃশ্য দর্শন করে তার স্বাভাবিক ভাব অবধারণ করতে পারেন। গুণ-সকল নিজের নিজের ভোগের জন্যে দেহে ও ইন্দ্রিয় সকলে নিয়ত এরা কাজ করে। আমি কর্তা নই, কোন বস্তু আমার নয় এরূপ জ্ঞান হলে জীব কর্মে বদ্ধ হয় না।

পরমাত্মা এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিশ্বের পিতা। আত্মা সেই পরীক্ষা ক্ষেত্রে ভোগে আবদ্ধ। তাঁকে জানালেই বন্ধন মোচন হয়। সংসার

বন্ধন আত্মার নেই। পরমাত্মাকে অনুসরণ করাই মোক্ষ লাভের সেতু। আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। চিরকাল ব্রহ্ম সত্বাতে আশ্রয় করে আছেন ও থাকবেন।

যখন জীবাত্মা উপাধিযুক্ত তখন তিনি জীবাত্মা পরমাত্মা হতে স্বতন্ত্র এবং যখন উপাধিযুক্ত নন তখন একত্র। এই জগতের প্রত্যেক জীবাত্মা পরমাত্মার অংশরূপে বিরাজমান। আত্মা শুদ্ধ নির্গুণ এবং নির্মল, প্রকৃতিকে আশ্রয় করলে তিনি অশুদ্ধ সগুণ ও সমল। যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন তত-ক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ ভোগ করতে হয়। আত্মা যত-ক্ষণ পর্যন্ত দেহ অধিকার করে থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে সংসারে সুখ দুঃখ ভোগ করতে হয়, আর যখন তিনি দেহ ত্যাগ করেন, তখন আর তার সুখ-দুঃখ জ্ঞান থাকে না।

বালক শিশুরে যেমন উলঙ্গ থাকে জগতের যখন বাল্য অবস্থা ছিল তখনকার জগৎবাসীরাও উলঙ্গ থাকতো। বালকের যেমন লজ্জা নেই তখনকার লোকদিগেরও সেই প্রকার লজ্জাজ্ঞান ছিল না।

সাধুগণকে পরিত্রাণ করবার জন্যে পাপাত্মাগণকে সংহার করবার জন্যে এবং ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্যে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে সাধুহৃদয়ে অবস্থান করে জীবের আদর্শ দেখান। কোন শাস্ত্র পাঠ করলে ঈশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না কিন্তু ভক্তিভাবে মনোযোগ-পূর্বক এই বিষয়গুলি পাঠ করলে পুণ্যবান ব্যক্তি মাত্রেই ঈশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম ও হৃদয়ে অবরুদ্ধ করতে পাবেন।

প্রজ্বলিত অগ্নি হতে যেমন হাজার হাজার স্ফুলিঙ্গ সমুৎপন্ন হয় তেমনি সেই অব্যয় পরমাত্মা হতে বিবিধ জীবাত্মার সৃষ্টি হয় ও পরিণামে তাতেই লীন হয়। সেই পরমাত্মা হতে উৎপন্ন হয়ে অন্তে সেই পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয় সুতরাং ইহা স্থির যে আত্মা ও জীবাত্মা এক পরমাত্মা হতে সমুৎপন্ন হয়। আত্মা ও জীবাত্মা এবং পরমাত্মা সর্বদা সংযুক্ত হয়েই আছেন ইহা জ্ঞানী মাত্রেই বেশ বুঝতে পারবেন।

তৈলঙ্গস্বামী এবার সংসার প্রসঙ্গে বলতে আরম্ভ করলেন।

তিনি বললেন, সংসার কাকে বলে? সকলেই জানেন, আপনি নিজে ও স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন নিয়েই সংসার। আর কিছু অর্থ উপার্জন দ্বারা কিছু বিষয়াদি করে এদেরকে লালন-পালন করাই সংসারের প্রধান কাজ। ছোট বড় সমস্ত লোকই সারা জীবন এতেই মোহিত হয়ে রয়েছেন, মায়াতে মুগ্ধ হয়ে কে পিতা, কে মাতা, কে ভ্রাতা, কে আত্মীয়, কোথা হতে এসেছি, কোথায় এসেছি, কি জন্যে এসেছি, কেনই বা দেহ ধারণ করেছি, কে আনলো, কে আমাকে কোন কাজ সমাধা করবার জন্যে এখানে পাঠিয়েছেন কিছুই না ভেবে আত্মবিস্মৃত হয়ে রয়েছেন। কখন ধনী, কখন মানী, কখন জ্ঞানী মনে করে উন্মত্ত ও উল্লাসযুক্ত হচ্ছেন; কখন শোক, কখন তাপ, কখন রোগ, কখন নিন্দা, কখন অর্থচিন্তায় ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। কখন শূদ্র, কখন বৈশ্য, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বা ব্রাহ্মণ বর্ণে আপনাকে বরণ করছেন। কখন ভোগী, কখন যোগী, কখন ত্যাগী মনে করে আপনাকে নানা অবস্থার অধীন করছেন। কখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পরপীড়নে উত্তেজিত হচ্ছেন। কখন মোহে অন্ধ হয়ে জগৎকে তৃণবৎ তুচ্ছ ভাবছেন।

মানব, তুমি একবার ভেবে দেখ তোমার অহংকার করবার কি আছে? যাঁর সামনে পৃথিবী একটি ধূলিকণা, সূর্যমণ্ডল একটি ক্ষুদ্র বর্তুল, মহাসমুদ্র গোষ্পদতুল্য সেখানে কি তোমার ক্ষুদ্র দেহ, ক্ষুদ্র প্রাণ গণনীয় হতে পারে। তুমি ধূলিকণার একটি সূক্ষ্ম পরমাণুর সামান্য অংশ মাত্র। সেখানে আবার তোমার অহংকার কিসের? সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ এই তিন স্থুল আবরণে নেত্র আচ্ছাদন করেছ। সূক্ষ্ম রূপ পরিহার করে স্থুল দেহ ধারণ করেছ। এখন আর আপনাকে আপনি চিনতে পারছ না। এখনও সময় অতীত হয় নি। এই বেলা আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করে চিনে নাও তুমি কে এবং কি জন্যে এখানে এসেছ।

সকল মানুষকেই 'আমার' এই কথাটিতে মুগ্ধ করে রেখেছে। তোমার শিশু অতি রূপবান হলেও আমার চিত্ত সহসা তত আনন্দিত

হয় না যত আমার পুত্র কদাকার হলেও তাকে বাব বার দেখেও নয়নের তৃপ্তি হয় না। যে কাজ তোমার জন্যে আমাকে করতে হবে তা সামান্য হলেও অতি শ্রমসাধ্য ও ক্লেশকর বলে বোধহয় কিন্তু তার চেয়ে শত গুণ কষ্টকর কাজ যদি 'আমার' এরূপ বোধ হয় প্রাণপণে তা সমাধা করলেও বিশেষ ক্লেশ বোধ হয় না। কোন দ্রব্য তোমার অধিকাবে থাকলে যদি তার অপচয় হয় তবে তার জন্যে কিছু মাত্র দুঃখ হয় না কিন্তু যখন সেই দ্রব্য আমার বলবার অধিকার পাই তখন যত্ন ও আদরের সীমা থাকে না। আজ যা তোমার বলে নিন্দা করে থাকি পরদিন তাই যদি আমার হয় তবে মুখে আর প্রশংসা ধরে না। এই মায়ারাক্ষস 'আমার' শব্দটিব কুহকজালে কীট হতে ব্রহ্মা পর্যন্ত মোহিত হয়ে রয়েছে। আমি যাকে আমার বলি সে আমার হলো না, আমি যে বস্তুকে আমার বোধে যত্ন করি, কালের বশে তা কার হবে তা কারও বলার সাধ্য নেই।

আমার বুদ্ধিই আমার সর্বনাশ করলো। বাস্তবিক কি তবে আমাব কেউ নেই, এখন জানলুম আমার বলতে যিনি আছেন আমি তাঁর হতে চাই না বলে তিনি আমার নন। শাস্ত্রে বলে সকলই তাঁর। আমি ভাবি এ সকল আমার। এই সামান্য ধন, পুত্র, সুখ, দুঃখ, বিষয়, সম্পত্তি আমার বলতে এত আহ্লাদ হয় যদি একবার সরল চিত্তে, ভক্তিভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর তাঁকে আমার বলতে পারি, না জানি তা হলে কি অপূর্ব আনন্দ হয়।

মানব, তুমি বিদ্বান হবার জন্যে কত পুস্তক পাঠ করছো। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, গণিত, নানা প্রকার শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করছো। কিন্তু যে পুস্তক পাঠ করলে তুমি প্রকৃত পণ্ডিত হতে পার সে পুস্তক পড়লে না, পড়বার ইচ্ছেও নেই। তুমি অন্য লোকের ভাবা, অন্য লোকের ইতিহাস ও জীবনী পাঠ করছো কিন্তু নিজের কি আছে বা নেই তা একবার দেখলে না, দেখবার চেষ্টাও নেই। মানুষ মাত্রেই এক একখানি গ্রন্থ বিশেষ। আপনি আপনাকে পাঠ করলে জীবনের সমস্ত বিষয় জানা যায়। নিজের শরীরের

চর্ম, অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু, শিরা, রস, রক্ত ইত্যাদি গঠন, পরিণাম, গতিবিধি যদি ভাল করে বুঝতে পার তবে দেখতে পাবে ভগবান তোমার শরীরকে সুচারুরূপে নির্মাণ করেছেন। কেমন সুরে তালে মিলিয়ে শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়াগুলি স্পন্দিত হচ্ছে, কেমন পঞ্চ তত্ত্বে পঞ্চ তন্মাত্র গা ঢেলে নৃত্য করছে, কেমন ইন্দ্রিয়গুলি যথানিয়মে ক্রীড়া করছে। এদের একটি বৃত্তির কাজ যদি কখন গোলমাল হয় তবে শরীরে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। গুরুর সাহায্যে যদি তোমার জীবনগ্রন্থ ভাল করে পাঠ করতে ও রচনা করতে পার তাহলে তোমার ও অপর লোকের বিশেষ উপকার হবে।

(এক একটি মানুষ এক একখানি পুস্তক বিশেষ। গর্ভবাস এই পুস্তকের মলাট, কর্মফল এর সূচীপত্র, দীক্ষা গ্রহণ এর বিজ্ঞান, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য এর এক একটি পরিচ্ছেদ, জীবনের ভালমন্দ কাজ এর পাঠ্য বিষয়। যারা দরিদ্র ও সামান্য বস্ত্রাদি পরে থাকে তারা শাদা মলাট মোড়া সামান্য পুস্তক, যাঁরা বড় লোক, জমীদার, রাজা বা মহারাজা তাঁরা ভাল বাঁধাই করা সোনার জলে কাজ করা মলাট মোড়া একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। যাঁরা অল্পদিন জীবিত থেকে বিশেষ কোন কাজ না করেই দেহত্যাগ করেন তাঁরা ছোট ছোট পুস্তক, যাঁরা দীর্ঘজীবী হয়ে মহৎ কর্মরাশি অনুষ্ঠান করে যান তাঁরাই বৃহৎ গ্রন্থ আর জগতের সকল লোকের আদর্শ ও পাঠের উপযুক্ত।)

যাঁরা অন্যের জীবন ভাল করে গঠন করবার উপদেশ দিয়ে থাকেন অথচ নিজে কিছু করেন না, তাঁরা ব্যাকরণ। যাঁরা রাজা মহারাজা ইত্যাদি বড় বড় লোকের গল্প করে সভা ও সমাজ গরম করে রাখেন, তাঁরা ইতিহাস। যাঁরা জগতের লৌকিক লাভলোকসান বিচার করতে করতে দিন কাটিয়ে থাকেন, তাঁরা গণিত শাস্ত্র। যাঁরা জড় জগতের বিষয় চিন্তা করাই পুরুষার্থ মনে করেন তাঁরা ভূগোল। যাঁরা কেবল রঙ্গরস, আমোদপ্রমোদ, বিলাসই জীবনের

সার করেছেন তাঁরা নাটক। যাঁরা পরোপকার, সত্য, দয়া, নিষ্ঠা, বেদাধ্যয়ন, ধর্মচর্চা ইত্যাদির দ্বারা কাল যাপন করেন তাঁরা ধর্মশাস্ত্র। যাঁরা বৈষয়িক ব্যাপার হতে স্বতন্ত্র থেকে ভক্তিপূর্বক ভগবানের আরাধনা করাই জীবনের প্রধান কাজ মনে করেন, তাঁরা যোগশাস্ত্র. এই প্রকার মানুষ মাত্রেই প্রত্যেকে এক একখানি গ্রন্থ। যাতে আপনার জীবনগ্রন্থ পরিপাটিরূপে লিখিত হয়, যাতে তুমি সকলের পাঠ্য হও, তোমার মৃত্যু হলেও তোমার জীবনচরিত অন্য জীবনে পুনঃ মুদ্রিত হয় তুমি সেইরূপে আপনার জীবনগ্রন্থ রচনা করবে। সমস্ত পুস্তকের শেষে সমাপ্ত অর্থাৎ মৃত্যু লেখা থাকে, এই কথাটি যেন সর্বদা স্মরণ থাকে।

মানুষ মাত্রেরই ভেবে দেখা উচিত কোথায় ছিলুম, কোথায় বা এলুম, কি জন্যেই বা এলুম, এসেই বা তার কি করলুম? এখানে আমাকে কে আনলেন, কেনই বা আনলেন, কিরূপেই বা আনলেন, যে জন্যে এনেছেন তার বা কি করছি? এখানে এসে কত কি দেখলুম, কত কি শুনলুম, কত কি বললুম, কত কি ভাবলুম, দেখে শুনে ভেবেচিন্তে কিছুই ত ঠিক করতে পারলুম না। এখানে পিতামাতা পেলুম, স্ত্রীপুত্র পেলুম, বন্ধু-বান্ধব পেলুম, ধনজন পেলুম, সুখসম্পদ পেলুম, সমস্তই পেলুম কিন্তু তৃপ্তি কিছুতেই পেলুম না। অনেক ভাষা শিখলুম অনেক দেশ বেড়ালুম, অনেক বস্তু দেখলুম, অনেক লোকের সঙ্গে বাস করলুম কিন্তু প্রকৃত সুখ কিছুতেই পেলুম না। মন ও বুদ্ধির প্রণয় হলো না, সর্বদাই তুমুল সংগ্রাম করছে, প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির বিবাদ লেগেই আছে। সংসার সাগরে প্রলয় তুফান দিবারাত্রি হচ্ছে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই সম্প্রদায় নিয়ে মতভেদ। সকলেই আপনার মত বহাল করতে ব্যস্ত। কেউ বলছে, কেউ শুনছে, কেউ বোঝাচ্ছে কেউ চুপ করে তামাসা দেখছে, কেউ আন্দোলন করছে, কেউ শাসন করছে, কেউ পালন করছে, কেউ সিংহাসনে, কেউ বা ধরাসনে বসে আছে, কেউ কাঁদছে কেউ হাঁসছে কেউ বা অবাক

হয়ে বসে আছে। সংসারে সকলেই ঘুরছে আর চিৎকার করছে, সকলেই গোলমাল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, এইসব দেখেশুনে কেবল মাত্র চিন্তাই বাড়ছে, কিন্তু সুখ কিছুতেই পেলুম না। যেন একটা কোন আসল বস্তুর অভাবে এত কষ্ট ও এত যন্ত্রণা দিবারাত্রি ভোগ করতে হচ্ছে।

যিনি ভগবৎ চিন্তায় গভীর সমুদ্রে মগ্ন হচ্ছেন, তিনিই পরম সুখী, তাঁরই কেবল অন্য ভাবনা চিন্তা কিছুই থাকে না। গুরু যাঁকে চেনবার জন্যে উপদেশ দান করেন, যিনি অন্তরে বাইরে পেছনে ও সামনে থাকতেও কেউ ধরতে পারছে না অথচ তিনি সমস্ত ধারণ করে আছেন। আমি কে তার পরিচয় পেলুম না, আমার কে তা বুঝলুম না, তুমি, আমি, তিনি আদি শব্দে কাকে নির্দেশ করি, তারও তত্ত্ব জানলুম না। যাঁর সংসার, যাঁর সর্বস্ব, যাঁর আমি তাঁকে সমস্ত সমর্পণ না করে আমি কর্তা হয়ে বসলুম। যাঁর নাম করলে আনন্দ হয়, যাঁকে ভাবলে ভয় ভাবনা দূরে যায়, যাঁকে স্মরণ করলে বিপদ সম্পদ সমান হয়, যাঁর চরণে আশ্রয় নিলে জন্ম মরণ জীবকে স্পর্শও করতে পারে না, তাঁকে জানবার চেষ্টা করলুম না, তবে মানব জন্ম পেয়ে করলুম কি?

আমি জন্মাবধি সংসার সুখে আসক্ত, কেননা সংসার ছাড়া আর কোন সুখের সামগ্রী আমি কখন দেখি নি। এই সুখের সংসার পরিত্যাগ করতে হবে, এই নিদারুণ কথা স্মরণ করলেই চিন্তাসাগরে মগ্ন হতে হয়। আমি সংসারের দাস হয়ে, সংসারের অনুগত হয়ে, আপনার জীবনকে সুখী মনে করি, আমার প্রাণ অপেক্ষাও সংসারকে ভালবাসি। যখন মনে করি যে এই গৃহ, অট্টালিকা, বাগান পুষ্করিণী, বিষয় সম্পত্তির আমিই একমাত্র অধিপতি, তখন আমার হৃদয়ে আত্মগৌরব আর ধরে না। যখন দেখি আমার রূপবতী যুবতী ভার্য্যা, আমার পুত্র, আমার ভৃত্য সকলেই বিনীতভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, যখন দেখি নানা প্রকার যান আমার জন্যে সুসজ্জিত, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকে না। যখন আমার

সুখ্যাতি ঘোষিত হলো, রাজদ্বারে সম্মান হলো, শত শত লোকের মুখে আমার প্রশংসা শুনতে লাগলুম, তখন আহ্লাদে মগ্ন হয়ে যাই। সংসারের মোহনিদ্রায় এই প্রকারে ডুবে থাকি।

যখন মানুষের বয়স বেশী হয়, তখন আত্মজ্ঞান হতে থাকে, যখন মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়, তখন বিষয় সুখের কোমল শয্যা আর ভাল লাগে না। সুখময় সংসার যেন বিষময় বোধ হয়। ভোগ-বিলাস বিকট বেশে যেন দংশন করতে থাকে। চিরদিনের আনন্দভূমি তখন নিরানন্দ বোধ হয়। বাসভবন কারাগার তুল্য বোধ হয়। স্ত্রী, পুত্র বিষয়, সম্পদ তাবৎ সামগ্রী একত্র সমবেত হয়ে যেন বন্ধন শৃঙ্খল রচনা করেছে বলে বোধ হয়। তখন মনে মনে বলতে থাকে— সংসার! আর তোমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাবো না। যে দেশে সন্ধ্যে নেই, শর্ব্বরী নেই, নিদ্রা নেই, স্বপ্ন নেই, শোক নেই, দুঃখ নেই আমি সেই দেশে গিয়ে সেই দেশের লোকের সঙ্গে থাকবো। যাঁর মধুর স্বর, অসীম দয়া, অতুলনীয় স্নেহ, আমি তাঁরই শরণাপন্ন হবো। তখন সমস্ত জীবনে যা যা অন্যায় কাজ করেছ সবই মনে উদয় হয় আর আক্ষেপ করে মনে মনে বলতে থাকে,—দয়াময় হরি। শুনতে পাই তুমি নাকি দয়া করে ভক্তের প্রতি তার সহায় হও, তুমি সাধুদের সর্বস্ব ধন, তোমার মহিমা অপার। দীনবন্ধো! যে তোমার আশ্রয় নেয়, তুমি তাকে দয়া করে থাকো। হে অনাথের নাথ! তুমি দয়া করে দেখা না দিলে কেউ তোমাকে দেখতে পায় না। আমি মহাপাপী, আমাকে অভয় পদে স্থান দাও। কোন পথ অবলম্বন করলে তোমাব দর্শন পাবো তা আমাকে বলে দাও, তোমার আদি অন্ত বোধগম্য হওয়া আমার সাধ্য নয়, দয়া করে আমার আশা পূর্ণ করো।

'আপনাকে' না জেনে না চিনে তুমি কার সুখের জন্যে ধর্মে সাধন কববে? কার বন্ধন মোচনের জন্যে জ্ঞান উপার্জন করবে? প্রথমে তত্ত্ব নিরূপণ করে ছাখো, তোমার দুঃখ বা বন্ধন আছে কিনা। একবার জাগ্রত হয়ে ছাখো, তুমি কোথায়, ও কোন অবস্থায় আছ?

সর্বত্রই আত্মসত্তা বর্তমান, সুযোগ সহযোগে যখন আত্মময় জগৎ দেখবে, তখন প্রত্যক্ষ করতে ও দেখতে পাবে তুমি কে ও কোথা হতে এসেছ। তখন আর সংশয় ও ভেদ জ্ঞান থাকবে না।

সকলেই গুরুর পদে মন-প্রাণ সমর্পণ করে একবাক্যে বলুন, গুরুদেব! অবোধ শিষ্যের প্রতি কৃপা বিতরণ করুন, আপনি আমার গতি, আপনি আমার মুক্তি, আত্মমন্ত্রে যাঁর ইঙ্গিত করেছেন আশীর্বাদ করুন যেন তাঁর পূর্ণ সত্তায় নিজ সত্তা বিসর্জন দিতে পারি। যদি তাই না পারলুম তবে মানব জীবন পেয়ে এবং আপনার অভয় পদে শরণাপন্ন হয়ে কি করলুম!

সংসারে সকলেই অর্থ চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। সংসারে যত কিছু অনর্থ, যত কিছু অনিষ্ট, যত কিছু দুর্ঘটনা সকলের মূল এই অর্থ। অর্থহীন হলে যত অনিষ্ট, অর্থশালী হলেও তত অনিষ্ট। অর্থ থাকলে জগৎ যত ক্ষতিগ্রস্থ, অর্থ না থাকলেও জগৎ তত ক্ষতিগ্রস্থ। অর্থই চিন্তার সহোদর। তুমি ধনবান। তোমার সীমা নেই। আমার ধন আছে তা রক্ষার জন্যে, তাব বৃদ্ধির জন্যে তুমি সর্বদাই ভাবিত হচ্ছ। আমার ধন নেই। আমি কি প্রকারে ধনবান হবো। কোন উপায় অবলম্বন করলে অর্থ উপার্জ্জন হবে সেই চিন্তায় দেহ জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমার চিন্তা পাছে তুমি নির্ধন হও, আমার চিন্তা আমি কিসে ধনবান হই। এর সংযোগও অসহ্য এর বিয়োগও অসহ্য। ইহা হতে দূরে থাকলেও নিস্তার পাবার সম্ভাবনা নেই। অর্থের লীলাভূমি অদৃষ্ট। যার যেমন অদৃষ্ট অর্থ তার প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করে থাকে। ঈশ্বরই এই অদৃষ্ট লিপির লেখক। তিনিই জীবের সুকৃতি অনুসারে এবং পূর্ব জন্মের ফল অনুযায়ী তার অদৃষ্টে কর্মফল লিপিবদ্ধ করেন। অর্থ তার লিখিত অংশ কাজে পরিণত করে আর কর্মফল প্রদান করে। অর্থ চিরকালই চঞ্চল। কখনো এক স্থানে তার স্থান হয় না। তার অগম্য স্থান নেই। লজ্জারও লেশ নেই। সেই জন্যে ধোপা বা চণ্ডালকেও আলিঙ্গন করে থাকে। অর্থের হৃদয় নেই। একের

সর্বনাশ করে অন্যকে সুখী করছে। আবার তার সর্বনাশ করে অপরের বাসনা পূর্ণ করছে।

এই সামান্য অর্থ ছাড়া আর এক অর্থ আছে যার তুলনা নেই। যে অর্থ পেলে আর কোন অর্থ প্রয়োজন হয় না, সেই অর্থই পরমার্থ। মোক্ষপদ পাবার জন্যে সাধুগণ সংসারের অর্থ ত্যাগ করে পরমার্থ প্রাপ্তির জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। এই পরমার্থই সংসারের সার বস্তু। এ অবিনশ্বর। এর ফল অনন্ত। পার্থিব ধর্ম ও অর্থ জীবনান্তে লোপ হয় কিন্তু পরমার্থের ধ্বংস নেই। তা আত্মার সঙ্গে গমন করে। যার ইচ্ছা ও ভাবনা যেরূপ তার সিদ্ধিও সেইরূপ। আকাঙ্খা না থাকলে কোন কাজে প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং সে কাজে সিদ্ধিলাভও তার অদৃষ্টে ঘটে না। মানুষ যখন যে কাজ করে থাকেন তার শুভাশুভ কামনা অবশ্য না করে কখনো সেই কাজ করেন না।

ধার্মিক ধর্ম অনুষ্ঠান করেন মুক্তি কামনায়, চোব চুরি করে অর্থ কামনায়, মানুষ বিয়ে করে পুত্র কামনায়, বালিকা ব্রত করে গুণবান স্বামী কামনায়। এরূপ প্রত্যেক কাজের মূলেই কামনা। কামনা ছাড়া কাজের উৎপত্তি হয় না। কাজ না হলে সংসার চলে না। সংসার না চললে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নাশ হয়। এতে কেউ কেউ বলতে পারেন কর্ম অনুষ্ঠান করে ফল কামনা করা অনভিপ্রেত নয়। তাই বলে সকল কাজের ফল কামনা কবা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যেমন শ্রম করে অর্থ উপার্জন এ তাঁর ইচ্ছা। কাজের গুণাগুণ বিচার করা কর্তব্য। কাজের গুণাগুণ বিচার করতে হলে বিবেকের সাহায্য নিতে হয়। বিবেক সকল মানুষেরই কম বেশী কিছু কিছু আছেই। কাজের গুণাগুণ এই বিবেকের বলে আপনা হতেই মানুষের মনে উদয় হয়ে থাকে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কর্মের ভাল ফল ও বিষময় ফল জানতে না পারে সেই পর্যন্ত তারা কাজে রত থাকে। কর্মের ফল জ্ঞান হলে আর সে কাজ করে না। কেউ কেউ কোন কোন কাজের মন্দ ফল জেনেও তা করে এর কারণ

কেবলমাত্র হৃদয়ের দুর্বলতা। সকলে এখন জেনেছেন যে সকাম কাজে স্বর্গ লাভ হয় আর নিষ্কাম কাজে মোক্ষ লাভ হয়। ভালমন্দ সকল কাজেরই ফল আছে। ফল থাকলেই তার ভোগ আছে।

সকলেই মনে করে মানুষ স্বাধীন। কিন্তু তা নিতান্ত ভুল। মানুষ যদি স্বাধীন তবে তার ইচ্ছে পূর্ণ হয় না কেন? যে স্বাধীন সে নিজের ইচ্ছে কাজে পরিণত করতে পারে না কেন? মানুষের যতটা ইচ্ছে ততটা ক্ষমতা নেই, ইচ্ছে পূর্ণ করার বাসনা সত্ত্বেও তাদৃশ শক্তি তার নেই কেন? মানুষের এই দুর্দশার কারণ কি? আমার প্রাণকে আমি যেতে বলি না। তথাপি সে যায় কেন? সে আমার আজ্ঞার অপেক্ষা রাখে না। বললে কথা শোনে না। সে কি আমার চেয়ে বলবান নয়? এই সুখ-দুঃখময় সংসারে নিজ ইচ্ছেয় আমি নেই। আমি যেতে চাইলে যেতে পারি না। আমার শরীরে যে সমস্ত কাজ সুচারুরূপে আমার শরীর রক্ষা করছে তাতে আমার কোন অধিকার নেই। মস্তিষ্কের কাজ, পরিপাকের কাজ, শোণিতের কাজ ইত্যাদি এই সকলের ওপর তিলমাত্র আধিকার নেই। তবে আমি স্বাধীন কিসে? একটু চিন্তা করলেই বেশ জানা যায় যে আমার শরীর মধ্যে আমার চেয়ে ক্ষমতাপন্ন কেউ আছেন। মানুষ মাত্রেই সম্পূর্ণ তাঁরই অধীন। মানুষের শক্তি ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয় হোক সেই মহতী অনন্ত শক্তির অধীন। সেই জন্যে আমি আমার নই। তাঁকে চিনি না বলে আমাকেও চিনি না। যিনি আপনাকে জেনেছেন তিনি ভগবানকেও জেনেছেন এবং সংসার যে কি তাও বেশ বুঝেছেন। সংসার একটি বৃক্ষ বিশেষ। আশা ঐ সংসারবৃক্ষের মঞ্জরিস্বরূপ। দুঃখাদি ওর ফলস্বরূপ। ভোগ ওর পল্লব। জরা ওর কুসুম এবং তৃষ্ণা ওর শাখা। পরম ব্রহ্মই এই জগৎ উৎপত্তির জন্যে উপাদান কারণ। সেই ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কল্পনাই নেই। বহ্নি হতে উৎপন্ন অগ্নি যেমন বহ্নিই, তেমনি ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন এই জগৎ ব্রহ্মই। বস্তুতঃ সংসার বা জগৎ নেই। সমস্তই কেবল ব্রহ্ম। যেমন অন্ধকার

বিদূরিত হলে এই দৃশ্য জগৎ দৃষ্টিগোচর হয় তেমনি এই অবস্তু ক্ষয় হলে যা বস্তু তা নির্মলরূপে প্রতিভাত হয়।

এবার স্বামিজী উমাচরণের কাছে গুরু ও শিষ্য প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, গুরু কাকে বলে আর তার আবশ্যকতাই বা কি? গুরু শব্দের অর্থ—গ শব্দে গতিদাতা, র শব্দে সিদ্ধিদাতা এবং উ শব্দে সকলের কর্তা। অতএব ঈশ্বরকেই একমাত্র গুরু বলা যায়। তিনি ভিন্ন জীবের গতি ও মুক্তি নেই। যিনি গতিমুক্তির পথ দেখিয়ে দেন তাঁকেও গুরু বলা যায়। এই কারণে ঈশ্বর ও গুরুতে বিশেষ পার্থক্য নেই। আর এই প্রকার গুরুকে সগুণ ঈশ্বর বলা যায়। কেউ কেউ অর্থ করেন, গু শব্দে অন্ধকার, রু শব্দে নিবারক, অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন তাঁকে গুরু বলা যায়। অতএব সেই গুরুকে কখন মনুষ্যবৎ মনে করবে না। গুরু কাছে থাকলে অন্য কোন দেবতারও অর্চনা করবে না। যদি কেউ করে তা বিফল হয়। গুরুই কর্তা, গুরুই বিধাতা, গুরু সন্তুষ্ট হলে সকল দেবতা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হন। গুরু এই দুই অক্ষর যার জিহ্বাগ্রে থাকে তার শাস্ত্র অধ্যয়ন করার দরকার নেই। গ এই বর্ণটি উচ্চারণ করলে, মহাপাতক নাশ হয়, উ এই বর্ণটি উচ্চারণ করলে ইহজন্মের পাপ নষ্ট হয় এবং রু এই বর্ণটি উচ্চারণ করলে, পূর্বজন্মের পাপ নষ্ট হয়। গুরুই পিতা মাতা এবং একমাত্র গতি। শিব রুষ্ট হলে, গুরু ত্রাণ করতে পারেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে, কেউই উদ্ধার করতে পারেন না। গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু জগতে আর কিছুই নেই। জপ, তপ, পূজা, অর্চনা, শাস্ত্র, মন্ত্র, ইত্যাদি গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। যিনি গুরুর মূর্তি, ধ্যান ও তাঁর তত্ত্ব সর্বদা জপ করেন তিনি কাশীবাসের ফল লাভ করেন। গুরুই তারকব্রহ্ম-স্বরূপ।

গুরু প্রণাম মন্ত্রের অর্থ ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। নতুবা কেবল উচ্চারণ করলে কোন ফল হবে না। ভক্তিভাবে কাজ করলে তবে ফল হয়।

উমাচরণ জিজ্ঞেস করলেন, গুরুপ্রণাম মন্ত্র কি রকম ?

তৈলঙ্গস্বামী বললেন, বলছি। লিখে নাও,—

১। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরম্ ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

২। অখণ্ড মণ্ডলাকারম্ ব্যাপ্তম্ যেন চরাচরম্।
তৎপদম্ দর্শিতম্ যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

৩। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতম্ যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

অর্থাৎ—১। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং গুরুই পরমব্রহ্ম, সেই গুরুকে নমস্কার করি।

২। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর আকার, যিনি চরাচর জগৎ ব্যাপে আছেন, যিনি ব্রহ্মপদ দর্শন করান সেই গুরুকে নমস্কার করি।

৩। অজ্ঞান অন্ধকারে, অন্ধজনের চক্ষু, যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করেন সেই গুরুকে নমস্কার করি।—

উমাচরণ জিজ্ঞেস করলেন, গুরু ক'রকম ?

তৈলঙ্গস্বামী বললেন, গুরু দু'রকম। শিক্ষা গুরু আর গুরু। গুরুর উপদেশ ছাড়া সামান্য বৃক্ষলতারও ভালরূপ পরিচয় জানতে পারা যায় না। মন, চিত্ত, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সকলই আর একটি প্রবল শক্তির দ্বারা উত্তেজিত বা পরিচালিত না হলে কোন কাজই করতে পারে না। যে শক্তির দ্বারা আমাদের আত্মার উন্নতি হয় ও আমরা মুক্তির দিকে অগ্রসর হই সেই শক্তিই আমাদের গুরু। দুই শক্তির একত্র ঘর্ষণ ছাড়া কোন কাজই হয় না। এই দুই শক্তির মধ্যে যে শক্তি প্রবল তাই অপরের গুরু। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যাঁর শক্তির ইঙ্গিতে নিজের নিজের কাজে নিয়ত ধাবিত হচ্ছে তিনিই জগৎগুরু। এই জগৎগুরুকে জানবার জন্যে জীবের মন-প্রাণ ব্যাকুল হলে যিনি তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা জীবের পথ পরিস্কার ও সুগম করে দেন তিনিই দীক্ষা গুরু, আর জগৎ গুরুর মায়াজাল স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু হতে বিশ্ব ব্যাপার

পর্যন্ত ভিতর বাহির তত্ত্ব যিনি বুঝিয়ে দেন তিনি শিক্ষাগুরু। একটি কীট হতে ব্রহ্ম পর্যন্ত সকলেই শিক্ষাগুরু হতে পারেন। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সকলেই কত সময়ে কত কত শিক্ষা দেয় তা সকলেই জানেন। শেখবার জন্যে যেখানেই যাত্রা করো সেখানেই কিছু না কিছু শেখবার বিষয় দেখতে পাবে। শিক্ষা দ্বারা জীবের পরমাত্মা দর্শন করবারও সাহায্য হয়। সূক্ষ্ম তত্ত্ব লাভ করবার জন্যে শিক্ষা প্রথম সোপান এবং দীক্ষা দ্বিতীয় সোপান। শিক্ষা দীক্ষার অনুকূল হওয়া চাই। শিক্ষা বিধিপূর্বক না হলে দীক্ষা ফলবতী হয় না। এই জন্যে শিক্ষা দেবার সময়ে সুশিক্ষিত ও দীক্ষিত সদ্ গুরুর আবশ্যক। যিনি শিক্ষা-তত্ত্ব ও দীক্ষা-তত্ত্বকে আলাদা বলে বিবেচনা করেন তিনি শিষ্যকে বিশেষ রূপে সুশিক্ষিত করতে পারেন না। যেমন শৈশব যৌবনের এবং যৌবন বার্দ্ধক্যের পূর্বাবস্থা তেমনি শিক্ষা দীক্ষার পূর্বের অবস্থা। শিক্ষার দ্বারা মনের সংশয় নাশ, যথার্থ জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি হয়। দীক্ষার দ্বারা জীবনের পরমারাধ্য পরম দেবতাকে দর্শন করে জীব কৃতার্থ হয়। উপযুক্ত গুরু ছাড়া শিক্ষা ও দীক্ষা দেবার অধিকারী কেউই হতে পারে না।

গুরু বললে প্রায় লোকে দীক্ষাগুরু বলে বুঝে থাকেন। গুরুকে মনে করলেই তাঁকে জগৎ ছাড়া উচ্চ লোক বলে মনে করতে হয়। আমাদের মত মানুষ বলতে ভয় হওয়া উচিত। তাঁর সঙ্গে এক আসনে বসতে নেই আর সে সাহস করাও কর্ত্তব্য নয়। তাঁর বাক্য বেদবাণী। তাঁর পাদধৌত জল অমৃত। তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য। তাঁর দর্শনে জীবন সফল হয়। তিনি অপার সংসারসমুদ্রে বিচক্ষণ কর্ণধার। এই পবিত্র দীক্ষাগুরুর পদে বরণ করি কাকে? আমাদের দেশে যাঁরা আজকাল গুরুগিরি ব্যবসা করে থাকেন, গুরু-দক্ষিণা লাভ তাঁদের লক্ষ্য তাঁদেরকে কেহই সদ্‌গুরু বলতে সাহস করবেন না। কুলগুরু ত্যাগ করতে নেই এই সংস্কারই আমাদের দেশের গুরুগণকে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত

করেছে। ছু'একজন অবশ্য ভাল গুরুও থাকতে পারেন। তাঁদেরকে সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে থাকেন। যাঁরা অশিক্ষিত অসচ্চরিত্র সাধনাবর্জিত তাঁদের দীক্ষা দেবার কি অধিকার আছে? যিনি নিজেই অন্ধ তিনি অন্যের চক্ষু উন্মীলিত করতে গিয়ে হয়তো শলাকাতে শিষ্যের চক্ষু উৎপাটিত করে বসবেন। তাঁর তো শিষ্যকে চরাচরব্যাপী অখণ্ড মণ্ডলাকার পুরুষকে দেখাবার ক্ষমতা নেই। যিনি নিজেই কখনো দেখেন নি তিনি অন্যকে কি প্রকারে দেখাবেন। তবে কেবল সদ্‌গুরুর প্রাপ্য প্রণামটা তাঁরা ফাঁকি দিয়ে গ্রহণ করে থাকেন।

পৈত্রিক বাগ্‌বাগিচা গৃহ সম্পত্তির মত তাঁরা শিষ্যঘবটা অধিকার করে বসে আছেন। একবারও মনে ভাবেন না যে দীক্ষা দেওয়া তামাসা নয়। শিষ্যকে সংসার-সিন্ধু পার করবার গুরুভার তাঁদের ওপর নির্ভর করছে। ভগবানের সামনে তিনি শিষ্যের জন্যে দায়ী। কিছু না জেনে শুনে কোন সাহসে এই জ্বলন্ত আগুনে হাত দিচ্ছেন তা জানি না। হিন্দু হয়ে শাস্ত্র মেনে কি প্রকারে এমন ভয়ানক অন্যায় কাজ করছেন তা বলতে পারি না। গুরুর লক্ষণ কি তা প্রথমে জানা উচিত। তারপব দীক্ষা দেবার উপযুক্ত হলে অবশ্য দিতে পারেন। যিনি সর্বশাস্ত্রদর্শী, কার্য্যদক্ষ শাস্ত্রের যথার্থ মর্মজ্ঞাত, সুভাষী, সুরূপ, বিকলাঙ্গ নন, যাঁব দর্শনে লোকের কল্যাণ হয়, যিনি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ব্রহ্মণ্যশীল, ব্রাহ্মণ, শান্তচিত্ত পিতৃমাতৃহিত-নিরত, আশ্রমী, দেশবাসী এরূপ গুণযুক্ত দেখে গুরুপদে ববণ করা উচিত। এই প্রকার গুণবান হয়ে শিষ্যকে দীক্ষা দিলে উভয়েরই মঙ্গল। আজকাল গুরুগিরি, চাকরী ও ব্যবসার মত অর্থ উপার্জনের পথ হয়েছে। কর্মদোষে গুরুপদকে লঘু করছেন। শিষ্যকে উদ্ধার করতে না পারলে মহাপাপে লিপ্ত হতে হয়।

মন্ত্রদীক্ষার আগে গুরু এবং শিষ্য অন্ততঃ ছ'মাস বা এক বছর একত্র বাস করবেন। পরস্পর প্রীতিযুক্ত ও উপযুক্ত বোধ করলে শিষ্য গুরুর নিকট জ্ঞান ভিক্ষা চাইবেন। তখন গুরু কৃপা করে

শিষ্যের ভবযন্ত্রণা নিস্তারের উপায় তত্ত্বজ্ঞান-উপদেশ ও দীক্ষা দান করবেন। অনেক সময় শিষ্যের অমতে গুরু বলপূর্বক দীক্ষা দেন। কিন্তু তা মহাপাপ। উপযাচক হয়ে দীক্ষা দেওয়া কেবল পয়সার লোভ ছাড়া আর কিছু নয়। শিষ্য করজোড়ে প্রার্থনা না করলে কোন সদ্‌গুরুই দীক্ষা দেবেন না। শিষ্য মন্ত্র জপ করে কিনা, সাধনে কোন বিঘ্ন হচ্ছে কিনা, শিষ্য কতটুকু উন্নতি লাভ করলো গুরুর খবর রাখা দরকার কিন্তু এখনকার গুরুরা ভুলেও একবার তা জিগ্যেস করেন না। শিষ্য কত টাকা মাইনে পায়, মাসে উপরি পাওনা কত টাকা তা জিগ্যেস করতে কখন ভুল হয় না। অনেক শিক্ষিত লোকে আজকাল সেই জন্যে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিতে চান না। যোগ্য গুরু পেলেই দীক্ষা নেওয়ার চেষ্টায় থাকেন।

ভাল গুরু না হলে পথ বলে দেবার কারও ক্ষমতা নেই। ক্ষেত্রে অর্থাৎ মানুষের দেহ সকলকার সমান নয়। সেই জন্যে সকল লোকের বীজমন্ত্র ঠিক কবা বড়ই শক্ত। মহাপুরুষ ছাড়া হতেই পারে না। আমাদের কুলগুরু হতে কিছু পাবার আশাভরসা নেই কারণ তাঁরা নিজেই কোন পথে যাবেন তা জানেন না। অন্ধ হয়ে অন্ধকে লোক পথ দেখাতে পারে না। সকল সংসারেই দেখা যায়, এক বাড়ীতে পাঁচটি ছেলে, তার কেউ সৎ, কেউ অসৎ, কেউ ধার্মিক কেউ অধার্মিক, কেউ নাস্তিক, কেউ পণ্ডিত, কিন্তু কুলগুরু চিরকাল সকলেরই ইষ্টদেবতা এক, বীজমন্ত্র একের যা অন্যেরও তাই কেবল নামের অক্ষর মিলন করণ মাত্র, এই প্রকার সিদ্ধান্ত করে দীক্ষা দিয়ে থাকেন। সেই বীজে শিষ্যের ভাল হোক বা মন্দ হোক তাঁর যেন কোন দায়ীত্ব নেই। গুরু যে কি বস্তু তা তিনি নিজেও জানেন না। শিষ্যকে দীক্ষা দিয়ে এক টাকা বা দু'টাকা বার্ষিক পেলেই আর কোন কথা নেই।

দীক্ষা নিয়ে শিষ্যের কি উপকার হলো সে কথা জিগ্যেস করতে যেন ভয় হয়, পাছে শিষ্য কিছু জিগ্যেস করে। প্রথম হতেই বাঁধা কথা একটা বলে থাকেন—জন্ম-জন্মান্তর না হলে ধর্ম উপার্জন হয়

না, এ এক জন্মের কাজ নয়। পূর্ব জন্ম পর্যন্ত এই কথা শুনে এসেছি। এই জন্মেও তাই শুনলুম। পর জন্মেও তাই শুনবো। এই প্রকারে জন্মের পর জন্ম চলে যাচ্ছে ও যাবে। সেইটা যে কোন জন্ম তা কারও বলবার সাধ্য নেই। আর এই জন্ম যে সেই জন্ম নয়, ও কেন নয়, তাও বলবার ক্ষমতা কারও নেই। অথচ তাঁরা গুরু বলে মহা অভিমান করে থাকেন।

চিটা ধান বা আগড়া অথবা পোড়া বীজ জমিতে রোপণ করলে কখনই অঙ্কুর বের হবে না। সেইজন্যে বীজ ঠিক করে দীক্ষা গ্রহণ করা নিতান্ত দরকার। বীজ ঠিক করা সদ্‌গুরু ছাড়া হতে পারে না। সদ্‌গুরু সহজে মেলে না। দীক্ষা গ্রহণ করা একটি সামান্য কাজ নয়। উপযুক্ত হলে তারপর দীক্ষা নেবার চেষ্টা করা উচিত। সংসারে উপযুক্ত গুরু পাওয়া যায় না বলে লোকের এ দুর্দশা হয়েছে। কোন কোন স্থানে অল্প বয়স্ক বালকেই দীক্ষা দিয়ে থাকে। আবার কোন স্থানে স্ত্রীলোকেও দীক্ষা দিয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে কেউই জানেন না যে দীক্ষা দেওয়া কি ভয়ানক কাজ। যাঁরা এই প্রকার গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁরাও জানেন না যে দীক্ষা কি জন্যে নিতে হয়। পূর্বকালে উপযুক্ত শিষ্য অনেক পাওয়া যেত। সেই জন্যে সদ্‌গুরুও সকলেই পেতেন। ভগবানকে পাবার জন্যে যদি প্রাণ কেঁদে ব্যাকুল হয় তবে নিশ্চয় জানবে ভগবান নিজে তোমার সহায় হয়ে সদ্‌গুরু মিলিয়ে দেন।

সদ্‌গুরু হাটে বাজারে, পথে ঘাটে, নিকটে বা শহরে পাওয়া যায় না। ভগবানের জন্যে যদি পাগল হয়, তাকে পাবার জন্যে যখন বিরহ হয়, তাঁর দর্শন লালসা যখন খুব বলবতী হয় এবং তাঁকে না পেলে আর কিছুই ভাল লাগে না তখন তাঁরই কৃপায় সদ্‌গুরুর দর্শন পাওয়া যায়। সৎ শিষ্য না হলে সদ্‌গুরু কখন পাওয়া যায় না; যেমন শিষ্য তেমনই গুরু। সকলের ঠিক তাই মিলবে। শিষ্য যদি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, দীক্ষা-মন্ত্রে ও ভগবানে যদি তার বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে তবে নিশ্চয় জানবে গুরু কাঁচা

হলেও শিষ্য পরমধামের অধিকারী হবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

শিষ্য যেমন উক্ত লক্ষণযুক্ত দেখে উপযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করবে গুরুও স্বভাবাদি না জেনে শিষ্য করবেন না। শিষ্য পুণ্যবান, ধার্মিক. বিশুদ্ধ-অন্তঃকরণ, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দানধ্যান—পরায়ণ, ধীরস্বভাব এই প্রকার প্রকৃতি না হলে সে শিষ্যকে কখনও দীক্ষা দেবেন না। অলস, মলিনবেশ, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র অর্থাৎ যে ব্যক্তি অর্থের উপযুক্ত ব্যয় না করে, রোগী, অসন্তোষচিত্ত, রাগী, লোভী, কর্কশভাষী, অন্যায় উপার্জনে ধনবান, পরস্ত্রীতে রত, অভিমানী, আচারভ্রষ্ট, খল, বহুভোক্তা দুরাত্মা এবং যে গুরু নিন্দা করে বা শ্রবণ করে ইত্যাদি প্রকার পাপিষ্ঠ নরাধম ব্যক্তিকে কখনো শিষ্য করবেন না। মন্ত্রীর পাপ রাজা, স্ত্রীর পাপ স্বামী এবং শিষ্যের পাপ গুরু নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন।

গুরু যখন শিষ্যের বাড়ীতে আসবেন, শিষ্য অগ্রগামী হয়ে তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসবে। তাঁর প্রত্যাগমনের সময় পেছন পেছন কিছুদূর যাবে। বিনা অনুমতিতে তাঁর সামনে কোন আসনাদিতে বসবে না। তাঁর সামনে শাস্ত্র ব্যাখ্যা অথবা প্রভুত্ব দেখাবে না। শিষ্য ও গুরু এক গ্রামবাসী হলে ত্রিসন্ধ্যা তাঁকে প্রণাম করবে। গুরুভবন এক ক্রোশের মধ্যে হলে প্রতিদিন একবার প্রণাম করবে। দুক্রোশ মধ্যে হলে চার মাস অন্তর গিয়ে তাঁকে প্রণাম করা উচিত।

গুরু-আজ্ঞা অবশ্য পালন করবে। তা না হলে ধর্ম, কর্ম, জপ-পূজাদি সবই বৃথা ও নীচগামী হয়। গুরুর সঙ্গে কখনো ঋণদান কিংবা কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করবে না। গুরুর প্রসাদ যে শিষ্য ভক্ষণ না করে তার বিপদ পদে পদে। ভক্তিপূর্বক গুরুর প্রসাদ ভক্ষণ করলে তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। দীক্ষা নেবার ইচ্ছে হলেই নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা সর্ব্বতোভাবে পালন করা উচিত।

১। কখন মিথ্যে কথা বলবে না।

২। কখন কারও হিংসে করবে না।

৩। সকল জীবে সমান দয়া করবে।

৪। যথাসাধ্য পরোপকার করবে।

৫। রিপু সকলকে দমন অর্থাৎ আপন বশে আনবে।

৬। পরশ্রীতে কাতর হবে না বরং আনন্দিত হবে।

৭। জ্ঞানকৃত কোন রকম অন্যায় কাজ করবে না।

৮। বৃথা ও বেশী কথা বলবে না।

৯। লোভ ও বাসনা একেবারে ত্যাগ করবে।

১০। কামনা ত্যাগ করে উপাসনা করবে।

১১। সদা সৎসঙ্গ করবে।

১২। কোন ধর্মে অশ্রদ্ধা করবে না, সকল ধর্মই সমান। যার যে ধর্মে বিশ্বাস তার তাতেই মুক্তি। ভ্রমেও কখন কারও বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চেষ্টা করবে না।

গুরু বিশেষ করে সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করলে অনেক পাপী-তাপী বা সংসারসাগরে বিভ্রান্তগ্রস্ত মানুষের জীবন সার্থক, সুখকর এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। আচার্য শঙ্করাচার্য, মহামানব বামাক্ষেপা, তৈলঙ্গ-স্বামী, পওহারী বাবা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে যাঁরা এসেছেন তাঁদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে। সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে এলে মানুষের জীবনে যে রূপান্তর ঘটে তা অনেকে অনেক জায়গায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এবার চিত্তশুদ্ধি প্রসঙ্গে তৈলঙ্গস্বামী বললেন, হিন্দুধর্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাঁরা হিন্দুধর্মের অনুরাগী অথবা হিন্দুধর্মের যথার্থ মর্মের অনুসন্ধানে ইচ্ছুক তাদেরকে এই তত্ত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করতে হয়। সাকার উপাসনা বা নিরাকার উপাসনা, একেশ্বর বাদ বা বহুদেব ভক্তি, দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্মবাদ বা ভক্তিবাদ সবই এর কাছে অকিঞ্চিৎকর। চিত্তশুদ্ধি থাকলে সব মতই শুদ্ধ। চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাঁর চিত্তশুদ্ধি নেই তাঁর

কোন ধর্মই নেই। যাঁর চিত্তশুদ্ধি আছে তাঁর আর কোন ধর্মই প্রয়োজন নেই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্মের সার এমন নয়, এ সকল ধর্মের সার। যাঁর চিত্তশুদ্ধি আছে তিনিই শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ইত্যাদি। যাঁর চিত্তশুদ্ধি নেই তিনি কোন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধার্মিক বলে গণ্য হতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম আর এ হিন্দুধর্মেই প্রবল। যাঁর চিত্তশুদ্ধি নেই তিনি হিন্দু নন বলা যেতে পারে।

এই চিত্তশুদ্ধি কি তা অনেক প্রকার লক্ষণ ও কাজের দ্বারা বুঝতে পারা যায়। চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম। ইন্দ্রিয়সংযম এই বাক্য দ্বারা এমন বুঝতে হবে না যে ইন্দ্রিয়সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করতে হবে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত অর্থাৎ আপন বশে আনতে হবে। তাদের বশে যাবে না। এরই নাম ইন্দ্রিয়সংযম জানবে। ঐদরিকতা একপ্রকার ইন্দ্রিয়পরতা। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ের সংযম করতে হলে এমন বুঝতে হবে না যে পেটে কখন খাবে না অথবা কেবল বায়ু ভক্ষণ করবে কিম্বা অর্দ্ধাসন বা কদর্য আহার করে দিন কাটাবে। শরীর এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে যে পরিমাণে এবং যে প্রকার আহারের প্রয়োজন তা অবশ্য করতে হবে। তাতে ইন্দ্রিয়-সংযমের কোন বিঘ্ন হয় না। ইন্দ্রিয়সংযম তত কঠিন ব্যাপার নয়। কেবলমাত্র কোন ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী না হয়ে তাদেরকে নিজের বশে আনা দরকার। আর তাহলে উত্তম আহারাদি অবিধেয় নয় যদি তাতে স্পৃহা না থাকে। ফল কথা এই যে ইন্দ্রিয়ের আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়সংযম। আত্মরক্ষার্থে বা ধনরক্ষার্থে অর্থাৎ ঐহিক নিয়ম রক্ষার্থে যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা দরকার, তার বেশী যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অভিলাষ করে তারই ইন্দ্রিয়সংযম হয় নি। যে না করে তার হয়েছে। যার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে সুখ নেই. আকাঙ্ক্ষা নেই, কেবল ধর্মরক্ষা আছে তারই ইন্দ্রিয় সংযত হয়েছে।

এমন অনেক লোক আছেন যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে একেবারে বিমুখ কিন্তু মনের মানুষ ক্ষালিত করেন নি। লোক লজ্জায় বা

লোকের কাছে প্রতিপত্তির জন্যে কিম্বা ঐহিক উন্নতির জন্যে অথবা ধর্মের ভাণে পীড়িত হয়ে তাঁরা জিতেন্দ্রিয়ের মত কাজ করেন কিন্তু ভেতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা কখনো স্খলিত পদ না হলেও তাঁরা ইন্দ্রিয়সংযম হতে অনেক দূরে। যাঁরা মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে উদ্যোগী ও কৃতকার্য তাঁদের হতে এরূপ ধর্মাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প। উভয়কেই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হতে হবে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কর বা না কর যখন ভ্রমেও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কথা মনে আসবে না, আত্মরক্ষার্থ বা ধর্মার্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করতে হলেও তা দুঃখের বিষয় ব্যতীত সুখের বিষয় বোধ হবে না, তখনই ইন্দ্রিয়ের সংযম হয়েছে। তার অভাবে যোগ অভ্যাস, তপস্যা, উপাসনা, কঠোর কাজ সবই বৃথা।

কেবল যোগ বা তপস্যা করলে ইন্দ্রিয় যংযম হয় না। কর্মক্ষেত্রে সংসার ধর্মেই ইন্দ্রিয় সংযম হয়। প্রতিদিন অরণ্যে বাস করে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপাদান সকল হতে দূরে গমন করে সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হয়ে মনে করা যায় বটে যে আমি ইন্দ্রিয়জয়ী হয়েছি। কিন্তু যে কাঁচা মাটির মাত্র অগ্নিসংস্কৃত হয় নি তা যেমন স্পর্শমাত্র টিকে না তেমনি এই প্রকার ইন্দ্রিয়সংযমও লোভের স্পর্শমাত্র টিকে না। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। স্বর্গ হতে অপ্সরা এলো অমনি ঋষিঠাকুরের ধ্যান ভঙ্গ হলো। তিনি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। তাঁর ধৈর্য ভঙ্গ হলো। অবশেষে তিনি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করে ক্ষান্ত হলেন। যে দেশে যে জিনিস পাওয়া যায় না সেই দেশের লোকে সেই জিনিস খায় না বা ব্যবহার করে না, যদি কখন পায় তবে অতি আগ্রহের সঙ্গে খায় বা ব্যবহার করে, তাকে ত্যাগস্বীকার বলে না। যে প্রতিদিন ইন্দ্রিয়চরিতার্থ উপযোগী উপাদান সমূহের সংসর্গে এসেছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কখন জয়ী এবং কখন বিজিত হয়েছে সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করেছে। পরাশর বা বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্রিয় জয় করতে পারেন নি। ভীষ্ম বা লক্ষ্মণ এঁরা ইন্দ্রিয় জয় করতে পেরেছেন।

ইন্দ্রিয়সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা। চিত্তশুদ্ধির তার চেয়ে গুরুতর লক্ষণ আছে। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত কিন্তু অন্য কারণে তাদের চিত্ত শুদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয় সুখভোগ করবো না কিন্তু আমি ভাল থাকবো, আমায় সকলে ভালবাসবে, এই বাসনা তাদের মনে বড় প্রবল। আমার ধন হোক, আমার মান হোক, আমার সম্পদ হোক, আমার যশ হোক, আমার সৌভাগ্য হোক, আমি বড় হই, আর আমাকে সকলে ধার্মিক ও মহাত্মা বলে মান্য করুক, তারা সর্বদাই এই কামনা করে। যাতে এই কামনা পূর্ণ হয় চিরকাল সেই চেষ্টায় সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকে। সেই জন্যে না করে এমন কাজ নেই, তাছাড়া এমন বিষয় নেই যাতে মন না দেয়। যারা ইন্দ্রিয়াসক্ত তাদের অপেক্ষাও এরা নিকৃষ্ট। এদের কাছে ধর্ম কিছুই না, কর্ম কিছুই না, জ্ঞান কিছুই না, ভক্তি কিছুই না। তারা ঈশ্বর মানলেও ঈশ্বর আছেন কিনা সে বিশ্বাস নেই। জগৎ থাকলেও তাদের কাছে জগৎ নেই। ইন্দ্রিয় আসক্তির চেয়ে এই স্বার্থপরতা চিত্তশুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন।

তাহলে চিত্তশুদ্ধির বিঘ্ন নেই কোথায়? এই প্রসঙ্গে তৈলঙ্গস্বামী বললেন, পরার্থপরতা ও বাসনা ত্যাগ ছাড়া চিত্তশুদ্ধি হয় না। যখন আপনি যেমন পরও তেমন এই কথা বুঝবো, যখন আপন সুখ যেমন খুঁজবো, পরের সুখও তেমন খুঁজবো, যখন আপনা হতে পরকে ভিন্ন ভাববো না, যখন আপনার চেয়েও পরকে আপনার ভাববো, যখন ক্রমশ আপনাকে ভুলে গিয়ে পরকে সর্বস্ব জ্ঞান করবো, যখন পরেতে আপনাকে নিমজ্জিত রাখতে পারবো, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হবে তখনই চিত্তশুদ্ধি হয়েছে জানবে। তা নাহলে ডোর কৌপীন ধারণ করে সংসার পরিত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে দ্বারে দ্বারে হরিনাম করে বেড়ালে চিত্তশুদ্ধি হবে না। পক্ষান্তরে রাজসিংহাসনে হীরকমণ্ডিত হয়ে উপবেশন করে যে রাজা একজন ভিক্ষুক প্রজার দুঃখ নিজের দুঃখের মত ভাবেন তাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়েছে। যিনি সকল শুদ্ধির স্রষ্টা, যিনি শুদ্ধিময়, যাঁর কৃপায় শুদ্ধি, তাঁতে গাঢ় ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। এই ভক্তি চিত্তশুদ্ধির এবং ধর্মের মূল।

চিত্তশুদ্ধি প্রসঙ্গে স্বামিজী আরও বললেন, চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ হৃদয়ে শান্তি। দ্বিতীয় লক্ষণ পরকে ভালবাসা। তৃতীয় লক্ষণ ঈশ্বরে ভক্তি। যেসব মানুষের এরূপ শান্তি, প্রীতি ও ভক্তি যোগ হয় তাদের কোন কামনা থাকে না। অধিক কি তাদেরকে সালোক্য অর্থাৎ আমার সঙ্গে বাস সামীপ্য অর্থাৎ সমীপবর্তিস্থ, সাযুজ্য অর্থাৎ আমার তুল্য ঐশ্বর্য, সারূপ্য অর্থাৎ আমাব সমান রূপত্ব এবং একত্ব এই সব মুক্তি দিতে চাইলেও তারা ভগবৎ সেবা ছাড়া আর কিছু চায় না। ধনের আশা পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধাযুক্ত; হিংসা ত্যাগ, নিষ্কাম হয়ে পূজো বা জপ দ্বারা তাঁব স্বরূপ দর্শন, স্পর্শন, স্তবকরণ, সকল প্রাণীতে তাঁর ভাব চিন্তাকরণ, ধৈর্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তিদিগকে সম্মানকরণ দীনের প্রতি দয়া, আত্মতুল্য ব্যক্তির সঙ্গে মৈত্রতা, অন্তরিন্দ্রিয়েব দমন, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, তাঁর নাম সংকীর্তন, সরলতা, সৎসঙ্গকরণ এবং নিরহংকারিতা প্রদর্শন, এইসব গুণদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। আর সেই সব মানুষ বিনা যত্নে তাঁকে লাভ কবে। যেমন গন্ধ বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হয়ে স্বস্থান হতে এসে ঘ্রাণকে আশ্রয় কবে সেই প্রকার ভক্তিযোগযুক্ত চিত্ত বিনা যত্নে পরমাত্মাকে আত্মসাৎ করে।

তিনি সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ হয়ে সকল প্রাণীতেই রয়েছেন। জীব যে পর্যন্ত সকল প্রাণীতে অবস্থিত 'তাঁকে' আপন হৃদয়মাঝে জানতে না পারে সে পর্যন্ত স্বকর্মে রত হয়ে উপাসনা বা জপ করবে। যে ব্যক্তি আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে, যার আপনার দুঃখের তুল্য পরের দুঃখ অনুভব না হয়, তার ঈশ্বর কি এবং ব্রহ্মময় জগৎ কি রকম তা অনুভব হতে পারে না। ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তিনি সকল স্থানে অর্থাৎ বনে, গ্রামে, নগরে, জলে, স্থলে, শূন্যে প্রান্তরে এবং সকল প্রাণীতে আত্মার স্বরূপ রূপে বয়েছেন। কেবল মুখে ঈশ্বর সর্বব্যাপী বললে চলবে না। ঈশ্বর সর্বব্যাপী এই কথা স্বীকার করলেই ব্রহ্মময় জগৎ স্বীকার করতে হবে। যাঁরা জ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বর সর্বব্যাপী ঈশ্বর সর্বান্তর্যামী বলেন তাঁরা ব্রহ্মময় জগৎ কি প্রকার বেশ বুঝতে পারছেন। ঈশ্বর যে কি পদার্থ এবং তাঁর আকারই বা কি রকম আর

কি করলে বা কোন পথ অবলম্বন করলে তাঁকে পাওয়া যায় তা প্রথমে ধারণা বা দৃষ্ট হয় না, কেবল বুঝে নিতে হয়। বুঝতে চেষ্টা করলেই হৃদয়ঙ্গম হয়ে প্রথমে কারণ প্রত্যক্ষ হয়ে পরে দর্শন হয়। তিনি দিবারাত্রি সামনেই আছেন। আমরা অন্তরের সঙ্গে দেখতে চাই না বলে তাঁকে দেখতে পাই না।

এবার ধর্ম প্রসঙ্গে তৈলঙ্গস্বামী বললেন, আজকাল সর্বত্র সকল লোকের মুখে বাহ্যিক বা আন্তরিক কেবল ধর্মের কথা শুনতে পাওয়া যায়। এমন পুস্তক, এমন পত্রিকা, এমন প্রবন্ধ নেই যাতে ধর্মের হুঙ্কারে লোকের কাণে তালা না লাগে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজকের মনুষ্য সমাজ এবং বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম বড়ই বিরল। সকল লোকের মধ্যে, সকল সম্প্রদায় মধ্যে কেবল হিংসা ও বিদ্বেষ পূর্ণ, কেবল ভাব চুরি অর্থাৎ ভেতরে এক প্রকার, বাইরে অন্য প্রকার। যিনি নিজে বলছেন আজকাল কন্যাদায় বড়ই শক্ত ব্যাপার হয়েছে। তা উঠে যাওয়া উচিত। আবার তিনিই নিজের পুত্রের বিয়ের সময় অতি অল্প করে দশ হাজার টাকার কমে ঘাড় পাতেন না। কেবল মুখে ধর্ম ধর্ম করে গগনভেদী রোল হচ্ছে। কপটভাব মত প্রাদুর্ভাব বোধহয় পৃথিবীতে আর কখনো হয় নি। মনুষ্য সমাজের এমন দুরবস্থা আর কখনো হয় নি। মনুষ্য আজ বড়ই অসুখী। তাই সুখদুঃখ তত্ত্ব নিয়ে এত ব্যস্ত হয়েছে।

প্রথমে দেখা উচিত ধর্ম কোথা হতে এলো? কোন্ সময় হতে আরম্ভ হয়েছে? তার সৃষ্টিকর্তাই বা কে? অনেকেই মনে করতে পারেন একথার উত্তর বড় সহজ। খ্রীষ্টিয়ান বলবেন মুসা ও যীশু ধর্ম এনেছেন। মুসলমান বলবেন মহম্মদ ধর্ম এনেছেন। বৌদ্ধ বলবেন তথাগত ধর্ম এনেছেন। হিন্দু বলবেন ধর্ম স্বয়ং ভগবান এনেছেন অর্থাৎ এ ভগবানবাক্য এবং ঋষিবাক্য। কিন্তু তাছাড়া আরও ধর্ম আছে। পৃথিবীতে কত জাতীয় মানুষ আছে তার সংখ্যা নেই। সকলেরই এক একটা ধর্ম আছে। এই জগতে এমন কোন জাতি নেই যাদের

কোন প্রকার ধর্ম নেই। তাদের ধর্ম কোথা হতে এলো? অথচ তাদের ধর্মস্রষ্টা কেউ নেই।

যাঁরা বলেন, যীশু বা মহম্মদ, মুসা বা বুদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম সৃষ্টি করেছেন তাঁদের এ ভয়ানক ভুল। এরা কেউই ধর্মের সৃষ্টি করেন নি। কোন প্রচলিত ধর্মের উন্নতি করেছেন মাত্র। খ্রীষ্টের পূর্বে ইহুদি ধর্ম ছিল, খ্রীষ্ট ধর্ম তারই ওপব গঠিত হয়েছে। মহম্মদেব আগেও আববে ধর্ম ছিল। ইসলাম ধর্ম তার ওপর ও ইহুদি ধর্মের ওপর গঠিত হয়েছে। শাক্যসিংহেব আগে বৈদিক ধর্ম ছিল। বৌদ্ধধর্ম কেবল হিন্দু ধর্মেব সংস্কার মাত্র। মুসাব ধর্ম প্রচারের আগেও এক ইহুদি ধর্ম ছিল। মুসা তার উন্নতি করে গিয়েছেন। সেই সব আদিম ধর্ম কোথা হতে এলো? তার প্রণেতা কাউকেও দেখা যায় না। ধর্মের উৎপত্তি বুঝতে গেলে সভ্য জাতির ধর্মের মধ্যে অনুসন্ধান করলে কিছু পাওয়া যাবে না। কারণ সভ্য জাতির ধর্ম পুরোনো হয়েছে। সে সকলের প্রথম অবস্থা আর নেই। প্রথম অবস্থা ছাড়া আব কোথাও উৎপত্তি লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। যেমন গাছ কোথা হতে এলো অঙ্কুর দেখলে বোঝা যায়, প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখলে বোঝা যায় না। অতএব অসভ্য জাতিদের ধর্মের আলোচনা কবলে ধর্মের উৎপত্তি বোঝা যায়।

মানুষ যতই অসভ্য হোক না কেন তারা সকলেই বেশ বুঝতে পারে যে শরীর হতে চৈতন্য একটি পৃথক সামগ্রী। একজন মানুষ চলছে, কাজ করছে, কথা বলছে, খাচ্ছে, সে মরে গেলে আর কিছুই করে না অথচ তার শরীর যেমন ছিল তেমনি আছে। হাত-পায়ের কিছুই অভাব নেই কিন্তু সে আর কিছুই করতে পারে না। তার শরীরের একটা কিছু প্রধান বস্তু তার আর নেই। সেইজন্যে সে আর কিছু করতে সক্ষম হয় না। তাতেই অসভ্য লোকেও বুঝতে পাবে যে শরীর ছাড়া জীবে আর একটা কি পদার্থ আছে সেইটার বলে জীবত্ব, শরীরের বলে জীবত্ব নয়। সভ্য লোকে এর নাম দিয়েছে জীবন অথবা প্রাণ বা আর কিছু, অসভ্য লোকে নাম দিতে

পারুক আর নাই পারুক সকলেই বেশ জানে এ দেহের মধ্যে একটা প্রধান ও স্বতন্ত্র সামগ্রী।

আর একটু বুঝে দেখলে বেশ জানতে পারা যায় যে এ কেবল জীবের আছে তা নয়, গাছ-পালারও আছে, গাছ-পালাতেও ঐ জিনিসটা যতদিন থাকে, ততদিন গাছে ফুল ধরে, পাতা গজায়, ফল ধরে, হ্রাসবৃদ্ধি পায়। আর তার অভাব হলে আর ফুল ধরে না। পাতা গজায় না। ফলও ধরে না। গাছ শুকিয়ে মরে যায়। অতএব গাছ-পালারও জীবন আছে। গাছপালার সঙ্গে আর জীবের সঙ্গে একটা প্রভেদ এই যে গাছপালা নড়ে বেড়ায় না, কথা বলতে পারে না। ইচ্ছেমত কিছুই করতে পারে না। অতএব মানুষ এখন জ্ঞানসোপানে একপদ উঠলো। কারণ বেশ জানতে পারলো যে জীবন ছাড়া জীবে আর একটা কিছু পদার্থ আছে যা গাছপালায় নেই। তাতেই সভ্য লোকে চৈতন্য বলে থাকে।

সকলেই দেখছেন মানুষ মরলে, তার শরীর থাকে কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মানুষ যখন নিদ্রা যায় তখন শরীর থাকে কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মূর্চ্ছাদি রোগ হলে শরীর থাকে কিন্তু চৈতন্য থাকে না। এখন সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে চৈতন্য শরীর ছাড়া একটি স্বতন্ত্র বস্তু। এখন আরও দেখতে বা বুঝতে হবে। এই শরীর হতে চৈতন্য যদি পৃথক বস্তু হলো তবে এই শরীর না থাকলে চৈতন্য থাকতে পারে কি না এবং থাকে কি না। যদি থাকে তবে কোথায় ও কি ভাবে থাকে? মানুষ মাত্রেই প্রতিদিন দেখছেন যে চৈতন্য দেহ ছেড়ে যথা ইচ্ছা তথা যেতে পারে এবং যথা ইচ্ছা তথা থাকতে পারে। তার প্রমাণ স্বপ্ন অবস্থায় শরীর এক জায়গায় থাকলো কিন্তু চৈতন্য আব এক জায়গায় বেড়াচ্ছে, সুখদুঃখ ভোগ করছে। নানাপ্রকার কাজও করছে। তাহলে শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে। এতে বোধ হয় আর কারও সন্দেহ থাকতে পারে না। জীব আপন ইচ্ছায় কাজ করতে পারে। এই জন্যে জীবের চৈতন্য আছে। নির্জীব ইচ্ছেমত কাজ করতে পারে না। সেই জন্যেই অচেতন। এখন বোধ হয় সকলেই বেশ ভালরূপ

বুঝেছেন যে শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে এবং এই বিশ্বাসই ধর্মের প্রথম সোপান। জ্ঞানই ধর্মের মূল। যার জ্ঞান নেই তার আর ধর্ম বা অধর্ম কি?

জড় পদার্থে চৈতন্য আরোপ করা ধর্মের দ্বিতীয় সোপান। একে ধর্ম না বলে উপধর্ম বলা যেতে পারে। আর উপধর্মই সত্য ধর্মের প্রথম অবস্থা। কোথা হতে আকাশে মেঘ আসে, মেঘ এসে কেন বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হয়ে কোথা যায়, মেঘ এলেই বা সকল সময়ে বৃষ্টি হয় না কেন, যে সময়ে বৃষ্টির প্রয়োজন যে সময়ে বৃষ্টি হলে শস্য হবে সেই সময় সচরাচর বৃষ্টি হয় কেন, আবার এক সময় তাই বা হয় না কেন? এই সব আকাশের ইচ্ছে, মেঘের ইচ্ছে, বৃষ্টির ইচ্ছে। এই জন্যে আকাশ, মেঘ ও বৃষ্টিকে সচেতন বলা যায়। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, অগ্নি, ঝড়, বায়ু, বজ্র, বিদ্যুৎ ও সমুদ্র সম্বন্ধেও সেইপ্রকার। ঝড়, বৃষ্টি, বায়ু, বজ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, এদের চেয়ে আর বলবান কে? যদি এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ থাকে তবে সূর্য। এর প্রচণ্ড তেজ, আশ্চর্য গতি, কালোৎপাদন শক্তি, জীবোৎপাদন শক্তি, আলোক সবই আশ্চর্য। ইনি জগতের রক্ষক বললেও হয়। ইনি যতক্ষণ উদয় না হন ততক্ষণ জগতের কাজকর্ম সবই প্রায় বন্ধ থাকে।

এই সব শক্তিশালী পদার্থের ক্ষমতা দেখেই উপাসনার উৎপত্তি হয়েছে। একেই ধর্মের তৃতীয় সোপান বলা যেতে পারে। এইজন্যে সকল দেশে সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, আকাশাদির উপাসনা করে থাকে। এই জন্যে বেদে ইন্দ্রাদি, আকাশ, সূর্য, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উপাসনা ব্যবস্থা আছে। মই, বাঁশ, সিঁড়ি, দড়ি প্রভৃতি নানা উপায়ে যেমন অট্টালিকার ছাদে ওঠা যায় তেমনি ধর্মরাজ্যে যাবারও নানা রকম উপায় বা পথ আছে।

অহিংসা, ভক্তি ও ভালবাসা ধর্মের মূল। সর্বত্র সকল লোকের মুখে বাহ্যিক বা আন্তরিক ভালবাসার কথা শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ কাউকেও বাস্তবিক অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে না। যতদিন না আপন পর সমান বোধ হবে ও প্রকৃত ভালবাসতে শিখবে ততদিন

ধর্মের ভান করা বৃথা ও বিড়ম্বনা মাত্র। সকলেই অবগত আছেন যে ভালবাসা দুই প্রকার। প্রথম স্বাভাবিক, সম্বন্ধের বলে ভালবাসা, যেমন পিতাপুত্রে, স্বামী ও স্ত্রীতে। দ্বিতীয় গুণ দর্শনে, যেমন বন্ধুবান্ধব মধ্যে। যথার্থ ভালবাসার প্রণালী একটি আছে। সেই প্রণালীতে ভালবাসলে তবে সেই মহৎ এবং মনোহর ফল লাভ হতে পাবে। সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হয়ে আপনাকে এবং সমস্ত পৃথিবীকে ও সমস্ত প্রাণীকে, সেই সচ্চিদানন্দের বিকাশ ভেবে সমস্ত মানুষকে, সমস্ত প্রাণীকে, সমস্ত জগৎকে ভালবাসতে শিক্ষা করলে তবে প্রকৃত ভালবাসা কাকে বলে জানতে পারা যায়।

যাকে ভালবাসবো সে ভাল হোক বা মন্দ হোক তা আমার দেখবার আবশ্যক নেই। সে ভাল হলেও ভালবাসবো মন্দ হলেও ভালবাসবো। জগৎ ভাল কি মন্দ সে বিচার করে জগৎকে ভালবাসতে শিক্ষা করা উচিত নয়। সমস্ত জগৎ সেই সচ্চিদানন্দ, অতএব সমস্ত জগৎ ভালবাসার পাত্র। যে অনন্ত পুরুষের ধ্যানে আত্ম অভিমান বিনাশ করে আপনাকে ভগবদ্ভাবে ভরিয়ে ফেলেছে সেই সমস্ত জগৎকে ভালবাসতে সক্ষম হয়েছে এবং জগৎকে জগদীশ্বর বলে ভালবাসতে পারবে। আমার বিবেচনা হয় শিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বীকার করবেন যে হিন্দুশাস্ত্রের কিছু সংস্কার হওয়া নিতান্ত দরকার। সকলেই জানেন যে হিন্দুধর্ম অপেক্ষা সত্য ও উৎকৃষ্ট ধর্ম আর নেই। যদি কেউ ভগবান দর্শন ও মুক্তি পেয়ে থাকেন কিম্বা মুক্তি চান তাহলে হিন্দুধর্ম হতেই অতি সহজে পেয়েছেন ও পাবেন। কেবল আমাদের পথ দেখাবার বা বলে দেবার লোক নেই। এখন অনেক বিষয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা করবার তেমন পণ্ডিত নেই। এখানকার পণ্ডিতেরা অনেক বিষয় জেনে শুনে সত্যমিথ্যা অথবা ভালমন্দ বিচার না করে তাঁদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছেন। আবার কেবল তাই নয়, অনেক মহাত্মা নিজে শ্লোক রচনা করে হয়ত পুরাণের কথা বেদের মধ্যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছেন। সেই আসল বস্তু ঠিক রাখা নিতান্ত দরকার।

কোন প্রকার একটা পথ অবলম্বন না করলে ধর্ম যে কি পদার্থ তা

জানা যায় না। কোশাকুশী নাড়লেই ধর্ম হয় না। প্রতিদিন কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করলেও ধর্ম হয় না। নাকমুখ টিপে ধর্মের ভান করে লোক ভোলালে ধর্ম হয় না। সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিয়ে হরিনামের ঝুলি হাতে রাস্তায় রাস্তায় বেড়ালেও ধর্ম হয় না। ধর্মের কাছে দ্বেষাদ্বেষ, ভেদাভেদ নেই। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' না হলে প্রকৃত ধার্মিক হওয়া যায় না। সমদর্শী না হলে যখন সিদ্ধি হয় না, কলহ-দ্বেষ যখন জগতের পাপ-প্রসবতা, তখন ধর্ম কলহ বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম যে একান্ত নিন্দনীয় তার আর সন্দেহ কি? ঈশ্বর সকলের সমান। তাঁর কাছে জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ধর্ম নেই। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, যবন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন ইত্যাদি কোন প্রকার ভেদ নেই। যে তাঁকে এক মনে ভক্তিভরে ডাকে তিনি তাঁর। তিনি সকলের। এমন উদার ভাব ছেড়ে আমরা ধর্ম বিবাদ করি এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি আছে। তিনি এক এবং সকলের। সেইজন্যে সমস্ত জগৎ এক, সমস্ত জগতের লোক এক এবং সমস্ত ধর্মই এক। ধর্মের পথ অত্যন্ত উদার। যাঁর যে মতে বিশ্বাস তিনি সেই মতেই ধর্মলাভে সমর্থ। কখন কারও ধর্মে বিশ্বাস ভঙ্গ করা কোন মতেই উচিত নয়।

অনেকে মনে করেন সংসার ছেড়ে বনে না গেলে ধর্ম হয় না। এ ভয়ানক ভুল। যদি জগতের সমস্ত লোক বনে যায় তবে বনই সংসার হয়ে যায়। অথবা সৃষ্টি থাকে না। সৃষ্টি না থাকলে সংসার ও জীব সৃষ্টি হবার কোন কারণ ছিল না। এতে ঈশ্বরের কাজে হস্তার্পণ করা হয়। সংসারই ধর্মের প্রধান স্থান। সকল কাজই করা চাই। কেবল বায়ুর মত কিছুতে লিপ্ত হবে না? সকলেই জানেন ধর্মের পথ সকলকার সমান নয়। গৃহী যদি বানপ্রস্থ অথবা ব্রহ্মচারীর পথ অবলম্বন করেন তার কোন ফল হবে না। ঘরে বসে যদি কেউ কুম্ভক যোগী হতে চেষ্টা করেন তারও কোন ফল হবে না। পথ ভিন্ন ভিন্ন বটে কিন্তু কাজ একই। যেমন জলের সমষ্টি জলাশয়।

জগতে অনেক প্রকার সাধক আছেন। তার মধ্যে দুই শ্রেণীর সাধক প্রধান। প্রথম শ্রেণীর সাধক সংসারের মায়াবন্ধন ছেদন করে

নিজের মুক্তির জন্যে নির্জন অরণ্যমাঝে যোগ বা তপস্যা করে কালাতিপাত করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক মানবমণ্ডলীকে আপন জ্ঞান করে তাদের মুক্তি নিজের মুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করেন এবং তাদেরকে অতি প্রেমের সঙ্গে ধর্মপথে নিয়ে আসেন। পরের ইস্ট নিজের ইস্ট বোধ করেন এবং পরের জন্যে পাগল। যেমন বুদ্ধদেব, চৈতন্য।

যতদিন হতে মানুষের সৃষ্টি, যতদিন হতে মানুষেরা কথা বলতে শিখেছে, যতদিন হতে মানুষের বুদ্ধির উদয় হয়েছে ততদিন হতেই মানবসমাজে ধর্মও বিস্তৃত হয়েছে। তখন ধর্মের নামকরণ না হোক, ধর্মের এত বন্ধন না থাকুক, কিন্তু একটা না একটা ধর্ম ছিল। যা সত্য তা অবিনশ্বর আর তাই মানুষের গ্রহণীয়। বেদোক্ত যে সনাতন ধর্ম, তা অবিনশ্বর এবং অনন্ত সত্যে গঠিত। সুতরাং তাকে অবলম্বন করা উচিত। এখন দেখা উচিত, সকলেই মুখে ধর্ম ধর্ম করেন বা বলেন, কিন্তু আসল কথাটাই বা কি, আর তার কাজই বা কি? মন স্থির করে ভক্তিভাবে নিজের চৈতন্য বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে যোগ করাই ধর্ম এবং যে পথ অবলম্বন করলে সেই সংযোগ করা যায় তারই নাম ধর্মপথ।

ধর্ম কি আর তার আবশ্যকতাই বা কি? ধর্ম শব্দের অর্থ নির্ণয় করলেই এর আবশ্যকতা জানতে পারবেন। ধর্ম শব্দ ধৃ ধাতু হতে নিষ্পন্ন। যে ধারণ করে সেই ধর্ম। যে যাকে ধারণ করে সেই তার ধর্ম। দ্রব্যের স্বভাবকে ধর্ম বলে, যেমন সূর্যের ধর্ম তাপ, জলের ধর্ম রস, অগ্নির ধর্ম দাহন, সেই প্রকার জীবের ধর্ম আত্মজ্ঞান। যে বস্তুর অভাবে পদার্থের পদার্থত্ব থাকে না, সে বস্তু যে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় তা বোধ হয় আর বোঝাতে হবে না। ধর্ম জগতের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ। ধর্মদ্বারা পাপরাশি বিনষ্ট হয়। সেই জন্যে ধর্ম সকলের শ্রেষ্ঠ। বিদ্যা, ধন, শরীর, সৎকুলে জন্ম, আরোগিতা ও মুক্তি কেবল ধর্ম হতে হয়। ধর্ম বৃদ্ধি হলে জীবের সবই বৃদ্ধি হয় এবং হ্রাস হলে সবই হ্রাস হয়। মানুষ মাত্রেরই ধর্মকে আশ্রয় করা উচিত।

নচেৎ মানুষের মনুষ্যত্ব অপগত হয়ে পশুত্ব অথবা কোন হীন জাতিত্ব প্রাপ্ত হতে হয়।

ধর্মের মূল—হৃদয়, মন ও শক্তির সঙ্গে ভগবানে ভক্তি এবং বিশ্বাস। প্রতিবেশী, আত্মীয়গণ এবং সমস্ত জগৎকে আপনার জ্ঞান হওয়া, জ্ঞানকৃত কোন অন্যায় কাজ না করা, জীবে দয়া, অহিংসা, লোভ-সম্বরণ, ক্রোধসম্বরণ, সত্যবাক্, ক্ষমা, সৎসংসর্গ, জিতেন্দ্রিয়তা, শৌচ, গুরুভক্তি, সকল ভূতে ভ্রাতৃত্ব এবং ঈশ্বরে পিতৃত্ব এই সব জ্ঞানই ধর্ম।

শাস্ত্র অনন্ত কিন্তু আয়ু অতি অল্প, মনুষ্যজীবনে বিঘ্নও অনেক। অতএব সকল শাস্ত্রের সারমর্ম জ্ঞাত হওয়াই কর্তব্য। ধর্মলাভ সামান্য জ্ঞান দ্বারা হতে পারে। তাব জন্যে সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন দরকার হয় না। যেখানে ধর্ম সেখানে তেজঃকান্তি, যেখানে লজ্জা সেখানে শ্রী, যেখানে সৎসঙ্গ সেখানে সুবুদ্ধি, যেখানে ধার্মিক সেখানে ভগবান বিবাজিত। ধর্মলাভের জন্যে মতাপেক্ষা করে না। যেভাবে যে কেউ তাঁকে ভজনা করে, তিনি সেইভাবে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। যেমন নদী নানা দিক দিয়ে গমন কবে পরিশেষে একমাত্র সাগরেই নিপতিত হয় তেমনি ভগবানকে যেভাবেই উপাসনা করুক না কেন তা সেই ভাবগ্রাহী পরম ব্রহ্মে অর্পিত হয়।

উপাসনা হচ্ছে সাধনমার্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই প্রসঙ্গে তৈলঙ্গস্বামী বলেছেন, উপাসনা কাকে বলে আর আবশ্যক কি না তাই প্রথমে জানা চাই। যদি ঈশ্বরকে জানবার বা পাবার ইচ্ছে হয়, তাহলে উপাসনা করা দরকার। নচেৎ যাঁর সে ইচ্ছে নেই তাঁর উপাসনা করবারও দরকার নেই। ঈশ্বর কারও তোষামোদ চান না। তাঁর সকল জীবে সমান দয়া। উপাসনা বা আরাধনা ইত্যাদি উৎকোচ নয়, ইহা ঈশ্বরের বিশুদ্ধ শক্তিজাল। আকর্ষণের যন্ত্রস্বরূপ। তাঁকে জানবার দরকার বিবেচনা হলে যে পথ অবলম্বন করলে তাঁকে জানতে পারা যায় সেই পথের নামই উপাসনা।

মানুষ মাত্রেই কেবল সুখভোগ করতে চায় কিন্তু সুখ শব্দটি প্রকৃত

কোন অবস্থার নাম তা এ পর্যন্ত কেউ অবগত হতে পারেন নি। দুঃখের পরম নিবৃত্তিই মহা সুখ। তা সে কোন্ কানন আলো করে আছে, মনের সম্পূর্ণ শান্তি কোন্ সাগরগর্ভে লুক্কায়িত আছে, তার অনুসন্ধান কেউ করতে চায় না। দুঃখ না থাকলে সুখ যে কি প্রকার তা কেউই জানতে পারতেন না। কোন প্রকার অন্যায় কাজ করলেই কষ্ট ভোগ করতে হয়। ঈশ্বর মানুষকে যে কষ্ট দেন তা কেবল তারই সুখ ভোগের জন্যে। তাঁর ইচ্ছে মানুষ মাত্রেই সৎপথে থেকে চিরকাল সুখ ভোগ করুক। পাকা সোনা এক ভরির দাম পঁচিশ টাকা। তাতে যে পরিমাণে খাদ মেশানো হয় সেই পরিমাণে দাম কম হয়। স্বর্ণকার তাকে রসায়ন দ্বারা পুড়িয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না পুনরায় পাকা সোনা হয় ততক্ষণ পেটাপিটি করে। সেই রকম জীব কোনপ্রকার অন্যায় কাজ করলে ঈশ্বর তাকে কষ্ট ভোগ করিয়ে পুনরায় খাঁটি করেন এবং সোজা পথে নিয়ে আসেন। জীবকে কষ্ট দেওয়া এও তাঁর পরম দয়ার পরিচয়। সেইজন্যে মানুষ মাত্রেরই বোঝা উচিত যে সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান বস্তু। সুতরাং কোন অন্যায় কাজ করে কষ্ট ভোগ করার চেয়ে তা না করাই ভাল। গায়ে কাদা মেখে তা পরিষ্কার করার জন্যে গা ধোয়া অপেক্ষা কাদা না মাখাই ভাল। সকলকেই একথা স্বীকার করতে হবে।

উপাসনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। এ যখন বেশ বিবেচনা করে স্থির সিদ্ধান্ত হবে এবং মনের সঙ্গে পাকা বিশ্বাস হবে তখন প্রথমে আসনের দরকার। আসন অনেক রকমের। তার মধ্যে সংসারী জীবের পক্ষে যা উপযুক্ত তাই সকলের জানা উচিত। সেজন্যে এখানে কেবল তাই বলা হবে।

এবার স্বামিজী আসনের কথা প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, প্রথমে কুশাসন! তার ওপর কম্বলাসন। এই দুই আসনের ওপর বস্ত্রাসন ওপর ওপর পেতে সাধক তার ওপর উত্তর মুখে নির্জন ও প্রশস্ত ঘরে শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সমভাবে রাখবে এবং দক্ষিণ জানু ও উরুর মধ্যে বাম পদতল আর বাম জানু ও উরুর মধ্যে দক্ষিণ পদতল স্থাপন করে

সরলভাবে উপবেশন করবে। তারপর নয়ন মুদ্রিত করে নাসিকাগ্র অর্থাৎ দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থাপন কবে শান্ত ও স্থিরভাবে মনে মনে গুরুদত্ত বীজ মন্ত্র জপ করবে। এতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ নেই। প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রতিদিন দু'বার আধ ঘণ্টা পরিমাণ সময় নিশ্চিন্ত মনে বসতে হবে যতদিন না আলোক দর্শন হয়। ক্রমে সময় বাড়াতে হবে। মন স্থির করবার এর চেয়ে আর কোন প্রকার সোজা পথ নেই। মন বড়ই চঞ্চল। বাইরে গেলেই পুনরায় তাকে ধরে আনবে ও কাজে লাগাবে। কিছু দিন এই রকম করতে করতে মন ক্রমে ক্রমে আপন বশে আসবে। মন দিয়ে মনকে বশ করবে। আমি পারবো না, আমার হবে না। ভুলক্রমেও এ-ভাব মনে কববে না। তাহলে কোন ফল হবে না। সর্বদা মনে করবে আমার এই প্রধান কাজ। এই কাজ আমাকে করতেই হবে। যতদিন না হবে ছাড়বো না। এই প্রকার দৃঢ় হলে কাজ করলে তবে নিশ্চয় ফল পাওয়া যায়। মন স্থির না হলে কোনরকম সাধনা হতে পারে না। মন স্থির হলে আর আসনের দরকার করে না।

উপাসনা প্রসঙ্গে আরও বললেন, বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দেহ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়সকল হতে বিভিন্ন চিৎ স্বরূপ আত্মা আছেন এ নিশ্চয় জানবে। সেই আত্মাই ঈশ্বর। তিনি নিরাকার, নির্মল, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিবর্জিত। । তিনি চিন্ময়, আনন্দময়, অশরীরী, পূর্ণ, জ্যোতির্ময়, নিত্য এবং শুদ্ধ জ্ঞানাদিময়, সর্ব দেহগত সর্বাতীত। একাগ্রচিত্তে আত্মাকে নিত্য এই প্রকার চিন্তা করবে। কেউ কেউ নাস্তিক হয়ে আহ্লাদের সঙ্গে বলেন, ঈশ্বর নেই। স্বভাব হতে সমস্ত হচ্ছে। তাঁদের মত মূর্খ ও অজ্ঞানী জগতে আর নেই।

যদি ঈশ্বর এক মুহূর্তের জন্যে দেহছাড়া হন তখনই নয়ন মুদ্রিত করে এ জীবনের লীলা সমাপ্ত করতে হবে।

আজকাল কোন কোন মানুষের মধ্যে ধর্ম পিপাসা জন্মেছে বটে কিন্তু তারা পরিশ্রম করতে নারাজ। দু'চারদিন চোখ বুজিয়ে বসে

যদি কিছু না পান তাহলে অমনি বুঝলেন সবই মিথ্যে। বৃথা পরিশ্রম করে ফল নেই।

উইল ফোরস্ (will force) করে যদি কেউ খানিকটা ঈশ্বর তাদের পেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন তবে তাদের বিশ্বাস হয়। তাদের বিশ্বাস হোক বা না হোক জগতের তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। পতিত জমিতে বন ও জঙ্গল আপনিই হয়ে থাকে। সেই সব লোকের নিকট হতে তফাতে থাকা উচিত। যখন তাঁদের ঘুম ভাঙবে তখন নিজেই সোজা পথে আসবেন।

প্রথমত অরুণের মত জ্যোতি ও সেই সঙ্গে জ্ঞান উদয় হয়ে অজ্ঞান অন্ধকারকে হরণ করে।

পরে আত্মা সূর্যের মত প্রকাশিত হন।

যে রকম ভ্রান্তি জ্ঞানে মুড়ো গাছকে মানুষ বলে মনে হয় তেমনি ভ্রান্তির দ্বারা ব্রহ্মকে জীব বলে বোধ হয়।

ঐ ভ্রান্তি নাশ হলে জীবের যথার্থ স্বরূপ দৃষ্ট হয় এবং জীবত্ব ব্যবহার নিবৃত্তি হয়। যেমন যথার্থ জ্ঞান হলে দিক্‌ভ্রম নষ্ট হয়।

চিত্তের উন্নতি সাধন করতে হলে কি করা উচিত?

মানুষের উন্নত দশার চরম আদর্শস্বরূপ কোন মহাপুরুষের আদর্শ চিন্তা দ্বারা সেই আদর্শকে সর্বদা অন্তরের সামনে ধারণ করে সেই আদর্শ অনুযায়ী উন্নত হবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের মন বড় অস্থির। কোন আদর্শ চরিত্র মনের মাঝে সদা সর্বদা ধরে রাখা বড় সহজ কথা নয়। সেই আদর্শ পুরুষের সঙ্গে আমাদের মনকে কোন বন্ধনে বদ্ধ করে রাখা উচিত।

মহাপুরুষের সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় করতে হলে দৃঢ় ভক্তির প্রয়োজন। এই কারণে ভক্তি ছাড়া ঈশ্বর উপাসনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

সম্পূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্ট যোগী জ্ঞানচক্ষু দিয়ে নিজের আত্মাতে সমস্ত জগৎকে এবং সেই এক আত্মাকে সমস্ত জগৎস্বরূপে দেখেন। এই সমস্ত জগৎই আত্মা ভিন্ন কোন বস্তু নেই। যেরকম সমস্ত পট, কলসী, হাঁড়ি, গামলা ইত্যাদি বস্তুসকলই কেবল মৃত্তিকামাত্র। মৃত্তিকা

ছাড়া ঘটাদি কোন বস্তুই নেই। তেমনি জ্ঞানী লোক নিজের আত্মাকেই সমস্ত দেখেন। জ্ঞানী ব্যক্তি বাহ্য অনিত্য সুখে আসক্তি পরিত্যাগ করে আত্মসুখে পরিপূর্ণ হয়ে ঘটের মধ্যস্থিত দীপের মত নির্মলরূপে অন্তরেই প্রকাশ পান! আর মৌনী হয়ে বিচরণ করেন। যেমন বায়ু সর্বত্রগামী হয়েও কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না।

সেই মৌনী পুরুষ উপাধির বিনাশ হলে সর্বব্যাপী পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন যে প্রকার জলে জল, তেজে তেজ, আকাশে আকাশ মিলিত হয়।

যে প্রকাব কাঁচপোকা তেলাপোকাকে ধরলে, তেলাপোকা কাঁচপোকাকে অবিশ্রান্ত চিন্তা করতে করতে নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ করে কাঁচপোকার স্বরূপ ধারণ করে সেই প্রকার আত্মজ্ঞ ব্যক্তি আত্মার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ চিন্তা করতে করতে নিজের পূর্বস্থিত যে উপাধি ও গুণসকল পরিত্যাগ করে স্বকীয় সচ্চিদানন্দ ভাব প্রাপ্ত হন। এমন ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা হয়।

সেই জ্যোতির্ময়, পরমব্রহ্ম, আনন্দময়ের আনন্দের কথা মাত্রে আশ্রিত হয়ে ব্রহ্ম হতে ক্ষুদ্র জীব পর্যন্ত সকলেই তারতম্যরূপে আহ্লাদিত হয়েছে।

যে প্রকার দুগ্ধমাত্রেই ঘৃত আছে সেই প্রকার সকল বস্তুই ব্রহ্মেতে অন্বিত। সুতরাং সাংসারিক ব্যবহারও তা থেকে আলাদা নয়।

জীব শ্রবণ, মনন, অজ্ঞান ও কুবাসনা দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট। তাকে বিষয় হতে আকর্ষণ করে আত্মাতে স্থায়ীকরণ দ্বারা উদ্দীপ্ত এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা পরিতাপিত করলে, সমস্ত উপাধিমালিন্য হতে মুক্ত হয়ে স্বয়ং আত্মা সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়।

সর্বব্যাপী ও সকলের আধাব যে আত্মা, হৃদাকাশাদি হতে জ্ঞান সূর্যরূপ উদিত হয়ে অজ্ঞান তমঃকে হরণ করে সমস্ত বস্তু প্রকাশ করেন।

যে ব্যক্তি বিশেষরূপে নিষ্ক্রিয়, দিগ্‌দেশ কালাদির অপেক্ষা রহিত,

শীত উষ্ণাদির বিনাশক, সর্বব্যাপী এক নিত্য সুখস্বরূপ নিজের আত্মা-তীর্থকে ভজনা করেন, তিনি সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ ও অমৃত হন।

ধর্ম হতে ভক্তি, ভক্তি হতে জ্ঞান, জ্ঞান হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

ঈশ্বরে মনপ্রাণ অর্পণ করাই ধর্ম। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি ধর্মের জন্যে একূপ আশ্রয় করবে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই সর্বময়। দেবগণের দেহও তাঁরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ।

মুমূক্ষু ব্যক্তি বিধিবিহিত কর্ম এভাবে অনুষ্ঠান করে, চিত্তশুদ্ধি হলে, সতত আত্মজ্ঞানে উদ্যোগী হবে।

কামাদি ষড়বর্গ পরিত্যাগ করবে এবং হিংসা একেবারে পরিত্যাগ করতে হবে। এরা ধর্মপথের ভয়ানক অনিষ্টকর বলে জানবে।

যারা যত্নবান হয়ে এ করতে পারবে তাদের তত্ত্বজ্ঞান হবে সন্দেহ নেই।

তত্ত্বজ্ঞান হলে আত্মপ্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। আত্মপ্রত্যক্ষ হলেই মুক্তিলাভ হয়।

মনসংযমই সাধনার প্রধান লক্ষণ। বাহ্যবিষয়ে যিনি আসক্তিশূন্য এবং অন্তরে যিনি পরমানন্দ ভোগ করেন তিনি ব্রহ্মসংযুক্ত হয়ে অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। প্রজাপালক, প্রজারঞ্জক রাজা ও রণজয়ী যোদ্ধা অপেক্ষাও যিনি মনকে বশীভূত করেছেন তিনিই মহাপুরুষ। সন্তরণ দ্বারা সমুদ্র পার হওয়া সম্ভব কিন্তু মন জয় করা বড়ই শক্ত। মন জয় করা সহজ হতে পারে যদি ভক্তি, বিশ্বাস ও দৃঢ়তা সহকারে কাজ করা হয়।

দয়াই সাধনার মূল ভিত্তি আর অভিমান নরকের প্রশস্ত পথ।

যে ব্যক্তি অহঙ্কারশূন্য, ক্ষমাহীন, সুখদুঃখে সমভাব, সর্বদা সন্তোষ-যুক্ত, যিনি ভগবানে মন, বুদ্ধি অর্পণ করেছেন, যিনি কাউকেও সন্তাপ প্রদান করেন না, যিনি ক্রোধ ও ভয় হতে বিমুক্ত; যিনি আকাঙ্খা-শূন্য, যিনি হর্ষে সন্তুষ্ট ও বিষাদে ক্লেশযুক্ত নন, যিনি পাপশূন্য পরিশূন্য, যিনি শত্রু মিত্র মানঅপমান সকলেই সমভাব, যার নিন্দা ও স্তুতি সমান জ্ঞান, শরীর রক্ষার্থ যা কিছু সংস্থান তাতেই সন্তুষ্ট, যিনি

ঈশ্বরপরায়ণ শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তিপরায়ণ, তিনিই ঈশ্বরকে পাবেন আর তাঁর মুক্তি নিশ্চয়।

অন্য সকল সাধনা অপেক্ষা কেবল জ্ঞানই মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ কারণ। যেমন অগ্নি ছাড়া পাক সম্পাদন হয় না।

পরিচ্ছন্ন আত্মাকে অজ্ঞানবশত অপরিচ্ছন্ন মনে হয়। যদি অজ্ঞানের নাশ হয় তবে কেবলমাত্র আত্মাই স্বয়ং প্রকাশিত হন। যে প্রকার মেঘের বিনাশ হলে সূর্য স্বয়ং প্রকাশিত হন।

অজ্ঞানরূপ মালিন্যযুক্ত যে জীব, তাকে জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা নির্মল করে জ্ঞান স্বয়ং নষ্ট হয়। যে প্রকার নির্মাল্য ফল জলকে নির্মল করে স্বয়ং নষ্ট হয়। যে প্রকার স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্ন দৃশ্য বস্তু সকল সত্যের মত প্রকাশ পায় এবং জাগ্রত অবস্থায় তা মিথ্যে বলে বোধ হয়, সেই প্রকার রাগদ্বেষাদি সঙ্কুল এই সংসার স্বপ্নের মত অজ্ঞান অবস্থায় সত্য বোধ হয় এবং অজ্ঞান বিনাশ হলে তা মিথ্যে বলে প্রতীত হয়।

ঈশ্বর কেবল নিরাকার নন, তিনি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং ভক্তি, দয়া ইত্যাদি গুণের অতীত। আজকাল যাঁরা নিরাকার উপাসনা করেন তাঁরা নিজেরাই বলতে পারেন না যে ঠিক উপাসনা হচ্ছে কিনা। তাঁদের ভক্তিবৃত্তির চর্চার কিছু মানসিক উপকার হবে; আসল ফলে এর বেশি কিছু হবে না।

যখন বুঝবো নিরাকার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্যে ভক্তি ও মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্যে কোন সাকার পদার্থের অবলম্বন ব্যতীত সেই সকল বৃত্তির স্ফুরণের ইচ্ছে করি তখন তাই নিরাকারের নিরাকার উপাসনা।

ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবার জন্যে কোন সাকার চিন্তার রূপ অবলম্বন করলে তাকে সাকার উপাসনা বলে। আর সাকার চিন্তা ছাড়া জগৎব্যাপী ঈশ্বরের মহিমা, শক্তি, গুণ ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করাই নিরাকার উপাসনা হতে পারে না।

উপাসনা ক'রকম?

উপাসনা চার রকম। প্রথম ঈশ্বর উপাসনা। দ্বিতীয় দেবদেবীর

উপাসনা। তৃতীয় শক্তিশালী পদার্থের উপাসনা, যেমন সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি। চতুর্থ ধার্মিক মানুষের উপাসনা।

গাভীর উপাসনা, বৃক্ষের উপাসনা, নদী বা গঙ্গার উপাসনা, শস্যের উপাসনা ইত্যাদিও এক জাতীয় উপাসনা।

এই উপাসনার বশবর্তী হয়ে হিন্দু সূত্রধর বাইশ বাটালি পূজো করে। কর্মকার হাতুড়ি নেহাই পূজো করে। কুম্ভকার চারু পূজো করে। ব্রাহ্মণ পুঁথি পূজো করে।

উপাসনার সময় অচেতন উপাস্যকে সচেতন মনে করে উপাসনা করা যেতে পারে।

আদিম মানুষ তাই করে থাকে।

অন্য রকম উপাসনায় অচেতনকে অচেতন বলে জ্ঞান থাকে। এই জাতীয় উপাসনাকে জড় উপাসনা বলে। এ অহিতকর নয়। কারণ এর দ্বাবা কতকগুলি চিত্তবৃত্তির স্ফূর্তি সাধিত হয়।

ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না। তবে তাঁকে আমরা জানতে পারি তাঁর কাজ দেখে, তাঁর শক্তি দেখে ও তাঁর দয়ার পবিচয় পেয়ে।

সাকার বা দেবদেবী ছাড়া যে উপাসনা তা কেবল পত্রহীন বৃক্ষের মত অঙ্গহীন উপাসনা।

হিন্দুধর্মে যে প্রকার উপাসনা পদ্ধতি আছে তা বেশ ভালরূপ বুঝে দেখলে তা হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ বলে জানা যায়।

দুর্ভাগ্যবশত ক্রমে হিন্দুধর্মের বিকৃতি ঘটেছে। হিন্দুধর্মে যে কেবল একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নেই, এর অনেক প্রমাণ আছে। হিন্দুধর্মে যে সার কথা এবং উচ্চ ও উদার ভাব আছে তা আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর বিশ্বরূপ। যেখানে তাঁর রূপ দেখা যায় সেখানে তাঁর পূজো করা হয়।

যে প্রণালী দ্বারা সেই অজ্ঞান অন্ধকার হতে মুক্ত হওয়া যায়, সেই প্রণালী অবলম্বনই প্রকৃত ঈশ্বর উপাসনা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্তরে অনুভব করার নাম ঈশ্বর উপাসনা। যার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ, উন্নত, ও নির্মল হয় তারই নাম ঈশ্বর উপাসনা। যেমন অপরিস্কৃত দর্পণে

কোন প্রতিবিম্ব স্পষ্ট পড়তে পায় না তেমনি চিত্ত নির্মল না হলে ঈশ্বরের জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয় না।

যদি চিত্তের নির্মলতা সম্পাদনের জন্যে কেউ কোন দেবদেবী রূপ সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্য অবলম্বন করেন তবে সেই দেবদেবী আরাধনাকেও ঈশ্বর উপাসনা বলতে হবে।

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ঈশ্বরকে নিরাকার, নির্গুণ, বিশ্বব্যাপী, অনাদি, অনন্ত, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, শুদ্ধ, জরারহিত, অমর, শান্ত, নির্মল, অন্তর্যামী, বিশ্বকর্তা, বিশ্ববেত্তা, আত্মার জন্মস্থান, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ও উদ্ধারের কারণ বলে প্রকাশ করেছেন এবং তিনি বাক্য ও মনের অগোচর।

এর অর্থ ভালভাবে বোঝা উচিত।

প্রথম নিরাকার শব্দটিতে কি অর্থ বোঝায়। রূপ ও আকার এই দুই শব্দ অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

দ্রব্যের বর্ণগুণকে রূপ বলে। যা দ্রব্যের আকার তাও রূপ।

অনেকে ভাবে, যা আমাদের চক্ষুর অগোচর তার কোন আকার নেই। অনেকে দ্রব্যের আকারকে চক্ষুইন্দ্রিয়ের বিষয় বলে মনে করেন।

বায়ু চক্ষুর অগোচর কিন্তু বায়ুরও আকার আছে। শব্দ, গন্ধ, অতি ছোট ছোট কীট যা জলে থাকে, এই সকল চক্ষুর অগোচর হলেও এদের আকার আছে।

কেবল মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বললে তাঁর উপাসনা করা হয় না। উপাসনা করবার আগে ঈশ্বর কথাটির প্রকৃত অর্থ কি, তা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

এই যে বিশ্বব্যাপী জগৎ যা এক শক্তির দ্বারা চালিত হচ্ছে তাই ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, জগতে যত রকম শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, তাই ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি এবং এই শক্তিই চৈতন্য শক্তি বলে জানবে। যিনি তাঁর নিজ শক্তি এই শক্তির সঙ্গে এক তানে মেলাতে পারেন তিনি ঈশ্বর কি তা বেশ বুঝতে ও জানতে পারেন। এই সমস্ত জগতের সমষ্টিভাবই ঈশ্বর। এ স্পষ্ট বুঝলে ঈশ্বর নিরাকার,

নির্গুণ, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তিনি বিশ্বরূপ ও অনন্ত এই সকল শব্দগুলির অর্থ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ঈশ্বরকে তাঁর শক্তির বিষয়, ভক্তিভাবে আলোচনা করলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত জানতে পারা যায়।

সৃষ্টিকর্তাকে জানতে হলে সৃষ্টির বিষয় অধ্যয়ন এবং ভাব গ্রহণ প্রয়োজন।

প্রলয়কর্তাকে জানতে হলে প্রলয়তত্ত্ব বুঝতে হবে।

আর পালনকর্তাকে জানতে হলে পালনতত্ত্ব বুঝতে হবে।

সংহার কর্তা বিষয়ক জ্ঞান যে ঐশ্বরিক এক শক্তির বিষয় এ বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। সেই অনাদি কারণের, আগ্রহচিত্তে স্বরূপ জানবার চেষ্টাই তাঁর উপাসনা। যদি ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভ বাসনা না থাকে তবে নিজের জন্যে মন্দিরে অথবা দেবালয়ে বসে প্রার্থনা কর বা কোন দেবদেবীর ভজনা করো তা ঈশ্বর উপাসনা নয়।

কালিকা দেবীর অসীম ক্ষমতা। ভক্তিভাবে তাঁর উপাসনা করলে ঐহিক পারত্রিক অনেক ফল লাভ হয়। সেই বিশ্বাসে যদি কালিকা দেবীর মূর্তি সামনে রেখে কালীর উপাসনা কর, তবে তা কালিকা-দেবীর উপাসনা করা হলো। কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা করা হলো না।

যদি কোন সাকার পদার্থকে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান করে ভক্তিভাবে উপাসনা করা যায় তাহলে তা ঈশ্বর উপাসনা করা হলো।

কোন সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করলে, ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করা হয় এবং উপাসক ভ্রান্ত পথের পথিক হন।

যদি আমি কালিকাদেবীর রূপকে ঈশ্বরের রূপ জ্ঞান করি এবং যখন কালীরূপ অন্তরে অনুভব করতে পারবো তখনই আমি ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝেছি এটি বুঝতে হবে।

এরূপ উপাসনায় কোন ফল নেই তা কেউ বলতে পারবেন না।

তবে এই প্রকার সাকার উপাসনা দ্বারা নিরাকার, সর্বব্যাপী, নির্গুণ ঈশ্বরের মহিমা বুঝতে পারা যায় না।

মানুষের কর্মের ফলদাতা শক্তির নামই দেবদেবী। দেবদেবীগণ অনিত্য সুখেব প্রলোভনে মানুষকে মুগ্ধ করে রাখেন।

সেই জন্যে মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে ঘোর অন্ধকারে পড়ে থাকে।

যতদিন সামান্য অনিত্য সুখের কামনা মনুষ্যহৃদয়ে প্রবল থাকবে ততদিন তিনি নিত্য সুখদাতা ঈশ্বর যে কি পদার্থ তা জানতে পারবেন না।

ভগবানকে পাবো বা দেখবো এই আশা করলে প্রথমেই কামনা ত্যাগ করা চাই। সকাম কর্মই দেবদেবীর উপাসনা আর নিষ্কাম কর্মই ঈশ্বব উপাসনা। যেসব অজ্ঞান ব্যক্তি মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত বিগ্রহকে ঈশ্বর মনে করেন তাঁরা কেবল ভ্রমণে পতিত হয়ে থাকেন। কল্পিত মূর্তি যদি ঈশ্বর হন তাহলে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যপ্রাপ্তিও সম্ভব হতে পারে। ঈশ্বরকে আমরা সহজে জানতে পারি না। সেই কারণে অজ্ঞানবশত তাঁর স্বরূপ নির্মাণ কবে তা পুজার্অচনা করে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।

এই মূর্তি তাঁর শক্তি বা স্বরূপ বলে জানতে হবে। কিন্তু ঐ মূর্তি কখন ঈশ্বর হতে পারেন না। তাঁর শক্তি সকল স্থানেই বিদ্যমান আছে।

মানুষের কর্মই শুভাশুভ ফল প্রদান করে থাকে। এই কর্মাত্মক শক্তিই দেবদেবী জানবে।

বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্ম, সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ, আর যোগ শাস্ত্রের নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা গন্তব্য পথে যেতে হয়। সেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ছাড়া নিত্য সুখ এবং নির্বাণ মুক্তি পাওয়া যায় না।

দেবদেবীর উপাসনা দ্বারা ভোগ ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং সেই জন্যে সমাধি সুখে বঞ্চিত থাকতে হয়।

একাগ্রচিত্তে যে যেরূপ কামনা করে তার একাগ্রতার জন্যে সে সেই কামনানুযায়ী শক্তির সাহায্য পায়। ভোগৈশ্বর্য কামনা থাকলে ভোগ ঐশ্বর্য ফলদাতা শক্তি অর্থাৎ দেবদেবীর সাহায্য পাবে। আর যদি নিষ্কাম হয় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া অন্য কোন কামনা না থাকে তবে নির্গুণ নিরাকার শক্তির সাহায্য পাবে।

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সকাম কর্মই দেবদেবীর উপাসনা আর নিষ্কাম কর্মই ঈশ্বর উপাসনা।

ব্রহ্মজ্ঞান পিপাসু হয়ে সাকার উপাসনা এবং ভোগ ঐশ্বর্য কামনা-রহিত হয়ে করলে যথার্থ ঈশ্বর উপাসনা করা হয়।

এখন কর্ম কি? কর্ম কথাটিতে কি অর্থ বোঝায়? যা করা যায় তারই নাম কর্ম।

কর্ম দু' রকম—স্থূল ও সূক্ষ্ম।

আমি কোলকাতায় যাবো মনে করে সেখানে গেলুম। এটা স্থূল জাতীয় কর্ম। দৈহিক অঙ্গ চালনা শক্তির ব্যয় করা হলো।

আর কোলকাতায় যাবো বলে গেলুম না এটা সূক্ষ্ম জাতীয় কর্ম। কারণ এতে কেবল মানসিক শক্তির ব্যয় করা হলো।

চিত্তের একাগ্রতায় কর্মরূপে যে বীজ উৎপন্ন হয় তা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

বেদের কর্মকাণ্ড যা, দেবদেবীর উপাসনা তাই।

ঈশ্বর নিষ্কাম। সুতরাং তুমিও নিষ্কাম। সেই কারণে কামনা-শূন্য হয়ে উপাসনা করলে তবে ঈশ্বরকে পাবে। কামনা ও আশা থাকতে তাঁকে পাবার আশা নেই।

হিন্দুমাত্রেই ঈশ্বরের কাছে মোক্ষ ছাড়া আর কিছুই প্রার্থনা করেন না।

নিত্য পদার্থ ঈশ্বর নিত্য ফল মোক্ষ সুখ ছাড়া অন্য ফল প্রদান করতে জানেন না।

আর ঈশ্বর জগৎ রচয়িতা। তিনি অদ্বিতীয়, দয়াময়, সর্বশক্তি-মান, অচিন্ত্য, অব্যক্ত এই প্রকার কথাগুলি বলতে পারলেই যে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মেছে বলতে হবে তা কখনই নয়।

রাগ দ্বেষাদি দোষ হতে শুভাশুভ কর্মের উৎপত্তি। সেই কর্ম হতে সংসার।

অতএব অবিদ্যা পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

কেউ অপকার করলে অপকৃত ব্যক্তি প্রথমেই বিচার করবে কার

অপকার করলো। এই বিষয়টি বিচারিত হলে আর দ্বেষই হতে পারে না।

আত্মাকে ছেড়ে দিলে পঞ্চভূতময় দেহ ত জড় পদার্থমাত্র। জ্ঞানচৈতন্য কিছুই নেই। তখন অগ্নিদগ্ধ হোক আব শৃগালাদি কর্তৃক ভক্ষিতই হোক যে নিজে কিছুই জানতে পারে না তার সেই জড় দেহের আবার অপমান কি?

আমার আত্মার সঙ্গে জগতের আত্মার একতানে মিলন করাই যোগ। এই প্রকার যোগযুক্ত আত্মাই আপনাকে সর্বভূতস্থ জ্ঞান করে থাকেন। জনতা হতে কোন প্রকাব গোলমাল হলে প্রত্যেকের আলাদা শব্দ শোনা যায় না। কেবল হো হো একটি শব্দ শোনা যায়। তার নামই যোগ। যেমন অনেকগুলি সুর একতানে মিলিয়ে বাজালে শ্রোতৃগণ কেবল একটিমাত্র শব্দ শুনতে পান সেই সুরই যোগ। তেমনি এই সমস্ত জগতেব ভিন্ন ভিন্ন ভূতেব চৈতন্য, যিনি অনুভব করতে পারেন তিনিই জানতে পারেন চৈতন্য অথবা যোগ কি রকম।

এই চৈতন্যই জগতের আত্মা।

উপাসনা দ্বারা উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে 'সোহং' সেই আমি এই জ্ঞান যাতে জন্মায় তিনিই ঠিক বুঝতে পারেন আমি কে।

আমার সঙ্গে আমার হস্তপদাদির ও মনের সঙ্গে একটি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আর তা অনুভব করতে পারি বলে আমার হস্তপদাদি ও মনে অহং জ্ঞান জন্মেছে।

মানুষ যতই উন্নত হতে থাকবে ততই স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে আমাব সঙ্গে সমস্ত বিশ্বের ঠিক এই প্রকাব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

অনুভব শক্তির বিকাশে মানুষ সেই সম্বন্ধ স্পষ্ট অনুভব করতে পারবে।

নিজের অহং জ্ঞানের সঙ্গে এই জগতের যোগই প্রকৃত যোগ।

যেসব ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বরিক শক্তিতে জগৎ চলছে, সেই সব শক্তির ক্রিয়া মানুষ চেষ্টা করলে আপনাতেই সমস্ত দেখতে পান।

এই কারণে মানুষকে বলা হয় ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড।

তৈলঙ্গস্বামী এবার 'পূর্বজন্ম ও পরজন্ম' প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, পূর্বজন্ম ও পরজন্ম বা পরকাল আছে কি না তা জানবার ইচ্ছে হলে স্থিরচিত্তে বেশ বিবেচনা করে দেখলেই পূর্বজন্ম, বর্তমান জন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্ম এই তিন জন্ম স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

পূর্ব জন্মে আমি যে প্রকার কাজ করেছি আর যে প্রকার স্বভাবের লোক ছিলুম মৃত্যুর পর কর্মফল অনুসারে সেই সকল পরমাণু নিয়ে এই বর্তমান দেহ তৈরী হয়েছে।

বর্তমান জীবনে আমি নিজে ভালোমন্দ কাজ যা কিছু করেছি, তা সবই আমি বেশ জানি। ভাল কাজ করলে ভাল ফল আর মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল ভোগ করতে হয়। তা সকলকেই স্বীকার করতে হবে।

এখন যিনি বিচার করে দেখবেন তিনিই জানতে পারবেন যে বর্তমান জীবনে আমি কি প্রকার লোক তৈরী হচ্ছি আর আমার এইসব কর্ম অনুসারে ভবিষ্যৎ জীবনে কি প্রকার স্বভাব ও কি প্রকার অবস্থার লোক হবো।

যা চেষ্টা করলে নিজে জানা যায় তা জানবার জন্যে পরের সাহায্য দরকার করে না।

বর্তমান জন্মের যেটি ইহলোক তাই পূর্ব জন্মের পরলোক। আর বর্তমান জন্মের পরলোকই ভবিষ্যৎ জন্মের ইহলোক।

এই স্থূল দেহের ভেতর অন্য দেহ আছে। তার নাম সূক্ষ্ম দেহ। আর তার ভেতরেও আর এক দেহ আছে। তার নাম কারণ দেহ।

কদলী ত্বকের মত অবস্থিত এই তিন প্রকার দেহই সংসার সংজ্ঞায় বিরাজমান।

মানবদেহের গঠন, আকৃতি, বর্ণ, স্বভাব, সুশ্রী বা কদাকার, বিদ্বান অথবা মূর্খ, কর্কশ বা নম্র, ধার্মিক বা অধার্মিক, সাধু অথবা চোর, সরল

বা কুটিল, রাজা অথবা জমিদার, মধ্যবিত্ত অথবা গরীব, উচ্চ বংশে জন্ম অথবা নীচ বংশে জন্ম এই সমস্তই পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে এই বর্তমান দেহ তৈরী হয়েছে।

সেইরকম পুনরায় ইহজীবনের কর্মফল নিয়ে পরজন্মের দেহের আকৃতি হবে।

জীব ভূমিষ্ঠ হতে লয় পর্যন্ত যে সময় তাই তার পরমায়ু। যদি আধ্যাত্মিক অর্থে ধরা যায় তবে জীবের পরমায়ু অনন্ত, জীব অক্ষয় ও অমর। জীব ধ্বংস হলেও তার উপকরণ কখনই নষ্ট হয় না। বাস্তবিক জীবের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময় সে জীবিত থাকে সেই সময়টুকুই তার পরমায়ু।

সাধারণের বিশ্বাস যে জীব যত পুণ্যবান, তার পরমায়ুও তত অধিক। সে ততদিন জীবিত থাকে। কিন্তু তা ভুল।

সংসার হতে জীব যত দূরে থাকবে পাপ তাকে তত স্পর্শ করতে পারবে না। জীব কর্মফল ভোগ করবার জন্যে সংসারে আসে। কারণ সংসারই হচ্ছে কর্মফল ভোগ করবার জায়গা। যে পুণ্যবান সে কখন কর্মফল ভোগ করে না। সুতরাং যতদিন জীবের কর্মফল ভোগ শেষ না হয়, যতদিন জীব পাপ হতে মুক্ত না হয়, ততদিন তাকে সংসারে থাকতে হয়। যে পুণ্যবান সে অধিকদিন সংসারবাসী হয় না। যে যত পাপী সে ততদিন সংসারে থেকে কর্মফল ভোগ করতে থাকে। যার কর্মফল শেষ হয় সে সংসার হতে অপসৃত হয়।

যার জীবন যত তাড়াতাড়ি লয়প্রাপ্ত হয় সে তত পুণ্যবান। তার জীবন তত পাপশূন্য।

পাপশূন্য হলেই ঈশ্বরে লয় পায়।

তখন তার আয়ু অসীম।

যতদিন ঈশ্বরের সত্তা বর্তমান থাকবে ততদিন তার সত্তা বর্তমান থাকবে।

মানুষ যেমন পর পর পাপপুণ্য করে থাকে তার ফলভোগও দিনরাত্রির মত পর পর হয়ে থাকে।

সেইজন্যে কর্মফল শেষ না হলে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসতে হয়।

এই যে পঞ্চভূতের পুতুল মানুষ, মৃত্যুর পর কি কোন জায়গায় যায়, কি মৃত্যুই মানুষের শেষ?

ইংরেজরা বলেন মানুষের কর্মফল ইহজন্মেই ভোগ হয় আর মৃত্যুই শেষ।

এ যে সম্পূর্ণ ভুল তা আর কাকেও বোঝাতে হবে না।

ঈশ্বর আছেন স্বীকার করলেই পরজন্ম আছে তা অবশ্যই মানতে হবে। যদি ঈশ্বর থাকেন তবে মানুষের আত্মা আছেই। ঈশ্বরের ধ্বংস নেই। সুতরাং ঈশ্বরের শক্তি আত্মারও বিনাশ নেই।

যদি পরজন্ম না থাকে তবে ঈশ্বরকে দয়াময় কখনো বলা যেতে পারে না। কারণ এই জীবনে কেউ রাজা, কেউ প্রজা। কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ অন্ধ, কেউ খঞ্জ, কেউ ভদ্র বংশে, কেউ নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করে কেন?

এর স্পষ্ট প্রমাণ পূর্বজন্মে যে যে প্রকার কাজ করেছে তার ভোগ শেষ না হওয়াতে জীব কর্মফল অনুসারে পুনরায় দেহ ধারণ করেছে।

যে জন্মান্ধ সে এই জীবনে কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু আর সকলে বেশ দেখতে পাচ্ছেন।

এর কি কোন কারণ নেই?

বোধ হয় কেউই অস্বীকার করবেন না যে এ পূর্বজন্মের পাপের ফল ভোগ হচ্ছে।

এই জীবনের দেহ, আকৃতি, গঠন, স্বভাব, জ্ঞান, ইত্যাদি সবই জানবে পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে ঠিক সেই প্রকার গঠিত হয়েছে।

যে যে প্রকার কর্ম করেছে তার আকৃতি স্বভাব ঠিক সেই প্রকার হয়েছে।

যে দস্যুবৃত্তি করে জীবন কাটাচ্ছে পরজন্মে তার আকৃতি ও স্বভাব ঠিক দস্যুর মত ও রুক্ষ হবে।

যিনি ধর্ম আলোচনা করে জীবন কাটাচ্ছেন তার আকৃতি সৌম্য ও স্বভাব অতি কোমল হবে।

একজন মানুষ সমস্ত জীবন ধর্ম আলোচনা করে হয়তো সুখী হলো না সংসারে। নানা প্রকার কষ্ট পেল। আর একজন অতি ঘৃণিত কর্ম, লাম্পট্য বা দস্যুবৃত্তি করে হয়তো জীবন বেশ সুখে কাটাল। পূর্বজন্মই এর স্পষ্ট প্রমাণ।

যদিও একটি লোক ধর্ম আলোচনা করে এ জীবনে কষ্ট পেল। এর সুখ একসময় নিশ্চয় ভোগ করবে। আর এই জীবনে যে কষ্ট পেল তা পূর্বজন্মের মন্দ ফল। যা এই ভোগ করবার সময় উপস্থিত বলে কষ্ট ভোগ করলো। আর অপর ব্যক্তির এখন পূর্বজন্মের শুভ ফল ভোগ করবার সময় উপস্থিত বলে সুখে জীবন কাটাল কিন্তু এর পরও তাঁকে মহা কষ্ট ভোগ করতে হবে।

অনেকে বলে থাকেন, পাপকর্ম করার প্রবৃত্তি তাও ঈশ্বরের ইচ্ছে এবং পুণ্য কর্ম করার প্রবৃত্তি তাও ঈশ্বরের ইচ্ছে। এ নিতান্ত অজ্ঞানের কথা।

রিপু ও ইন্দ্রিয়সকল ভাল-মন্দ কাজ করিয়ে থাকে। রাগ করলেই অনিষ্ট হবে। কামনা করলেই প্রাপ্তি ইচ্ছে হবে। লোভ করলেই পরদ্রব্য অপহরণের চেষ্টা হবে। অহঙ্কার হলেই পরের অনিষ্ট চিন্তা হবে ইত্যাদি যার যে ধর্ম সে তার কাজ করে থাকে।

এই জন্যেই মানুষকে হিতাহিত জ্ঞান দিয়েছেন। আর সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করেছেন।

মৃত্যুই কখন শেষ হতে পারে না। তাহলে ঈশ্বরকে প্রতিদিন রাশি রাশি আত্মা সৃজন করতে হয়। মানুষ অপেক্ষা তাঁর কাজ কত বেশী হয় এবং বড় কষ্টের জীবন হয়ে পড়ে।

তিনি যে সর্বশক্তিমান।

দেহ বিচ্ছিন্ন হলেও আত্মার অপকার হয় না যেমন গৃহ দগ্ধ হতে থাকলে গৃহঅভ্যন্তরস্থ আকাশের কিছু ক্ষতি হয় না।

আত্মা হন্তাও হয় না, আত্মা হতও হয় না।

দ্বেষই সন্তাপের মূল। দ্বেষই সংসারের বন্ধন। দ্বেষই মুক্তির প্রতিবন্ধক। অতএব দ্বেষ পরিত্যাগ করবে।

সুখ দুঃখ দেহের নেই, আত্মারও নেই।

আত্মা বায়ুর মত নির্মল ও নির্লোপ। তথাপি ইনি ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত হয়ে আমি সুখী আমি দুঃখী আপনিই এই প্রকার বোধ করেন।

বিশ্বমোহিনী সেই অনাদি অবিদ্যার নামই মায়া। জন্মিবামাত্র জীবের সেই অবিদ্যা অর্থাৎ মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়। তাতেই এই সংসার বন্ধন হয়ে থাকে।

বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সমীপে অবস্থিতির জন্যে আত্মা নির্মল হলেও তত্তৎ পদার্থের সমগুণ সম্পন্ন বলে প্রতীয়মান হন।

মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জীবের সহকারী আপনাদের কৃত কর্মফল আপনাদের ভোগ করতে হয় অর্থাৎ যার যেমন কর্মফল তাকে সেই রকম ভোগ করতে হয়।

পুনরায় সৃষ্টি সময়ে জীবও মন প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে দেহ ধারণ করতে বাধ্য হন।

যত দিন না জীব মুক্ত হয় তত দিন পর্যন্ত তাকে এরূপ ভ্রমণ করতে হয়।

দেহ মনস্তাপের মূল। দেহ সংসারের কারণ। কর্মফল হতেই সেই দেহের উৎপত্তি।

কর্ম দু'রকম।

পাপ ও পুণ্য।

সেই পাপ-পুণ্যের নাশ অনুসারেই দেহীর সুখদুঃখ হয়ে থাকে।

যতটুকু পাপ ততটুকু পুণ্য। যতটুকু পুণ্য ততটুকু সুখ ভোগ করতে হয়। এই সুখ-দুঃখ দিবারাত্রির মত পরস্পর সাপেক্ষ। ভোগ না করলে শেষ হয় না। ভোগ শেষ না হলেও মুক্তি হয় না। আত্মা শরীরের কর্তা। যে বস্তু জীবদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হলে জীবের জীবন থাকে না, ইন্দ্রিয়াদি আর কেউ কাজ করতে পারে না সেই বস্তুই জীবের আত্মা। আত্মাহীন দেহে সুখ-দুঃখ কিছুরই অনুভব হয়

না। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, জ্ঞান কিছুই থাকে না। সুতরাং এটা নিশ্চয়ই যে আত্মাই দেহের কর্তা।

সুখ-দুঃখ জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। আত্মাকে তিরস্কার বা পুরস্কার দিতে হলে সেই আত্মার বাসস্থল দেহের প্রয়োজন।

ক্লেশ ও বিষাদ শরীরের সাহায্য না পেলে আত্মার বোধগম্য হতে পারে না।

আত্মা একাকী চলে যায়। দেহ তার সঙ্গে যায় না। সুতরাং আত্মার শাস্তি অসম্ভব।

প্রত্যেক জীবদেহে ঈশ্বর আত্মারূপে বর্তমান আছেন। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ।

পাপ যেমন অনেক প্রকার তার শাস্তিও তেমনি অনেক প্রকার।

পুণ্যও অনেক প্রকার, হর্ষও অনেক প্রকার।

অনুতাপই পাপের প্রধান দণ্ড।

হর্ষই পুণ্যের প্রধান পুরস্কার।

মানুষের হৃদয় পাপপুণ্য নিরাকরণের তুলাদণ্ড।

পুণ্যে আনন্দ ও পাপে অনুতাপ আপনাহতেই মানুষের হৃদয়ে উদিত হয়ে তার কৃত কর্মের উপযুক্ত পুরস্কার দান করে থাকে।

এই দণ্ড দেখেই যিনি বুদ্ধিমান তিনি নিজেই পাপ হতে অপসৃত হতে শিক্ষা করেন।

পাপ পুণ্যের বিচার ও ফলভোগ এই পৃথিবীতেই হয়ে থাকে।

পঞ্চভূত কেবল পরমাণু সমষ্টিমাত্র। পরমাণু অবিনশ্বর। সুতরাং ভূতসমষ্টিরও বিনাশ নেই। মৃতদেহ পুনরায় সেই পঞ্চভূতেই মিশে যায়।

যে মানুষ আজ তোমার সামনে বিরাজমান তার শরীর পূর্বজন্মে কোন জীবের পরমাণুর দ্বারা নির্মাণ হয়েছে। সুতরাং সেই ভূতপূর্ব জীবের পুনর্জন্মের ফল তোমার সামনের মানুষ।

যে আত্মা যে পরিমাণে পাপ হতে নির্মুক্ত, যে আত্মা যে পরিমাণে বিষয়বাসনাশূন্য সেই পরিমাণে উন্নত। ধার্মিকের আত্মা

পাপাত্মার আত্মা হতে অনেক উন্নত। সেই উন্নতশীল আত্মা দেহ ত্যাগ করলেও তার সেই উন্নত স্বভাব নষ্ট হয় না। বরং সংসারের যাকিছু বাসনা, যা একটু প্রবৃত্তি ছিল তা বন্ধ হয়ে আত্মা ক্রমশ উন্নতির পথে গমন করতে থাকে।

আত্মা পুরুষ এবং দেহ প্রকৃতি।

এই আত্মা যে পর্যন্ত না প্রকৃতিতে সংযুক্ত হয় সেই পর্যন্ত তিনি নিষ্ফল ও নির্গুণ অবস্থায় থাকেন। প্রকৃতির মিলনে তাঁর ইচ্ছে প্রবৃত্তি জন্মিয়ে থাকে এবং প্রকৃতি হতে ভিন্ন হলে পুনরায় তিনি আগের মত স্বভাব অর্থাৎ নির্গুণ ও নির্লিপ্তভাব প্রাপ্ত হন।

এর তাৎপর্য এই যে আত্মার যে পর্যন্ত প্রবৃত্তি বাসনা বর্তমান থাকে সে পর্যন্ত আত্মা পাপ দেহকে আশ্রয় করে থাকেন। সেই পর্যন্ত তিনি সগুণ, সর্ব বিষয়ে লিপ্ত, বাসনাদি সংযুক্ত।

আব দেহ পরিত্যাগ করলে পুনবায় তিনি পূর্বভাব প্রাপ্ত হন।

আত্মা প্রথমে নির্গুণ থাকলেও দেহ আশ্রয় হতেই গুণসম্পন্ন হতে হয়। এবং যে পর্যন্ত তিনি মোক্ষলাভে সমর্থ না হন সে পর্যন্ত পাপের ফল ভোগ করতে হয়।

পশ্বাদি দেহ হতে মনুষ্য দেহ লাভ কবতে হলে প্রকৃতি পরিবর্তনের জন্যে অত্যন্ত কষ্ট ও চেষ্টা করতে হয়। পশু হতে মানুষ হওয়া যত কঠিন মানুষ হয়ে মনুষ্যত্ব লাভ করা তার তুলনায় আরও কঠিন। মানুষ হতে দেবতা হওয়া যত কঠিন, মানুষ হয়ে মনুষ্যত্ব লাভ করা তার তুলনায় আরও কঠিন। শুভ কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভ করতে পারে কিন্তু অনায়াসে প্রকৃত মানুষ হতে পারে না।

সমস্ত ভোগ আশা ত্যাগ করতে না পারলে মুক্তির দ্বার উদ্‌বাটিত হয় না। সকাম শুভ কর্ম সাধন দ্বারা মুক্তির পথ আরও দুর্গম হয়ে ওঠে।

জীব দেবলোকে ঐশ্বর্য ভোগে মত্ত হয়ে ভোগাবসানে মর্তলোকে আসার উপযুক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং মহাপুরুষ কখন দেবধাম কামনা করেন না। কারণ তা কর্মফলের জন্যে চিরস্থায়ী নয়।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করতে হলে ইন্দ্রিয় সকলের বেগ সম্বরণ করতে হয়। রিপুবর্গের বশীকরণ, অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধকরণ, সর্বভূতে সমদর্শন, অভিমানত্যাগ ইত্যাদি মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান উপাদান।

তাছাড়া শমদমাদি অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা এবং উপরতি, শম অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ মনন ছাড়া বিষয় হতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, দম অর্থাৎ শ্রবণাদি ভিন্ন বিষয় হতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীত উষ্ণ সহন, সমাধান অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণাদিতে মনের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরুবাক্য এবং বেদান্তবচনে বিশ্বাস, উপরতি অর্থাৎ মোক্ষের ইচ্ছে, এই কয়েকটি গুণও মানুষের থাকা চাই।

মনুষ্যত্ব লাভ হলেও মুক্তির ইচ্ছে সহজে হয় না। বিষয়ভোগে যত দিন না ক্লেশ উৎপত্তি হয় ততদিন জীব মহাজিতেন্দ্রিয় ও যোগীন্দ্র হলেও মুক্তি লাভ করতে পারে না।

বাসনাত্যাগই মুক্তির প্রধান উপায়।

মুক্তির ইচ্ছে হলেই যে মুক্তিপদ লাভ করবে তা নয়। মহাপুরুষদের সঙ্গে সর্বদা সঙ্গ না করলে মুক্তির পথ দেখাবে কে? সৎপুরুষ সহবাস জীবের সৌভাগ্য সাপেক্ষ। ইচ্ছে করলেই সাধু দর্শন হয় না। সাধুগণ প্রায়ই নির্জন স্থানে থাকেন। কখন দৃষ্টিগোচর হলেও সহজে চিনে নেওয়া যায় না। চিনতে পারলেও কাছে রাখতে চান না। কাছে থাকবার অধিকার পেলেও তাঁদের নির্মল হৃদয়ের ভাব আমরা বুঝতে পারি না। নদী পারের জন্যে যেমন নাবিকের কাছে নৌকো নিতে হয় তেমনি সংসারসাগর পার হবার জন্যে মহাপুরুষ সংসর্গ করে উপায় লাভ করতে হয়। সৎসঙ্গ দ্বারা সমস্তই সুলভ হয়ে পড়ে।

ধার্মিকের আত্মা ধর্মবলে ক্রমশ উন্নত হয়ে অবশেষে মোক্ষ লাভ করে। এই উন্নতি একমাসে বা এক বছরে হয় না। বহুকাল চেষ্টা করলে তবে মোক্ষ লাভ হয়। সেই প্রকার পাপীর আত্মাও ক্রমে অধোগতি লাভ করে। স্বর্গ ও নরকবাস আর কিছুই নয়। কেবল আত্মার উন্নতি ও অবনতিমাত্র। আত্মার উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে

আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্যে তার নানা জায়গায় নানারকম জন্ম হয়ে থাকে। এই বিশাল বিস্তৃত জগতে কে কোথায় কিভাবে পুনর্জন্ম লাভ করলো তার অনুসন্ধান হয় না বলেই পুনর্জন্ম সাধারণে বিশ্বাস করে না।

পুনর্জন্ম ও পরকাল এসব আমরা দেখতে পাই না। পুনর্জন্ম লাভ করেছে এমন কেউ সাক্ষাতে এসে বলে নি। কেবল অনুমান ও যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করে তাতে বিশ্বাস করতে হয়। নচেৎ ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য কিছুরই পার্থক্য থাকে না।

লোকে পাপ করতে ভীত হয় কেন?

কেবল পরকালে বিশ্বাস আছে বলে আর পরকালে ঘোর নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে সেই ভয় থাকার জন্যে পাপ করতে ভয় পায়।

ইহজীবনে কেউ বিদ্বান, কেউ মূর্খ, কেউ পণ্ডিত, কেউ জ্যোতিষী, কেউ উচ্চ অঙ্গের গায়ক, কেউ বাদ্যযন্ত্রে পটু।

এর কারণ কি?

পূর্বজন্মে তারা সেই সেই বিদ্যায় পটু ছিল। ইহ জন্মে সেই আত্মাই আছেন। দেহ মাত্র প্রভেদ। সুতরাং তাদের সেই সকল বিষয় অতি সহজে অভ্যেস হয়। শিখতে আর তত কষ্ট পেতে হয় না।

যদি কর্মফল না থাকতো তবে এত প্রকার অবস্থার ভেদ হতো না।

ভালমন্দ কাজের জন্যেই জীবকে নানা রকম অবস্থায় পড়তে হয়।

ভাল কাজে আত্মার উন্নতি অর্থাৎ উর্দ্ধগতি হয়। মন্দ কাজে আত্মার অধোগতি হয়।

এবার তৈলঙ্গস্বামী 'আত্মবোধ' প্রসঙ্গে বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আত্মবোধ মানে আপনাকে চিনে নেওয়া। আমি যদি আমাকে জানতে পারি তবে আমি ভগবানকেও জানতে পারি। আমি যতদিন না আমাকে জানবো ততদিন ভগবানকে জানবার জন্যে চেষ্টা

করলেও জানতে পারবো না। আমি কি? এ জানতে হলে আত্মা, মন ও বুদ্ধি এই তিন পদার্থের তত্ত্ব জানা দরকার। এক আত্মা শরীরের প্রধান জিনিস বা মালিক অর্থাৎ কর্তা এ নিশ্চয়।

পৃথিবীর সূর্য যেমন কর্তা ও আলো দেওয়াতে জীবসকল সেই আলোকের আশ্রয়ে কাজ করে কিন্তু সূর্য নিজে কিছুই করে না। মনুষ্য শরীরে আত্মাও তেমনি সূর্যের স্বরূপ কর্তা ও আলো দিয়ে থাকেন। সেই আলোর আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণ কাজ করে থাকে কিন্তু আত্মা নিজে কিছু করেন না।

এখন দেখা উচিত আত্মা সাকার কি নিরাকার আর দেহের কোন স্থানে কি ভাবে থাকেন। যাকে আত্মা বলা যায় তা অবশ্যই দেশব্যাপী। কিন্তু তার কোন বিশেষ আকার নেই যার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তোমার আত্মা ও আমার আত্মা একই পদার্থ। যেমন একখানি কাগজের ওপর নানা প্রকার চিত্র আঁকা থাকলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের আধার সেই একমাত্র কাগজ। সেইরূপ এই জগতে সকলের আত্মাই এক। কিছুদিন একমনে আত্মাকে জানবার চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে যে আত্মা অগ্নিকণা তুল্য হৃদয়মধ্যে বিরাজ করছেন। আত্মা থাকলেই পরমাত্মা আছেন এ নিশ্চয়। যিনি পরমাত্মা তিনিই ঈশ্বর। এ নিশ্চয়ই জানবে, আত্মা রূপ বিশেষ। সেইজন্যে চেষ্টা করলে নিশ্চয় দেখতে পাওয়া যায়। অনেক মহাপুরুষ দেখতে পেয়েছেন ও পাচ্ছেন। সুতরাং আত্মা সাকার তাতে আর সন্দেহ নেই। আত্মাকে জানতে পারলে আপনাকে জানা যায় এবং পরমাত্মাকে জানলেই ভগবান বা ঈশ্বরকে জানা যায়। আত্মা পরমাত্মার অংশ বলে জানবে। আত্মাকে জানলেই পরমাত্মাকে জানা যায়।

মন ও বুদ্ধি এরা সাকার কি নিরাকার এ অনেকের জানবার ইচ্ছে হতে পারে। মন বিশ্বব্যাপী নয়। মন অবশ্যই কোন সীমাবদ্ধ জায়গা জুড়ে আছে। তাহলে মন নিশ্চয়ই বস্তু বিশেষ।

সকলেই বলেন আমার মন তোমার মন ইত্যাদি এবং প্রত্যেক

মানুষের কাজও পৃথক এ বেশ বোঝা হয়। আর মনের কাজও যে সম্পূর্ণ আলাদা তা ভেবে দেখলে বেশ বুঝতে পারা যায়। সুতরাং মন সাকার। যদি মনের স্থানব্যাপকতা ধর্ম অস্বীকার করা যায় তাহলে মনকে আর বস্তু বলতে পারা যায় না। তাহলে মনকে কোন প্রকার স্থানব্যাপকতা ধর্ম বিশিষ্ট বস্তুর গুণমাত্র বলতে হবে। সাধারণত স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া দ্রব্যের আকার উপলব্ধি করতে পারা যায় না। স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি হয় না বলে মনের আকার কিরূপ তা সহজে বুঝতে পারা যায় না। আকার কথার যথার্থ যা অর্থ তা জ্ঞাত হলে কারও মনে আর গোল থাকবে না। একবার ভেবে ছাখো, তোমার মন তোমার দেহ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। অথচ তা কোন স্থান ব্যাপে নেই এরূপ ধারণা তুমি কখনই করতে পারবে না। সুতরাং মন সাকার নিশ্চয়। সেইজন্যে মনের কাজও আলাদা। তা চেষ্টা করলেই সহজে উপলব্ধি হয়ে থাকে।

বুদ্ধি জগৎব্যাপী নয়, নিশ্চয়ই কোন সীমাবদ্ধ স্থান জুড়ে আছে। তাহলে বুদ্ধি বস্তু বিশেষ। বুদ্ধি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন। সেই জন্যে বলে থাকে সকলের বুদ্ধি সমান নয়। আর যার বুদ্ধি কম তাকেই লোকে বলে বোকা। তাহলে বুদ্ধির স্থানব্যাপকতা শক্তি আছে। সুতরাং বুদ্ধি সাকার। এতে আর সন্দেহ করার কারণ নেই।

আর ভালোমন্দ বিচার করা বুদ্ধির কাজ তা বেশ সহজেই বুঝতে পারা যায়। বুদ্ধি জীবশরীরে দর্পণের স্বরূপ।

এক প্রণব মন্ত্র হতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-এর কাজ চলছে। এই প্রণব মন্ত্রের দেবতা অগ্নি।

হিন্দুরা বুঝেছিলেন যে এই অগ্নিগত শক্তি হতেই এই জগৎচক্র ঘুরছে। কিন্তু এই অগ্নিগত শক্তি যে চৈতন্যের সঙ্গে অযুক্ত একথা তাঁরা ভাবতেন না। হিন্দুদের কাছে প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি ব্রহ্মচৈতন্য চেতনাযুক্ত।

যতক্ষণ আমার অঙ্গুলিটি বিচ্ছিন্ন নয় ততক্ষণ ঐ অঙ্গুলিটি চেতনাময়। অঙ্গুলিটি কেটে ফেললেই উহা আমা হতে বিচ্ছিন্ন হলো।

তখন আর ওতে চেতনা থাকে না। তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ।

এই সমগ্র বিশ্ব চৈতন্যময় এক পুরুষের দেহ। ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আধার সকল যথা অগ্নি, বায়ু, নদী, পর্বত ও মৃত্তিকা ইত্যাদি সেই দেহের অঙ্গবিশেষ। অগ্নিকে যদি সেই এক চৈতন্যময় পুরুষ হতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখি তবে অগ্নির চেতনা আছে বলে বুঝবো। আর যিনি অগ্নির সঙ্গে সেই চৈতন্যময়ের কোন সম্বন্ধ দেখতে পান তাঁর কাছে অগ্নি জড় পদার্থ।

আত্মা সর্বদা সর্বগত হওয়ায় সর্বত্র প্রকাশিত হন না। কেবল নির্মল বুদ্ধিতেই প্রকাশিত হন। ইন্দ্রিয় সকল নিজের নিজের কাজে ব্যাপৃত হওয়ায়, অবিবেকিদের বোধ হয় যেন আত্মাই সকল কাজে ব্যাপৃত হন। যে রকম মেঘ সকল ধাবমান হলে চন্দ্রকে ধাবমান বলে মনে হয়।

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এরা চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় করে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যেরকম সূর্যের আলোকের আশ্রয়ে মানুষেরা কাজ করে।

'রাগ, ইচ্ছে, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বৃত্তিসকল বুদ্ধিরই হয়ে থাকে। এ সকল আত্মার হয় না। কারণ প্রত্যক্ষ বোধ হয় যে সুষুপ্তিকালে আত্মা থাকেন কিন্তু বুদ্ধি না থাকাতে রাগ, ইচ্ছে, প্রভৃতি তৎকালে কিছুই থাকে না। যে প্রকার সূর্যের স্বভাব প্রকাশ, জলের স্বভাব শৈত্য এবং অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা সেই প্রকার আত্মার স্বভাব সত্য, চৈতন্য, আনন্দ, নিত্যতা এবং নির্মলতা। আত্মার বর্তমানতা, চৈতন্যের অংশ আর বুদ্ধিবৃত্তি, এই তিনের সংযোগে অবিবেকের দ্বারা আমি জানাই, আমি করছি এই প্রকার প্রবৃত্তি হয়। আত্মার যে বিকার নেই তা বুদ্ধি কখনো চিন্তা করতে পারে না। এই কারণে জীব সমস্ত বস্তুকে জেনে আমি জ্ঞাতা, আমি দ্রষ্টা এরূপ জ্ঞানে মুগ্ধ হচ্ছে। যে প্রকার রজ্জুকে সর্প জ্ঞান হলে, সর্পের জন্যে ভয় হয় কিন্তু রজ্জুজ্ঞান হলে আর ভয় থাকে না সেই প্রকার জীবের আত্মাকে জীব জ্ঞান হওয়াতে ভয় হচ্ছে

আমি জীব নই, আমি পরমাত্মা এই প্রকার জ্ঞান হলে আর ভয় থাকে না। এক আত্মা, বুদ্ধি প্রভৃতি ও ইন্দ্রিয় সকলকে প্রকাশ করেন। অচেতন এই বুদ্ধি প্রভৃতি ও ইন্দ্রিয়সকল আত্মাকে প্রকাশ করতে পারে না। যেমন দীপ সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করে কিন্তু কোন রকম বস্তু দীপকে প্রকাশ করতে পারে না। আত্মার স্বরূপ বোধ হলে তার জ্ঞান স্বভাবপ্রযুক্ত অন্য জ্ঞানে ইচ্ছে থাকে না। যে প্রকার দীপের নিজের রূপ প্রকাশ হলে অন্য দীপ ইচ্ছে হয় না। অবিদ্যা হতে উৎপন্ন শরীরাদি যে সব দৃশ্য বস্তু এরা বুদ্‌বুদের মত বিনাশী। এই সকল বস্তুর অতীত যে নির্মল ব্রহ্ম তিনিই আমি এই প্রকার জ্ঞান করবে। আমি দেহ নই ও আমার দেহ নয়, দেহ হতে আমি আলাদা, এই জন্যে জন্ম, জরা, কৃশতা ও মৃত্যু আদি যেসব দেহধর্ম তা আমার নয় আর ইন্দ্রিয়সকলও আমার নয়। সুতরাং তাদের বিষয় ও কর্ম সকলের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই। আমার মন নেই এইজন্যে দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি যা কিছু মনের কাজ তা আমার নয়। আমি অপ্রাণ, আমি অমল এবং শুদ্ধ আত্মাস্বরূপ এ বেদ প্রসিদ্ধ।

নির্গুণ, ক্রিয়ারহিত, নিত্য যে আত্মা তিনিই আমি। আমার কোন আকার কি বিকার নেই। আমি চিরকাল মুক্ত। আমার যখন কোন ক্ষয় ও কোন সংসর্গ নেই তখন আমি অচল, সর্বদা শুদ্ধ ও নির্মল এবং আকাশের মত সমভাবে সকল বস্তুর বাইরে এবং অন্তরে আছি। যে ব্যক্তি ব্রহ্মই আমি এরূপ সর্বদা বাসনা করেন তার কাছে সমস্ত সৃষ্ট বস্তু বিনষ্ট হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এসব প্রভেদ পরমাত্মাতে নেই। চৈতন্যময় আনন্দ স্বরূপের একরূপের জন্যে তিনি স্বয়ং দীপ্যমান আছেন।

যেমন এক আকাশকে ঘটাদি উপাধি প্রভেদে ঘটাকাশ প্রভৃতি বলে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় এবং ঘটাদি ভগ্ন হলে যে এক আকাশ আছে তাই থাকে, আকাশ ভিন্ন ভিন্ন নয়, তেমনি এক পরমাত্মা নানা উপাধি প্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়। উপাধি বিনাশ হলে যে

এক পরমাত্মা তাই থাকেন। পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন নন। যেমন লবণাদি রস, কিম্বা রক্তাদি বর্ণ, জলে মিশ্রিত হলে ঐ লবণাদি রস কিম্বা রক্তাদি বর্ণ প্রভেদে জলে ঐ লবণাদি রসের কিম্বা রক্তাদি বর্ণের আরোপ হয় সেই প্রকার নানা প্রকার উপাধিবশত জাতি নাম ও আশ্রয় প্রভৃতি সমস্ত বস্তু পরমাত্মাতে আরোপিত হয়।

যে প্রকার ধান্যাদিকে অবঘাতের দ্বারা তূষাদি কোষ হতে পৃথক করলে তার স্বরূপ তণ্ডুল মাত্র প্রকাশিত হয় তেমনি শরীরাদিতে আবৃত পরমাত্মাকে যুক্তি দ্বারা শরীরাদি হতে পৃথক করে ভাবলে তাঁর শুদ্ধ স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

যে প্রকার উষ্ণতা বহ্নিকে আশ্রয় করে আছে তেমনি ইন্দ্রিয়াদি জড় বস্তু সকল যে অদ্বিতীয়, নিশ্চল ও নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় করে নিজের নিজের কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাঁকে সেই সর্বঅন্তর্যামী জ্ঞানময় নিত্য আত্মা বলে জানবে।

অতএব আত্মাই আমি। আমি বলতে আর কোন পদার্থকে বোঝায় না। আমিই তিনি অথবা তিনিই আমি। আমি কিছুই নই। আমার কিছু নেই। সমস্তই তিনি এবং সমস্তই তাঁর। মানবরূপ তৃণ নিচয় বাসনাবায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়ে জন্মজন্মান্তরে যে সব দুঃখ উপভোগ করে তা বচনাতীত। এ আমার, এ আমার নয় ইত্যাদি প্রকার ভ্রম জ্ঞানই সংসার বন্ধনের কারণ আর আমি বলতে আত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়। সবই ব্রহ্ম এই জ্ঞান জন্মিলেই মুক্ত হওয়া যায়। এরূপ উপায়ও নিজের অধীন। সুতরাং এরূপ স্বাধীন উপায় থাকতে যে অসীম সংসার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় একি সামান্য আক্ষেপের বিষয় নয়।

এবার স্বামিজী 'তন্ময়ত্ব' প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, জীবনের প্রত্যেক সময় একটি কাজের জন্যে নির্দিষ্ট আছে। মানব-জীবনে সেই সময় অনুসারে কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। তাই বলে

এক সময়ের কাজ অন্য সময়ে হয় না তা নয়। এক বয়সে যে কাজ নির্দিষ্ট আছে অন্য বয়সে সেই কাজ সম্পাদিত হতে পারে। সময়ানুরূপ কাজের অনুষ্ঠান করলে তা কখনো বিফল হয় না। অসময়ে কাজ করলে প্রায় বিফল হতে হয়। দুই একটি সফল হলেও তা সম্পূর্ণ হয় না, কিয়দংশ মাত্র হয়।

যোগের সময় বার্দ্ধক্য। যখন চিত্তে কোন কুভাব উদিত হয় না, মানবের ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হয়ে আসে সেই সময় যোগ বা উপাসনার উপযুক্ত।

যৌবনে উত্তেজিত বৃত্তিসমূহ প্রতিনিবৃত্ত করবার ক্ষমতা যার আছে তিনিও যোগ শিক্ষার উপযুক্ত।

যৌবনে প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করতে পারলেই যোগশিক্ষার উপযুক্ত পাত্র হলো।

যোগসাধন করা নিতান্ত সহজ কথা নয়। যোগ শব্দে তন্ময়। এই তন্ময়ত্ব ভাব হৃদয়ে না হলে যোগশিক্ষা হবে না। হলেও তা কোন কার্যকরী নয়। যদি তন্ময় হতে পারা যায়, ঈশ্বরে ও তোমাতে কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত না হয় তাহলে তুমি যোগ শিক্ষা করে সুফল পাবে। আর তুমিই যোগ শিক্ষার প্রকৃত অধিকারী।

যোগ সম্বন্ধে যতগুলি নিয়ম আছে তার মধ্যে ষট্‌চক্রভেদ সর্বপ্রধান। ষট্‌চক্র ভেদ করতে পারলে অন্য সাধনার কোন প্রয়োজন থাকে না। কেবল একমাত্র ষট্‌চক্র ভেদ করতে পারলে স্বর্গরাজ্য অধিকার করতে সমর্থ হয়। ষট্‌চক্র যোগ শাস্ত্রের সর্বপ্রধান। যারা ষট্‌চক্র ভেদ করতে পারেন, নির্বাণমুক্তি তাদের পক্ষে অতি সহজ। ষট্‌চক্র ভেদ করে সেই চিদানন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করতে হলে মানসিক যেসব বৃত্তির প্রয়োজন তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমে এ সাধিত হয় না। উপযুক্ত ব্যক্তি বিনা চেষ্টায় ষট্‌চক্র ভেদ করতে পারেন। আগে ষট্‌চক্র কি তা জানা দরকার। তারপর ক্ষমতা হলে ভেদ করবার চেষ্টা করা উচিত এবং তখন তার মহত্ব ও আবশ্যকতা বুঝতে সক্ষম হবে।

জীবদেহে অন্নময় কোষ অবলম্বন করে মনোময় কোষ। মনোময় কোষ অবলম্বন করে প্রাণময় কোষ। প্রাণময় কোষ অবলম্বন করে বিজ্ঞানময় কোষ। বিজ্ঞানময় কোষ অবলম্বন করে আনন্দময় কোষ অবস্থিতি করেন। অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত জীবাত্মা এই আনন্দময় কোষকে অবলম্বন করে অবস্থিতি করেন। এই অবস্থান চার অবস্থায় নিষ্পন্ন হয়।

প্রথম বৈশ্বানর, তিনি শরীরস্থ হয়ে চালনা করেন। ইহাই জীবের চেতনাবস্থা।

দ্বিতীয় অবস্থা তৈজস। ইহা জীবের স্বপ্নাবস্থা।

তৃতীয় প্রাজ্ঞ। ইহা জীবের নিদ্রাবস্থা।

চতুর্থ ব্রহ্ম। সকল প্রাণীতে সর্বাবস্থায় ব্রহ্ম জীবশরীরে অবস্থিত আছেন তা জ্ঞাত হওয়া।

এই চতুর্বিধ অবস্থা অ, উ, ম এবং ওম্ মন্ত্র দ্বারা সাধিত হয়। নাড়ী সমূহের সঙ্গে নিরন্তর যে বায়ুরাশি প্রবাহিত হচ্ছে তা অবলম্বন করে পঞ্চ জীবের অবস্থান।

এই সকলের মধ্যে দিয়ে নাড়ী প্রধানা সুষুম্না অন্তরের ঊর্দ্ধ হতে উৎপন্ন হয়ে মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে কেশমূল পর্যন্ত প্রলম্বিত আছে। এই নাড়ীতে প্রবেশ করে জ্ঞান ও আনন্দময় অন্তরাকাশে পদ্মবৎ গুহামধ্যে আত্মা বাস করছেন। ভূর্ভুব প্রভৃতি সবই সেখানে অবস্থিত। এই ষট্‌চক্র ভেদ করে নাড়ী প্রধানা সুষুম্নার মধ্যে সংযমিত আত্মাকে প্রবেশ করিয়ে সেই সচ্চিদানন্দের সঙ্গে মিলিত হতে হয়, এই সম্মিলনই ষট্‌চক্রভেদ।

কঠিন যোগের তুলনায় সরল যোগ সোজা। এবং এতে বেশী ফল মেলে।

কঠিন যোগ শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা।

সরল যোগ কেবলমাত্র মানসিক শিক্ষা।

মানসিক শিক্ষা শেষ হলে শারীরিক শিক্ষার কোন দরকার নেই।

কঠিন যোগ কুম্ভক, বিকুম্ভব, আত্মমীন, উৎকান্তি ও দাষ্টি।

সরল যোগ সত্য, সৎ ও নির্বিকার।

সরল যোগ সহজ সাধ্য এবং সাধারণের গ্রহণ যোগ্য।

কঠিন যোগসাধন সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না।

সরল যোগ শিক্ষার জন্যে বনবাস বা কায়ক্লেশ কিছুই দরকার হয় না। কেবলমাত্র চিত্তবৃত্তি আপন বশীভূত সৎমার্গে অনুগমন করার ক্ষমতা হলেই তার মহাফল লাভ করা যায়। কায়িক ক্লেশ, তীর্থ পর্যটন উপবাস কিছু প্রয়োজন হয় না যদি চিত্তে চিন্ময়ের মূর্তি প্রতিফলিত করতে পারা যায়।

সদ্‌বৃত্তির আলোচনায় ও অনুশীলনে যে ফল, তীর্থ পর্যটনে তা হয় না।

মন পরিশুদ্ধ হলে, জীব আত্মশুদ্ধ হলে, চিত্ত যখন নির্মল হবে তখন সে আপন হৃদয়ে সকল তীর্থ পরিদর্শন করতে সমর্থ হয়।

যাবতীয় তীর্থ মানবের শরীরে বর্তমান আছে। গঙ্গা নাসাপুটে, যমুনা মুখে, বৈকুণ্ঠ হৃদয়ে, বারাণসী কপালে, হরিদ্বার নাভিতে ইত্যাদি স্বর্গ, মর্তের যাবতীয় তীর্থক্ষেত্র মানব শরীরে বর্তমান রয়েছে।

যে পুরী প্রবেশ করতে কোন রকম কুণ্ঠা অর্থাৎ সঙ্কোচ হয় না তাই বৈকুণ্ঠ।

পাপ আশঙ্কার মূল। যে পাপী সে সকল কাজেই সঙ্কুচিত হয়। যে নিষ্পাপ তার কোথাও শঙ্কা নেই। সর্বদাই সে কুণ্ঠাশূন্য।

সুতরাং সে বৈকুণ্ঠপুরী গমনে অধিকারী। তার হৃদয়ে চিৎস্বরূপ আনন্দময় সৎস্বরূপ বৈকুণ্ঠনাথ বিরাজিত।

বৈকুণ্ঠের অর্থাৎ হৃদয়ের নীচে, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী অথবা চন্দ্র ও সূর্য অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম। এই সঙ্গমে স্নান করতে পারলে জীবের সকল পাপ ধ্বংস হয়। গঙ্গা যমুনা সঙ্গম হৃদয়ের নীচে, ইড়া আত্মজ্ঞান ও পিঙ্গলা বিবেক নামে কথিত। গঙ্গা যমুনায় যে প্রকার সম্বন্ধ ইড়া ও পিঙ্গলায় ঠিক সেই সম্বন্ধ।

পিঙ্গলা অর্থাৎ বিবেক হতে ইড়া অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি।

মনকে এই পিঙ্গলা পথে প্রবেশ করিয়ে ক্রমশ নিবৃত্তি দ্বারা ইড়ায়

সম্মিলিত করতে হয়। পরে ইড়া এবং পিঙ্গলা যেখানে সংযোগ হয়েছে অর্থাৎ যেখানে আত্মজ্ঞান ও বিবেক একত্র হয়েছে, মনকে সেখানে নিয়ে স্নান করালে অর্থাৎ মনকে আত্মজ্ঞানরূপ সলিলে নিমজ্জিত করলেই মহাফল লাভ করা যায়।

আত্মজ্ঞান হলে যোগ তার কাছে অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। আত্মজ্ঞান লাভই যোগের কারণ।

সেই আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্যে যোগ শিখতে হয়। তার জন্যে গৃহত্যাগ বা বনবাসের কোন দরকার হয় না। এমন কতকগুলি নিয়ম আছে যা কেবলমাত্র চিন্তা ও সেই মত আচরণ করতে পারলে যোগ-ফল ও আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়।

আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্যে অন্য কোন প্রকার কঠিন সাধনা করতে হয় না। কেবল সেইগুলির অনুষ্ঠান করলে যোগফল পাওয়া যায়। সেগুলিকেও সরল যোগ বলা যায়।

যোগফল লাভ করতে হলে যেসব বৃত্তি নিরোধ করার একান্ত দরকার হয়ে পড়ে যা সংসাধিত না হলে যোগফল লাভ করা যায় না সেই নিয়ম ও আকারগুলি সেই নিয়মাবলীর মধ্যে স্থান পেয়েছে। সেইরূপ আচরণ ও হৃদয়ে সেইরূপ ভাব গ্রহণে সমর্থ হলে নিশ্চয়ই যোগফল লাভ করা যায়। নিয়মাবলি নিম্নরূপ,—

১। অসন্তুষ্ট ব্যক্তি কাউকেও সন্তুষ্ট করতে পারে না। সর্বদা যিনি সন্তুষ্ট থাকেন তিনি সকলকে প্রফুল্ল করতে পারেন।

২। জিহ্বা পাপ কথা বলতে বড়ই তৎপর। তাকে সংযত করা দরকার।

৩। আলস্য সকল অনর্থের মূল। যত্ন সহকারে আলস্য পরিত্যাগ করবে।

৪। সংসার ধর্মাধর্মের পরীক্ষার স্থান। সাবধান হয়ে ধর্মাধর্ম পরীক্ষা করে কাজ করবে।

৫। কোন ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করবে না। সকল ধর্মই সার। আর তাতে অবশ্যই সত্য নিহিত আছে।

৬। দরিদ্রকে দান করবে। ধনীকে দান করা বৃথা। কারণ তার দরকার নেই। সেইজন্যে সে আনন্দিত হয় না।

৭। সাধু সহবাসই স্বর্গ। অসৎ সঙ্গই নরকবাসের মূল।

৮। আত্মজ্ঞান, সৎপাত্রে দান ও সন্তোষ আশ্রয় করলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

৯। যিনি শাস্ত্র পাঠ করে তার মর্ম জেনে তা অনুষ্ঠান না করেন তিনি পাপী হতেও অধম।

১০। যে কোন কাজ করার মূলে ধর্ম থাকা চাই। নচেৎ সিদ্ধি হয় না।

১১। কখন কারও হিংসা করবে না। সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্যে কখন কোন প্রাণী বধ করবে না।

১২। যে ব্যক্তি পাপকলঙ্ক প্রক্ষালিত না করে মিতাচারী ও সত্যানুরাগী না হয়ে রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান করে ব্রহ্মচারী হয় সে ব্যক্তি ধর্মের কলঙ্ক স্বরূপ।

১৩। ছাদশূন্য বাড়িতে যেমন বৃষ্টিধারা পড়ে, চিন্তাশূন্য মনেও তেমনি রিপুরা আশ্রয় নেয়।

১৪। পাপী লোক ইহকালে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়। যখনই সে নিজের কুকর্ম মনে করে তখনই তার প্রাণে অনুতাপ জেগে ওঠে।

১৫। (ক) চিন্তাশীলতা অমরত্ব লাভের পথ। চিন্তাহীনতা মৃত্যুর পথ।

(খ) গর্বিত হবে না। কাম উপভোগ চিন্তা করবে না।

১৬। শত্রু শত্রুর যত অনিষ্ট না করতে পারে কুপথগামী মন তার চেয়েও অনিষ্ট করে।

১৭। মধুমক্ষিকা যেমন ফুলের সৌন্দর্য অথবা সুগন্ধির অপচয় না করে মধু সংগ্রহ করে তুমিও তেমনি পাপে লিপ্ত না হয়ে জ্ঞান লাভ করবে।

১৮। এই পুত্র আমার, এই ঐশ্বর্য আমার, অতি অজ্ঞানী লোকে

এই প্রকার চিন্তা করে দুঃখ পায়। সে নিজে তার নিজের নয়, পুত্র বা সম্পত্তি তার কিভাবে হতে পারে।

১৯। অল্প লোকই পরপারে উত্তীর্ণ হয়। অধিকাংশ লোকই ধর্মের ভাণ করে উপকূলে দৌড়োদৌড়ি করে।

২০। যুদ্ধে যে লোক লক্ষ লোক জয় করেছে সে কিন্তু প্রকৃত বিজয়ী নয়। যে লোক আত্মা জয় করেছে সেই প্রকৃত বিজয়ী।

২১। পাপ আমাকে আক্রমণ করবে না, এই ভেবে নিশ্চিন্ত থেকো না। ফোঁটা ফোঁটা জলে জলপাত্র পূর্ণ হয়। নির্বোধ লোকে ক্রমে ক্রমে পাপময় হয়ে যায়।

২২। সকলে কর্কশ কথা বলে না। কর্কশ কথা বললে কর্কশ কথা শুনতে হবে। আঘাত করলে আঘাত সহ্য করতে হবে। কাঁদালে কাঁদতে হবে।

২৩। যারা বাসনা জয় করতে পারে নি, উলঙ্গ দেহ, জটাধারণ, ভস্মলেপন, উপবাস, মৃত্তিকাশয্যা ইত্যাদি তাদের মন পবিত্র করতে পারে না।

২৪। অন্যকে যেরূপ হতে উপদেশ দাও নিজেও তেমনি হও। যে নিজেকে বশীভূত করেছে সে অন্যকেও বশীভূত করতে পারে। আপনাকে বশ করাই কঠিন।

২৫। পাপ ও পুণ্য সবই নিজের মতে। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে পবিত্র করতে পারে না।

২৬। এক জগৎ জলবুদ্বুদ্ মরীচিকার মত। যে এই জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে, মৃত্যু তাকে দেখতে পায় না।

২৭। ধাবমান শকটের মত উত্তেজিত ক্রোধকে যে সংযত করতে পারে সেই প্রকৃত সারথী। অন্য লোকে কেবল বলগা ধারণ করে থাকে।

২৮। প্রেমবলে ক্রোধ জয় করো, মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গল জয় করো, নিঃস্বার্থতা দ্বারা স্বার্থ জয় করো আর সত্য দ্বারা মিথ্যে জয় করো।

২৯। গুরু যা উপদেশ দেবেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনে পালন করবে।

৩০। বৃথা বাক্য ব্যয় করবে না। যে বেশী কথা বলে সে নিশ্চয়ই বেশী মিথ্যে কথা বলে। যতদূর সাধ্য কথা কম বলতে চেষ্টা করবে, সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি পাবে।

যোগ শিক্ষার জন্যে বনবাস অথবা অনাহারী থাকতে হয় না। চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ।...

এভাবে স্বামিজী তন্ময়ত্ব এবং যোগের মূল উৎসের কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন। শিষ্য উমাচরণও তা যত্নের সঙ্গে লিখে নিলেন।

পরিশেষে বললেন, যোগিগণ অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে যোগ তাই তন্ময়ত্ব। কোন বিষয়ে মনোযোগ করে অন্যমনা হলেই তন্ময়ত্ব। তন্ময়ত্ব হলেই বন্ধন মোচন হয়ে মুক্তিলাভ করে।

এবার স্বামিজী 'তত্ত্বজ্ঞান' প্রসঙ্গে বললেন। তিনি বললেন, তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান। ঈশ্বর আছেন যদি বিশ্বাস হয় তবে তাঁর অনুসন্ধান করা উচিত। আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে তবে বৃথা তর্ক করে বাজে কথায় কারও সঙ্গে বিবাদ অথবা নিজের মত বহাল রাখবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁর সে বিশ্বাস আছে এবং যিনি তাঁকে পাবার পথ অনুসন্ধান করছেন তাঁর প্রথমে 'আমি কে' তা জানা চাই। তারপর আরও সাতটি বিষয় বিশেষ ভাবে জানা দরকার।

প্রণালীমতে বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে কাজ করলে তিনমাসের মধ্যে নিশ্চয় আত্মদর্শন হয়। আত্মদর্শন হলে মানুষ শান্ত ও মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। যতদিন না আত্মা পরমাত্মায় যোগ করতে পারবে ততদিন মুক্তির আশা নেই!

যোগ হলে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে যথা ইচ্ছে গমনাগমন করতে পারা

যায়। ঐশ্বরিক বল ও শক্তি পাওয়া যায় এর দ্বারা। অবশেষে সর্বজ্ঞ হওয়া যায়।

আমি কে—পঞ্চভূত, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। ঐসব ভিন্ন নাড়ী চতুষ্টয় যথা ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ও চিত্রা, ছয় রিপু, এবং চিত্ত বাসনা, চিন্তা, তৃষ্ণা, মায়া ও আশা, এই-সব উপাদান নিয়ে দেহের গঠন হয়েছে। তাছাড়া জ্ঞান, চৈতন্য, আত্মা বা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা আছেন। এই সব বিষয়ের তত্ত্ব জানলেই আমি কে আর ঈশ্বর মানবদেহে সর্বদা বিরাজমান আছেন কিনা বেশ জানতে পারা যায়। আমি যদি আমাকে চিনতে পারি তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে জানতে পারবো। যদি ঈশ্বর আছেন বিশ্বাস হয় তবে তিনি অতি নিকটে আছেন জানবে। আর যদি বিশ্বাস না হয় তবে তিনি বহুদূরে। আর কোনকালে তার দেখা পাওয়া যাবে কিনা তা বলা যায় না।...

এভাবে স্বামিজী প্রিয় গৃহী শিষ্য উমাচরণের কাছে 'তত্ত্বজ্ঞান' প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলেন। পরিশেষে বললেন, এই দেহের মধ্যে যাবতীয় নাড়ীতে যে বায়ু উভয় পার্শ্বে চালিত হয়ে থাকে তাই প্রাণ সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যখন ভ্রূর মাঝখানে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবস্থান হয় তখনি পরমেশ্বরকে আত্মস্বরূপে জানতে পারা যায়। সেই সময় ঐ প্রাণের নিরোধ হয়ে থাকে।

প্রাণ স্পন্দনকেই মনের রূপ বলে জানবে। তার থেকেই সংসারভ্রম জাগে। তার উপশম হলেই সংসারভ্রান্তি দূর হয়ে থাকে।

যাতে সমস্ত, যা হতে সমস্ত, যিনি সমুদয় ও সমুদয় হতে যিনি অথচ যাতে কিছু নেই, যা হতে কিছু নয়, যে পরমাত্মার মত দৃষ্টান্ত কিছুতেই হয় না তথাপি জ্ঞানী লোকে তাঁর পরিচয় জানতে পারেন। তুমি সুখ ও দুঃখের কারণ বলে আত্মা হতে নিতান্ত আলাদাভাবে আছ। যেমন আকাশে ফুল ফোটে না তেমনি আত্মারও কোন কর্তৃত্ব নেই।

আকাশে মৃত্তিকা সম্পর্কের মত আত্মায় কোন রকম কল্পনা স্পর্শ করতে পারে না।

অন্তরীক্ষের অবয়বের মত আত্মার কোনরকম কর্তৃত্ব নেই। অন্ধকারনাশক প্রভাসম্পন্ন দীপের দ্বারা যেমন বস্তুকে সম্পূর্ণ দেখা যায় তেমনি অন্ধকারনাশক বিচার দ্বারাও শীঘ্রই সেই বিমল ব্রহ্মস্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন সূর্যদেব প্রভা বিস্তার করলে যাবৎ অন্ধকারের ধ্বংস হয় তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হলে তাবৎ দুঃখেরই ধ্বংস হয়ে থাকে।

সূর্য উদয় হলে যেমন ভূতলে আলোকের প্রকাশ হয় তেমনি জ্ঞানের উদয় হলে সেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিজেই প্রকাশ পেয়ে থাকেন।

যেমন কেউ নিজের মাংস আস্বাদন করতে চায় না তেমনি তিনি যাবৎ পদার্থের অভিলাষশূন্য হন।

স্থির মনে চিন্তা করে দেখলে জানতে পারা যায় যে ভগবান মানুষকে মনের মত গঠন করে তাঁর নিজের সমস্ত শক্তি তাতে প্রদান করে মানুষের শরীরের ভেতরে ও বাইরে মাখামাখি হয়ে রয়েছেন।

প্রায় মাসাধিককাল উমাচরণ তৈলঙ্গস্বামীর কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের ধর্মোপদেশ এবং শিক্ষা লিখে নিলেন। শেষকালে লিখলেন কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, সীতাহরণ, রামরাবণের যুদ্ধ, সমুদ্রমন্থন প্রভৃতি রহস্য। পরে লিখলেন দেবতত্ত্ব।

এইসব লেখার ফলে স্বামিজীর স্নেহ উমাচরণের প্রতি গভীরতর হয়ে উঠলো।

একদিন যে মানুষ কেবল গেরিমাটি ঘষার কাজে ব্যস্ত থাকতেন সারাদিন এখন সেই মানুষের মনে বৈরাগ্য ও ত্যাগ, সাধনা ও দিব্যানুভূতির এক পরম ক্ষণ এসে উপস্থিত হলো। উমাচরণের মনে ঐ গেরিমাটির রং ধরলো। তিনি হতে চাইলেন এমনি এক মহাপুরুষের একনিষ্ঠ শিষ্য।

একদিন মঙ্গলদাস উমাচরণকে বললো, আপনি বাবাকে খুব বশীভূত করেছেন। বাবা বোধ হয় আপনাকে চেলা করবেন।

উমাচরণ বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করলেন, এ বিষয়ে আপনি কি বাবার কাছ থেকে কোন কথা শুনেছেন?

মঙ্গলদাস বললো, আপনাকে চেলা করার আর বাকী কি আছে? বাবা আজ পর্যন্ত এত ঘনিষ্ঠতা কারও সঙ্গে করেন নি। আর প্রায়ই বলে থাকেন, এই বাঙালী বাবুটি অতি শান্ত। অত্যন্ত সদ্ স্বভাবের লোক।

উমাচরণের মুখে দিব্যানন্দের হাসি ফুটে উঠলো। স্বামিজীর উদ্দেশ্যে ভক্তিপ্রণাম নিবেদন করে বললেন মঙ্গলদাসকে, যাতে আমার দীক্ষা হয় সে বিষয়ে আপনাকে বিশেষ সাহায্য করতে হবে আর সুবিধামত মনের ভাব কি একবার দয়া করে জিগ্যেস করবেন।

মঙ্গলদাস বললো, আমি স্বামিজীকে আপনার কথা জানাবো।

মঙ্গলদাস তৈলঙ্গস্বামীকে উমাচরণের কথা বলার আগেই অন্তর্যামী স্বামিজী সবকিছু জানতে পারলেন।

একদিন সন্ধ্যের সময় উমাচরণ স্বামিজীর কাছে এলেন। তাঁর মনে একান্ত ইচ্ছে, স্বামিজীর কাছে যোগশিক্ষা করবেন।

কিন্তু মনের বাসনা স্পষ্ট করে জানাতে পারলেন না। কোথায় যেন কি একটা সঙ্কোচ মনের মধ্যে জট খেয়ে যাচ্ছে। তার বাঁধন হতে মনকে মুক্ত করতে পারছেন না।

ইতস্ততঃ করতে লাগলেন স্বামিজীর কাছে মৌন হয়ে বসে।

স্বামিজী আগে থেকে বুঝতে পারলেন উমাচরণের মনোভাব।

মঙ্গলদাস সেখানে দাঁড়িয়েছিল।

স্বামিজী উমাচরণকে লক্ষ্য করে মঙ্গলদাসকে বললেন, এই বাঙালী বাবুটি এখন দীক্ষা নেবার ইচ্ছে করেছে।

উমাচরণ তখন মনে বল পেলেন। মুক্ত মন নিয়ে বললেন, আমার প্রতি আপনি বিশেষরূপে দয়া প্রকাশ করেছেন। এমনটি কারও ভাগ্যে ঘটে না। আমাকে উদ্ধার করতেই হবে।

স্বামিজী বললেন, সে বিষয়ে রাতে যুক্তি দেওয়া যাবে। এ বড় শক্ত কথা। এখন স্বাধীন ও মুক্ত আছ। দীক্ষা নিলেই বাঁধা পড়তে হবে।

উমাচরণ আর কিছু না বলে বাসায় চলে এলেন। বেলা দুপুর। স্নানাহার করে বিশ্রাম করলেন কিছুক্ষণ।

পরে ঐদিন সন্ধ্যের সময় আবার এলেন স্বামিজীর আশ্রমে।

স্বামিজী উমাচরণকে নিয়ে আশ্রমের একটি ছোট ঘরে এলেন।

নিজে আসন গ্রহণ করলেন। উমাচরণও তাঁর সামনে বসলেন।

স্বামিজী বললেন, তুমি যোগ শিখতে চাও। কিন্তু তুমি যোগ শিক্ষার অনধিকারী। তুমি উপাসনামার্গে প্রবৃত্ত হও। এই পথই তোমার উপযুক্ত।

উমাচরণ বললেন, আপনার যা ইচ্ছে তাই হবে। এখন আমাকে ও বিষয়ে কিছু উপদেশ দিন। আমাকে কি কি করতে হবে বলুন।

স্বামিজী বললেন, এই মাঘ মাসের তেসরা তারিখে পুষ্যা নক্ষত্রে যে চন্দ্রগ্রহণ আছে তোমাকে সেই গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কারণ দেহ শুদ্ধ না হলে দীক্ষা হতে পারে না। সেই চন্দ্রগ্রহণের রাতে তোমার দেহ শুদ্ধ করে দেব।

তারপর স্বামিজী উমাচরণের হাতে একটি ফর্দ দিয়ে বললেন, গ্রহণের সময় এই দ্রব্যগুলি একজন সৎ ব্রাহ্মণকে দান করবে। আর তোমাকে একটি জপের মন্ত্র বলে দিচ্ছি। দানের পর গঙ্গাস্নান করে ঐ মন্ত্রটি জপ করবে। তাতেই তোমার দেহ শুদ্ধ হবে। তারপর আমি দীক্ষা দেবো।

গ্রহণের সময় দান গ্রহণ অনেকের কাছে আপত্তির কারণ হলো। বিশেষ করে কাশীধামে।

উমাচরণ বড় চিন্তিত হলেন। করজোড়ে বললেন স্বামিজীকে, বাবা! আমার প্রতি বড় কঠিন আদেশ করলেন। কাশীধামে গ্রহণের সময় কোন সৎ ব্রাহ্মণ আমার কাছ থেকে দান গ্রহণ করবেন না। কি উপায়ে ও কাকে দান করবো দয়া করে তা বলে দিন।

যিনি কাজ করবার আদেশ দেন তিনিই বলে দেন কর্মপথ। উপায়কণ্টক করেন নাশ।

মহাগুরু ও সদ্‌গুরু তৈলঙ্গস্বামী হেসে বললেন, ঐসব জিনিসের নাম ধরে যিনি ভিক্ষে চাইবেন তাঁকে ওগুলি দিও।

এবার শান্ত হলেন উমাচরণ। তবু মনের কোণে সন্দেহ লুকিয়ে রইলো। একবার তাঁর মনকে নাড়া দিলো। জানালো, এও কি সম্ভব? ঐ দিনে ঐ সময় কে এমন আছেন যিনি ঐসব জিনিস নিজে থেকে নিয়ে যাবেন?

তেসরা মাঘ এলো।

উমাচরণ এই দিনটির অপেক্ষায় অধীর হয়ে বসেছিলেন এতদিন। রাতে গ্রহণ। উমাচরণ তাকিয়ে রইলেন পথের দিকে কে আসবেন তাঁর কাছে তাঁর দান গ্রহণ করতে।

মনে অসীম আশা নিয়ে ক্ষণ গুণতে লাগলেন। ভাবলেন, কখন সেই শুভ মুহূর্ত আসবে যখন মহাপুরুষের বাক্য সফল হবে। পূর্ণ হবে তাঁর আশা।

এমন সময় দেখলেন, এক দুস্থ লোক এসে তাঁর কাছে ঐ জিনিস-গুলি চাইছে।

নির্দ্বিধায় ওগুলি দিয়ে দিলেন উমাচরণ। সে হাসতে হাসতে চলে গেল অন্যত্র।

পরে উমাচরণ ভেবে অবাক হলেন, এ স্বামিজীর মহাকৃপা ছাড়া আর কিছু নয়। যত ভাবলেন ততই বিস্ময় ও আনন্দে মন ভরে গেল। ইচ্ছে করলেন, দৌড়ে গিয়ে দয়াময় সাক্ষাৎ জগদীশ্বরের পবিত্র চরণযুগল বুকে জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু এখনো যে গঙ্গাস্নান হয় নি। জপও বাকী।

স্বামিজীর নির্দেশ, দানের পর গঙ্গাস্নান করবে। তারপর জপে বসে দেহ শুদ্ধ করবে।

উমাচরণ একে একে স্বামিজীর নির্দেশ পালন করলেন। তাঁকে

এসবের জন্যে কিছুমাত্র মাথা ঘামাতে হলো না। স্বামিজীর ইচ্ছেয় সবকিছু নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। তাঁর কাজ করার জন্যে তৈরী করে নিচ্ছেন উমাচরণকে। তাঁর হাতেগড়া শিষ্য উমাচরণ। উমাচরণ যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। যেমন চালাবেন তেমনি চলবেন উমাচরণ।

পরের দিন উমাচরণ পবিত্র পঞ্চগঙ্গায় অবগাহন করে আশ্রমে এলেন। সেদিন ছিল চৌঠা মাঘ।

স্বামিজীকে ভক্তিপ্রণাম জানালেন।

স্বামিজী তাঁকে বসতে বলে বললেন, তোমার দেহ এবার শুদ্ধ হয়েছে।

এরপর গুরু-শিষ্য প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বললেন উমাচরণকে।

তারপর বললেন, আগামীকাল তোমার দীক্ষা হবে।

উমাচরণ প্রশ্ন করলেন, দীক্ষার জন্যে কি কোন জিনিস যোগাড় করতে হবে ?

স্বামিজী বললেন, না। কিছুই যোগাড় করতে হবে না।

উমাচরণের বড় ইচ্ছে স্বামিজীকে মনের সাধ পূর্ণ করে খাওয়ান। একদিন মনের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন স্বামিজীর কাছে। বললেন, আমি আজ আপনাকে কিছু ভোগ দিতে চাই।

স্বামিজী বললেন, আচ্ছা বেশ, আজ ভাত খেতে হবে। আজ কিছু বেগুন এনো।

উমাচরণ তাই শুনে আনন্দে আটখানা। দৌড়ে চলে এলেন বাজারে। কাশীর বিখ্যাত বাজারে। ওখান থেকে কাশীর স্বনামধন্য রামনগরের গোল বেগুন পাঁচ সের কিনলেন। তার সঙ্গে পাঁচ সের সন্দেশও।

গুরুকে কি কেবল বেগুন দেওয়া যায়। মিষ্টি না দিলে যে দেবতার ভোগ সম্পুর্ণ হয় না। আসে না মানসিক তৃপ্তি।

জিনিসগুলি বাজার থেকে যত্নভরে নিয়ে এলেন উমাচরণ স্বামিজীর কাছে। স্বামিজী তাই দেখে মহা আনন্দ উপভোগ করলেন।

পরে মঙ্গলদাসের মা অম্বাদেবীকে বললেন, এইগুলো দিয়ে

তরকারি বানাও। কেবল তরকারি নয়, বেগুন ভাজার ফরমাস দিলেন।

উমাচরণকে চারটে বেগুন দিলেন। বললেন, এগুলি বাড়ীতে নিয়ে যাও। তরকারী করে খেও।

মিষ্টি এনেছিলেন উমাচরণ।

সেই মিষ্টি স্বামিজীকে ভোগ দিলেন অম্বাদেবী।

স্বামিজী জিগেস করলেন, এ কে আনলো?

অম্বাদেবী বললেন, উমাচরণ এনেছেন।

স্বামিজী বিস্ফারিত নেত্রে গম্ভীরস্বরে জিগ্যেস করলেন উমাচরণকে, আমি তো এসব আনতে বলিনি। এসব কেন আনলে?

স্বামিজীর মুখেচোখে কেমন যেন বিরক্তিভাব।

তাই লক্ষ্য করে মনে মনে ভয় পেলেন উমাচরণ। ভাবলেন, এখনি বুঝি একটা কিছু অনর্থ ঘটবে। স্বামিজী রেগে গেছেন। গুরুদেবের ক্রোধবহ্নি শিষ্যের পক্ষে অমঙ্গলের কারণ।

ভয়ে ভয়ে উমাচরণ স্বামিজীকে বললেন, আমার অপরাধ নেবেন না। আপনি দয়া করে এগুলি এবারের মত গ্রহণ করুন।

শিষ্যের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না স্বামিজী। গ্রহণ করলেন কিছু কিছু মিষ্টান্ন।

আধ্‌সের মত প্রসাদ রাখলেন। উমাচরণকে ইসারা করে বললেন, এগুলি তোমরা দু'জনে খেয়ে নিও।

উমাচরণ ও মঙ্গলদাস সন্দেশ খেলেন।

তারপর স্বামিজী বললেন, উমাচরণ! এবার বাসায় যাও।

উমাচরণ গেলেন না বাসায়। বসে রইলেন আশ্রমে। তাঁর একান্ত ইচ্ছে, আজ সাক্ষাৎ দেবতার ভোগ স্বহস্তে গ্রহণ করবেন। বহুদিনের আশা পূর্ণ করবেন। আজ এসেছে সেই শুভলগ্ন। মনে মনে জানতে পেরেছেন উমাচরণ।

একটু পরেই স্বামিজী খেতে বসলেন। খাওয়া শেষ হলে

উমাচরণ দৌড়ে এলেন পাতের কাছে। স্বামিজীকে বললেন, আজ আমাকে আপনার প্রসাদ খেতে অনুমতি দিন।

স্বামিজী বললেন, সেকি! তুমি আমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করবে কেন?

উমাচরণ বললেন, সে কি স্বামিজী! ওকথা বললেন কেন? আপনার উচ্ছিষ্ট যে আমার কাছে মহাপ্রসাদ। অনুমতি দিন যেন আপনার পাতের একটি ভাত কুড়িয়ে খেতে পারি। তাইতেই আমার সকল ক্ষিদের জ্বালা নিরসন হবে।

এবার দয়ালু গুরুর মন গেল বদলে। উমাচরণকে বললেন, তোমার যা ইচ্ছে হয় তুমি তাই গ্রহণ করো। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।

উমাচরণকে এই কথা বলে স্বামিজী ভোজনের আসন ত্যাগ করলেন।

উমাচরণ স্বামিজীর পাতে রাখা ভাত খেয়ে নিলেন। তারপর পাথরের থালা আর বাটি পরিষ্কার করে বাসায় ফিরে এলেন।

ঐদিনই বিকেলে স্বামিজীর কাছে আবার এলেন উমাচরণ। দেখলেন, কতকগুলি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী এসেছে স্বামিজীর কাছে। স্বামিজী তাদের সঙ্গে ধর্মচর্চায় ব্যস্ত।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যে হয়ে এলো। ওদিকে আকাশে মেঘের ঘনঘটা। এখনি বুঝি ইন্দ্রপাত হবে। প্রলয়ের ঝুমুরনৃত্য ভেসে আসছে দূরগগনের মেঘপুঞ্জকে চুম্বন দিয়ে খেয়ালী হাওয়ার পাখায় ভর করে।

মেঘের আড়ম্বর দেখে সন্ন্যাসীরা বিদায় নিলো স্বামিজীর কাছে। ফিরে গেল ওদের আশ্রমে।

উমাচরণও বাড়ী ফেরার জন্যে উসখুস করতে লাগলেন।

স্বামিজী বুঝতে পারলেন উমাচরণের মনোভাব। বললেন, তুমি এখন যেও না। বোসো।

ভেবে অস্থির হলেন উমাচরণ। এই দুর্যোগের সময় স্বামিজী তাঁকে বাড়ী যেতে নিষেধ করছেন কেন?

পরে মুষলধারায় বৃষ্টি নামলো। ঝাড়া ছ'ঘণ্টা অবিশ্রান্ত বর্ষণ হলো। যত দেরী হতে লাগলো ততই বর্ষার বেগ বাড়লো। কমের দিকে গেল না।

উমাচরণও ভেবে অস্থির হলেন। বাড়ীর কথা চিন্তা করলেন। অথচ এই দুর্যোগের মধ্যে পথে বেরুনো অসম্ভব ব্যাপার। মনে মনে কল্যাণময় ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন আর স্মরণ করলেন তৈলঙ্গস্বামীকে। অন্তর্যামী মহাপুরুষ বুঝতে পারলেন ভক্তের মনোবাসনা।

এমন সময় তাঁর চিন্তায় ছেদ এনে স্বামিজী বললেন, এবার বাড়ী যাও উমাচরণ।

উমাচরণ বললেন, এই অবস্থায় কেমনভাবে বাড়ী যাবো? বৃষ্টি থামলে যাবো।

স্বামিজী বললেন, তা হবে না। এই সময় যাও। আর দেরী করো না।

উমাচরণ মহামুস্কিলে পড়লেন। নিরুপায় হয়ে জিগ্যেস করলেন মঙ্গলদাসকে, আজ কি কারণে স্বামিজী আমার প্রতি এমন কঠিন আদেশ করলেন? অকারণে আমাকে মহা কষ্ট পেতে হবে। একে ছাতা নেই, আলো নেই, তাতে এই ভীষণ অন্ধকার। চারদিকে ভীষণ বর্ষণ হচ্ছে। ভয়ঙ্কর মেঘ ডাকছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এই দুর্যোগের মধ্যে কিভাবে যাবো কিছুই ভাবতে পারছি না।

মঙ্গলদাস বললেন, ভয় পাবেন না। বাবা যা বলছেন তাই করুন। এতে তাঁর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

উমাচরণ নির্ভাবনায় স্বামিজীকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে প্রবল বর্ষণ হচ্ছে। অথচ কি আশ্চর্য, উমাচরণের গায়ে একবিন্দু জলও পড়লো না। দেহ একেবারে শুকনো। যতই একথা ভাবতে লাগলেন উমাচরণ, ততই হলেন বিস্মিত।

বুঝতে পারলেন, এ স্বামিজীরই মহা কৃপা। তাঁর কৃপা ছাড়া এরকম ব্যাপার কখনই সম্ভবপর হয় না।

আর একটি দৃশ্য দেখে অবাক হলেন উমাচরণ। দেখলেন, তাঁর আগে আগে কে একজন আলো হাতে চলেছে।

আলোর দ্যুতি পথের অন্ধকাব দূর করেছে। উমাচরণ চেষ্টা কবলেন ছুটে গিয়ে ঐ লোকটিকে ধবে ফেলতে। কিন্তু যত এগিয়ে গেলেন ততই ঐ লোকটি এগুতে লাগলো।

দু'জনের মধ্যে সমান দূরত্ব সবসময় রইলো। কেউ ক্ষণিকের জন্যে কারও কাছে এলো না।

পরে উমাচরণ বাড়ীতে এলেন। বাডীতে প্রবেশ করার আগেই ঐ আলো নিভে গেল। লোকটিকেও আর দেখা গেল না।

লোকটিকে দেখতে না পেয়ে উমাচরণ আরও বিস্মিত হলেন।

একবার ভাবলেন, এ কি কবে সম্ভব হলো? আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমাব ওপর ঠাকুরেব এত কৃপা হচ্ছে কেমন করে!

আর একবার ভাবলেন, না, এসব কৃপা নয়. ভৌতিক ব্যাপার হতে পারে।

কিন্তু নিজের মনের ভুল নিজেই বুঝতে পারলেন। মনের কোণে কি যেন খুঁজে পেলেন। সত্যেব আলো। সেই আলোয় দেখতে পেলেন নিজের বিবেককে। তার সঙ্গে নিজের গুরুদেবকেও।

গুরুদেব তাঁর দিকে তাকিয়ে আশীর্বাদ করছেন।

তখন উমাচরণ বারংবাব প্রণাম জানালেন। ভাবলেন. এইজন্যে অর্থাৎ তাঁর অপার লীলারহস্য জানাবার জন্যে গুরুদেব তাঁকে এই দুর্য্যোগের রাতে একাকী বাড়ী ফিরতে আদেশ কবলেন।

আগে গুরুদেবের ঐরকম আদেশের ওপর উমাচরণের সঙ্কোচ এবং দ্বিধা ছিল। এখন উমাচরণ তাকে পরম আশীর্বাদজ্ঞানে গলায় ধারণ করেছেন।

যিনি পতিতপাবন, যিনি বিপদতারণ তিনি ইচ্ছে করলে জীবকে যেমন বিপদে ফেলেন তেমনি তাকে উদ্ধারও করেন। যিনি শাস্তি-দাতা তিনি উদ্ধারকর্ত্তাও বটে। এই দুই শক্তি তাঁতে রয়েছে। তিনি

লীলাময়। জীব নিয়ে তাঁর লীলারহস্য ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এই বিরাট বিশ্বসংসারে। আর সেই লীলায় বৈচিত্র আনার জন্যে তাঁর ঐ দু'রকম শক্তির প্রকাশ।

পরদিন প্রভাতে উমাচরণ এলেন আশ্রমে।

আজ তাঁর দীক্ষার দিন। পঞ্চগঙ্গার ঘাটে গুরুশিষ্য অবগাহন করবার জন্যে নামলেন।

স্বামিজী দু'ঘণ্টাকাল গঙ্গায় অবগাহন করলেন। ইতিমধ্যে উমাচরণ স্নান শেষ করে ঘাটের সিঁড়ির ওপর এসে বসলেন।

পরে স্বামিজীর স্নান হয়ে গেল।

উমাচরণ তাঁকে জল থেকে নিয়ে এলেন। গা-হাত-পা গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিলেন।

স্বামিজী উমাচরণের কাঁধে হাত রেখে বসলেন। মাঝে মাঝে তাঁর চাপ এত বেশী হলো যে উমাচরণ তা সহ্য করতে পারলেন না। তবু সইতে হবে। কারণ এ যে গুরুর পরীক্ষা। দীক্ষা দেওয়ার আগে বাজিয়ে নিচ্ছেন শিষ্যকে। শিষ্য হতে চলেছেন শক্তির পূজারী। তার আগে তিনি যদি মানুষের দেওয়া শক্তিব বেগ সহ্য করতে না পারেন তবে তো মহাশক্তির শক্তিবেগ হৃদয়ে ধারণ করতে সক্ষম হবেন না। পারবেন না তাঁর কৃপার অধিকারী হতে।

আশ্রমে এসে উমাচরণ বসলেন স্বামিজীর সামনে। স্বামিজী বসলেন বেদীর ওপর। আরও অনেক ভক্ত এলেন স্বামিজীকে দেখতে।

চারদিকে ধূপধুনো জ্বালা হলো। কেউ স্তোত্রপাঠ করলো, কেউ বা শ্যামাসংগীত গাইলো।

পরে ওরা নানারকম ধর্মকথা আলোচনা করে একে একে বিদায় নিলো স্বামিজীর কাছ থেকে।

এবার স্বামিজী বেদী থেকে নেমে এলেন। বসলেন উমাচবণের সামনে। ঘরে আর দ্বিতীয় জন নেই।

কানে কানে বীজমন্ত্র দিলেন স্বামিজী উমাচরণকে। তারপর ক্রিয়াপদ্ধতি বলে দিলেন।

সেই সকল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন উমাচরণ।

দীক্ষান্তে স্বামিজী পুনরায় বেদীর ওপর গিয়ে বসলেন।

বললেন উমাচরণকে, দেখ, বিষয়কাজের জন্যে যে কথা না বললে কাজ সফল হবে না কেবলমাত্র সেই কথা বলবে। নচেৎ বৃথা বাক্য বা গল্প করে সময় কাটাবে না। বৃথা কথা বললে তেজক্ষয় হয়। আর একটা কথা জেনে নিও, কখনো কারও ধর্মে বিদ্বেষ করো না। যার যে ধর্মে বিশ্বাস তার তাতেই মুক্তি। আহারাদিতে ধর্মের হানি হয় না। কেবল মুক্তি পেতে দেরী হয়। মুসলমানেরও মুক্তি হয়ে থাকে। ব্যাকুল হয়ে ভক্তিভাবে যিনি তাঁকে ডাকবেন তিনিই তাঁকে পাবেন।

স্বামিজী আবার বললেন, যে সব ঘটনা দেখে এখন তুমি মোহিত হচ্ছো এর কোনটাই আশ্চর্য নয়। মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ হয় তবে সকলেই এই সব কাজ করতে পারে। কেবল আহার বিহার ও বিষয়সম্ভোগ করার জন্যে মানুষের সৃষ্টি হয় নি। ভগবানের যেসব শক্তি আছে মানুষেরও ঠিক সেই সব শক্তি আছে। ভগবান মানুষকে মনের মত তৈরী করে তাতে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করেছেন। কেউ সেই শক্তির ব্যবহার করতে জানেন না। যাঁর থেকে এই পৃথিবী ও কাজ করার, কথা বলার, কথা বোঝার ও চলার শক্তি পেয়েছি, যিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, তাঁকে জানার বা দেখার ইচ্ছে কারও নেই। যদি কখনো কারও ইচ্ছে হয় তবে প্রণালী অনুসারে কাজ করতে না জানায় দশ দিন মধ্যে দেখা না হলেই সে কাজ ছেড়ে দিয়ে নাস্তিক হয়ে পড়ে। যিনি অন্তরের সঙ্গে তাঁকে পাবার চেষ্টা করবেন তিনি নিশ্চয়ই পাবেন। এই পৃথিবীর নিশ্চয়ই একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, যিনি সকলসময় সকলস্থানে রয়েছেন তিনিই 'ঈশ্বর'। তিনি সমস্ত পৃথিবী ব্যেপে রয়েছেন, কেবল জ্ঞান ও বিচারের দ্বারা তাঁকে খুঁজে বের করা চাই। যে জিনিস আছে তা চেষ্টা করলে অবশ্যই পাওয়া যায়।

একমনে শুনে গেলেন উমাচরণ স্বামিজীর উপদেশ। মাঝে মাঝে

মনে খটকা লাগল। প্রশ্ন করলেন গুরুদেবকে, সত্যি সত্যিই কি ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায়?

স্বামিজী বললেন, সাধনা আর গুরুর কৃপা থাকলে সত্যিই তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। তুমি কি তাঁকে দেখতে চাও?

অন্তরে গভীর আগ্রহ নিয়ে বললেন উমাচরণ, প্রভু আজ আমার কি সৌভাগ্য! আজ আমার জীবন সার্থক। আমি স্বয়ং ভগবানকে গুরুপদে বরণ করেছি। আপনি ভগবান। তাইতো আপনার দ্বারা তাঁকে দেখতে পাব।

স্বামিজী সহাস্যে বললেন, বেশ, আজ রাতে তোমার আশা পূর্ণ হবে। তুমি এখন বাড়ী যেতে পারো। বেলা হয়েছে।

উমাচরণ বাড়ী ফিরে এলেন। আর কোন কথাবার্ত্তা হলো না স্বামিজীর সঙ্গে।

প্রতিদিনের মত আহার-নিদ্রায় কাটালেন সারা দুপুরটা।

সন্ধ্যেবেলায় উমাচরণ এলেন স্বামিজীর কাছে। স্বামিজী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

উমাচরণ এসে স্বামিজীকে প্রণাম করলেন। তারপর স্বামিজীর কাছে এসে বসলেন।

একটু পরেই স্বামিজী উমাচরণকে নিয়ে ছোট ঘরটিতে এলেন। বসলেন একটি আসনে। উমাচরণও বসলেন সেইখানে।

পরে স্বামিজী উমাচরণকে বললেন, আমার বেদীর কাছে ছোট ঘরে যে কালী মূর্ত্তি আছেন তাঁকে দেখে এসো।

মন্দিরে গেলেন উমাচরণ। দেখে এলেন পাষাণী মাকে। দেখলেন, লোলজিহ্বা ভীষণা মূর্ত্তি নিয়ে মহাকালী তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। ভয় এবং ভক্তিমিশ্রিত ভাব নিয়ে মাকে করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করলেন উমাচরণ।

পরে এসে বললেন স্বামিজীর কাছে, মাকে দেখে এলুম। তিনি ত পাষাণমূর্ত্তি নিয়ে মন্দিরে রয়েছেন।

স্বামিজী বললেন, তুমি কি মাকে এখানে দেখতে চাও ?

উমাচরণ বললেন, গুরুদেব ! এমন কি সৌভাগ্য করেছি যে তাঁকে এখানে দেখবো। আপনি দীনের প্রতি দয়া করে দেখালে কৃতার্থ হই।

ভক্তের আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ করেন ভগবান। শিষ্যের বাসনা পূর্ণ করলেন স্বামিজী। ধ্যানে বসলেন। প্রায় একঘণ্টা।

সামনে বসেছিলেন উমাচরণ।

এক ঘণ্টা পরে ধ্যান ভাঙলো স্বামিজীর কি সুন্দর অলৌকিক এবং দিব্যভাবের প্রকাশ দেখা গেল তাঁর সর্বশরীরে। এক অপরূপ জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে বসে আছেন যেন তিনি। মনে হলো, এখনি তিনি ফিরে এলেন দেবভূমি থেকে।

স্বামিজী আদরের সুরে জগৎমাতাকে ডাকলেন, মা, এখানে এক-বার এসো। উমাচরণ তোমাকে দেখতে চায়।

যোগী এবং ভক্তের আহ্বান কখনো ব্যর্থ হবার নয়। তিনিই পারতেন অসীমকে সসীমের মধ্যে আনতে, নিরাকারকে দেখতে পেতেন সাকারের রূপে।

ক্রমে উমাচরণ দেখলেন মহাপুরুষের অলৌকিক ক্রিয়া কৌশল। তাঁর সুন্দর সুমিষ্ট আহ্বান শুনে মহামায়া এলেন। বালিকার মূর্ত্তিতে পাষাণী মা এসে দাঁড়ালেন ভক্ত সন্তান তৈলঙ্গস্বামীর কাছে। টুকটুকে ফর্সা।—অপরূপা সুন্দরী বালিকা। মুখে মৃদুমন্দ হাস্যলহরী। সর্বাঙ্গে স্নেহের প্রস্রবণ উথলে উঠছে।

চারদিক অন্ধকার। মন্দিরপ্রকোষ্ঠে জ্বলছে ক্ষীণ দীপশিখা। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে উমাচরণ দেখে নিলেন মহামায়ার সাকার রূপ।

মহামায়ার ললাটে জ্বলছিল আকাশের তারার মত দ্যুতিমান ত্রিনয়ন। মা প্রশান্ত বদনে তাকিয়ে রইলেন উমাচরণের মুখপানে।

মায়ের দিব্যমূর্ত্তি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই উমাচরণের জ্ঞান হারিয়ে ফেলার উপক্রম হলো।

মায়ের অত্যুজ্জ্বল শরীরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু অন্তরের প্রার্থনা—ভক্তির প্রণাম নিবেদন করতে পারলেন না। হাত পা অনড়। বিস্ময়ে হতবাক তিনি।

এমনিভাবে কিছুক্ষণ কাটলো।

পরে গুরুদেব তাঁকে জাগিয়ে বললেন, মন্দিরে আবার যাও। দেখে এসো মা সেখানে আছেন কি না।

ধীর পদক্ষেপে মন্দিরে এলেন উমাচরণ। দেখলেন, মায়ের বেদী শূন্য। মায়ের পাষাণী মূর্ত্তি নেই বেদীর ওপর। শিলাময় বেদী মাতৃমূর্ত্তি বিহনে নিষ্প্রভ এবং বোরুদ্যমান।

উমাচরণ তখনি চলে এলেন স্বামিজীর কাছে। মুখেচোখে ভয় এবং বিস্ময়ের রেখাপাত।

তাঁর মনোভাব বুঝতে পারলেন স্বামিজী। সহাস্যে বললেন, আমার কাছে এসো। মার ঘরে গিয়ে দেখে এলে তো। কিছু দেখতে পেলে কি?

উমাচরণের মুখে কথা নেই। মৃদুমন্দ বাতাস তাঁর শরীরকে আলিঙ্গন করে স্তব্ধ হয়ে গেল। কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না উমাচরণ। স্বামিজীর মুখপানে মৌন বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

অবশেষে গুরুদেব পুনরায় তাঁকে আদেশ দিলেন, মন্দিরে আবার যাও উমাচরণ। দেখে এসো মা সেখানে আছেন কিনা।

উমাচরণ গেলেন মাকে দেখতে। এবারও তেমনি অবস্থা। বেদী শূন্য পড়ে আছে। মা সেখানে নেই।

স্বামিজীর কাছে ফিরে এলেন নীরব ভাষা নিয়ে।

স্বামিজী আবার প্রশ্ন করলেন, কি, মন্দিরে মাকে দেখতে পেলে?

এবার সশব্দ উত্তর এলো ভক্তের কাছ থেকে। উমাচরণ দ্বিধাহীন চিত্তে বলে উঠলেন, না, মা তো ওখানে নেই।

স্বামিজী উমাচরণকে কাছে বসতে বললেন।

উমাচরণ বসলেন স্বামিজীর কাছে। পরম আশ্রয়ের সন্নিধানে এসে পেলেন মনের অন্তরে পরম সুখের সন্ধান।

স্বামিজী উমাচরণকে বললেন, এবার মাকে দেখো তো।

উমাচরণ সামনে মহামায়াকে দেখলেন। এবার মায়ের মূর্ত্তি অন্য রকম। দেখলেন, আগের মত সব ঠিক আছে। কেবল জিবটা বাইরে নেই। পায়ের নীচে নেই মহাদেব।

স্বামিজী বললেন, মাকে প্রণাম করো উমাচরণ।

উমাচরণ মায়েব পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চরম অনুভূতি পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন, মায়েব পা এতো নরম হলো কেমন করে? পাষাণী মা কী মানবী হতে পারেন?

এমনি নানারকম চিন্তা জাগলো উমাচবণের মনে। স্বামিজী অকস্মাৎ তাঁর মনের চিন্তায় ছেদ এনে বললেন, বেশ ভাল করে দেখে নাও উমাচরণ। যেন পবে আর কোন রকম আক্ষেপ করতে না হয়।

ভাল করে দেখে নিলেন উমাচরণ। যতক্ষণ দেখলেন মাকে ততক্ষণ তাঁর মনপ্রাণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। বাক্‌স্ফূরণ হলো না।

এবার স্বামিজী মাকে বললেন, মা এখন তাহলে এসো। উমাচরণ তোমাকে দেখে নিয়েছে।

ভক্তের কথামত মহামায়া চলে গেলেন। বেদীর ওপবে উঠে পাষাণমূর্ত্তিতে বিরাজ করতে লাগলেন।

এই অলৌকিক ব্যাপার দেখে উমাচরণ অবাক হলেন। প্রশ্ন করলেন গুরুদেবকে, পাষাণ কিভাবে চলতে পারে? যা দেখলুম এ অতি অসম্ভব।

স্বামিজী বললেন, তোমার জড় দেহ কেমন করে চলে?

উমাচরণ বললেন, মানুষের দেহে আত্মা ও চৈতন্য আছে। সেই-জন্যে চলতে ও বলতে পারে।

স্বামিজী বললেন, সিদ্ধ সাধকের গুণে যখন মাটী, পাথর ও ধাতুতে আত্মা ও চৈতন্যের সঞ্চার হয় তখন সেই মূর্ত্তিও চলতে, বলতে, শুনতে ও কাজ করতে পারে।

আহা! কি সুন্দর কথা। কি সহজ ও সরল উপদেশ! এমন সহজভাবে ঐশ্বরিয় গুহ্য কথা আগে ত শোনেন নি উমাচরণ। এ যেমনি নতুন তেমনি অশ্রুতপূর্ব। অনিন্দ্যসুন্দর।

গুরুদেবের যুক্তি শুনে শান্তি ও আনন্দ পেলেন উমাচরণ।

সেদিনের মত আশ্রম ত্যাগ করে বাসায় ফিরলেন।

আর একদিন উমাচরণ এলেন স্বামিজীর কাছে।

স্বামিজী বেদীর ওপর বসে ছিলেন। ভক্ত উমাচরণ এসে সামনে বসলেন।

স্বামিজী তাঁর হাতে দু'খানা কচুরী দিয়ে বললেন, খেয়ে নাও।

তাই তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে ফেললেন উমাচরণ। তারপর ছোট ঘরে উমাচরণকে নিয়ে এলেন স্বামিজী।

পরে উমাচরণকে বলে দিলেন কি উপায়ে আত্মদর্শন করতে হয়।

তারপর বললেন, দেখ উমাচরণ! এখন থেকে তুমি বাঁধা পড়লে। প্রতিদিন নিয়মমত কাজ করবে। কোন মতে অবহেলা করবে না। তোমার জন্যে যেন আমাকে খাটতে না হয়। দিনে সুবিধে না হলে সন্ধ্যের সময় করবে। যদি সন্ধ্যের সময় সুবিধে না হয় তবে শেষ রাতে কাজ করা চাই। সময় পাইনা বললে চলবে না। যদি তুমি ফাঁকি দাও তাও আমি জানতে পারবো।

স্বামিজী পুনরায় বললেন, আগেই বলেছি, ভগবান মানুষকে মনের মত গড়ে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করেছেন। সেইজন্যে মানুষ যে ভগবানের সমান কাজ করতে পারে তা আজ তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাব। দেখলেই বেশ জানতে পারবে যে মানুষই ঈশ্বর। তিনি আত্মারূপে হৃদয়ে এবং পরম ব্রহ্ম-রূপে মাথায় বাস করছেন। আমি নামে যে মানুষের দেহ এটা কিছুই নয়, সমস্তই তিনি ও সবই তাঁর। আমি কিছুই নই। আমার কিছু নেই এ সর্বদা মনে করবে। সম, সৎসঙ্গ, বিচার ও আনন্দ এই চারটে বিষয়কে সর্বদা সঙ্গী করবে। ধর্মবিষয় নিয়ে কখনো কারও

সঙ্গে তর্ক কোরো না। ধর্ম নিয়ে যেখানে বচসা হচ্ছে দেখবে সেস্থান ত্যাগ করবে। শুনে থাকবে মাকালী এসে ভক্ত রামপ্রসাদ সেনের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু বলো দেখি তিনি কি কখন কোন লোকের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে তর্ক অথবা নিজের ধর্মে কাউকেও আনবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন ?

এবার স্বামিজী ধ্যানস্থ হলেন।

প্রায় একঘণ্টা এমনিভাবে কাটলো।

উমাচরণও চোখ বুজিয়ে বসে রইলেন স্বামিজীর সামনে।

একঘণ্টা পরে স্বামিজীর ধ্যান ভাঙলো।

তিনি উমাচরণকে বললেন, এবার চোখ মেলে চাও দেখি। বলো দেখি, আমরা কোথায় আছি ?

উমাচরণ চোখ মেলে তাকালেন। এক অপরূপ দৃশ্য দেখে বিস্মিত হলেন।

দেখলেন, ছোট ঘরের মধ্যে তিনি বসে নেই। গঙ্গার মাঝখানে একটি সুন্দর পালঙ্কের ওপর রয়েছেন। পালঙ্কের অভ্যন্তরে বিন্যস্ত রয়েছে স্বর্ণের আরামশয্যা। তার ওপর রয়েছে তোষক। তোষকের ওপরে একখানা শুভ্রবর্ণের আস্তরণ। তিনদিকে তিনটি বালিশ। তাও সাদা রঙের। তার ওপর ভাল মশারি টাঙানো। তার মধ্যে স্বামিজী ঠিক মহাদেবের মত সর্বাঙ্গে বিভূতি নিয়ে শুয়ে আছেন। উমাচরণ তাঁরই কাছে বসে আছেন।

উমাচরণ এই সকল বাক্য পূর্ণভাবে প্রকাশ করলেন স্বামিজীর কাছে।

স্বামিজী বললেন, যদি গঙ্গার মাঝখানে হয় তাহলে গঙ্গার জল আছে কিনা তা দেখো।

উমাচরণ মাথা নীচু করে নিজের হাতে জল ওঠালেন। মনে মনে বড় ভয় হতে লাগলো, যদি পালঙ্ক ডুবে যায়। এই আশঙ্কায় স্বামিজীর পদযুগল স্পর্শ করে রইলেন। ভবপারের কাণ্ডারী স্বয়ং সশরীরে বর্তমান। তাঁকে ধরে থাকলে আর ভয় কিসের।

এবার স্বামিজী বললেন, উমাচরণ, এবার তুমি চোখ বুজিয়ে বসো তো।

কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী জিগ্যেস করলেন, বলোত আমরা এখন কোথায় আছি ?

উমাচরণ নয়নদ্বয় উন্মুক্ত করে দেখলেন, আশ্রমে বসে রয়েছেন। স্বামিজী শুয়ে রয়েছেন সেই বেদীর ওপর। তাঁর সামনে মেজেতে বসে উমাচরণ।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন উমাচরণ। মনে মনে ভাবলেন, একি আশ্চর্য ! এ যে ভৌতিক ব্যাপার ! মানুষের দ্বারা এ কি সম্ভব ! দেবতারাও বোধ হয় এ রকম পারেন না।

অন্তর্যামী গুরুজী বুঝতে পারলেন শিষ্যের অন্তরের কথা।

অমনি বলে উঠলেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ হয় তবে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। এত রকম ঘটনা দেখাবার কারণ তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হবে। নিজে এই রকম সকল বিষয় আয়ত্বাধীন করতে পারবে।

তারপর স্বামিজী বললেন, বাড়ী যাও। কাল আবার এসো।

বাসায় ফিরে এলেন উমাচরণ।

গুরুর কষ্ট শিষ্য সহ্য করতে পারেন না।

তৈলঙ্গস্বামী একটি মাত্র কম্বলে শুতেন আর তাই গায়ে দিতেন।

তাই দেখে দুঃখিত হলেন উমাচরণ। গুরুদেবের কষ্ট লাঘব করার জন্যে বাজার থেকে একজোড়া আলোয়ান এবং একটি চাদর নিয়ে এলেন।

আশ্রমে এসে আলোয়ানজোড়াটি গুরুদেবের গায়ে ফেলে দিলেন।

ঐ দৃশ্য দেখে ক্রুদ্ধ হলেন স্বামিজী।

ভক্ত উমাচরণের মনে ভীতির সঞ্চার হলো।

মনে করলেন, এমন তেজী পুরুষ ক্রুদ্ধ হলে আর বাঁচবার উপায় নেই। এখনি বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ অভিশাপ দেবেন। তাতে হবে মহাপাপ। জন্মজন্মান্তরেও তা ঘুচবে না।

তৈলঙ্গস্বামী উমাচরণের মৌনভাব ভেঙ্গে দিয়ে বললেন, এখনি বাজারে যাও। দোকান থেকে নিয়ে এসো দু'খানা কম্বল।

গুরুর আদেশ। লঙ্ঘন করার সাধ্য ছিল না উমাচরণের। তিনি তখনি চলে গেলেন বাজারে। নিয়ে এলেন দু'খানা কম্বল।

একখানা কম্বল পাতা হলো বেদির ওপর আর একখানা গায়ে দিলেন স্বামিজী।

কিন্তু ছদ্মবেশী শঙ্কর অনাদি ত্রিলোকনাথ কি অঙ্গে ভূষণ ধরতে পারেন? তিনি যে সকল সময় নিরাবরণ শরীরে যোগমগ্ন। বাইরের ভূষণ—নিছক লোকাচার, তাঁর জন্যে নয়।

একদিন স্বামিজী উমাচরণকে ডেকে বললেন, উমাচরণ, এই আলোয়ানটি তুমি নাও। ব্যবহার করো।

উমাচরণ প্রথমে আপত্তি জানালেন। বললেন, গুরুদেব! আমি ও জিনিস কিভাবে নিতে পারি। ওটি নিলে আপনার যে কষ্ট হবে।

স্বামিজী সহাস্যে বললেন, তুমি যা ভেবেছ তা মোটেই না উমাচরণ। আমি যা বলছি তা শোন।

পরে উমাচরণ স্বামিজীর কথামত গ্রহণ করলেন আলোয়ানটি।

মঙ্গলদাসকে ডেকে স্বামিজী বললেন, এই চাদরটা তুমি নাও।

বেদির ওপব একখানি চাদর পাতা ছিল। সেই চাদরটি স্বামিজী মঙ্গলদাসকে দিয়ে দিলেন। কেননা, ও বৃদ্ধ হয়েছে। কাশীধামের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছিল।

এরপর একদিন স্বামিজী উমাচরণকে ডেকে বললেন, এসব ঘটনা যা দেখলে এবং এসব কথাবার্তা যা শুনলে তা কোন অবিশ্বাসী লোকের কাছে বোলো না। ধর্ম আশ্রয় করে সংসারে থাকবে। সর্বদা সাবধানে থেকে কাজকর্ম করবে। কখনো আসল কাজ ছেড়ো না। সকল বিষয়েই তোমাকে দেখিয়ে, বুঝিয়ে ও শিখিয়ে দিলুম। তুমি আর এখানে থেকো না। এই কয়েকটি দিন পরে তুমি চাকরীস্থানে চলে যেও।

স্বামিজীর শেষের কথাটি শুনে স্তম্ভিত হলেন উমাচরণ। ভাবলেন, একি আদেশ করছেন গুরুদেব! সংসার যে আমার ভাল লাগে না। আর আমি সংসারে ফিরে যাব না। ওখানে আছে অশান্তি। আমি এখন পরম শান্তির আশ্রয়—শ্রীগুরুর পাদপদ্ম লাভ করেছি। এখানেই থেকে যাব।

উমাচরণ মনের মধ্যে সাহস এনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন গুরুদেবকে, আমি আর চাকরীস্থানে ফিরে যাবো না। আপনার কাছে থাকবো।

স্বামিজী বললেন, তুমি বিয়ে করে এসেছ আমি কি তার ভরণ-পোষণ করবো? তোমার আব এখানে থাকা হবে না।

বিনয় বচনে বললেন উমাচবণ, আমার ইচ্ছে ছিল হরিদ্বারে যাই। কিন্তু এখন অকাল। আর এই সময় যদি যাওয়া না হয় তাহলে আমার ভাগ্যে ইহজীবনে আব ঘটবে না।

স্বামিজী শুনে বললেন, আগামী সংক্রান্তির দিন প্রভাতে অযোধ্যা ত্যাগ করে প্রয়াগে যাবে। অযোধ্যায় বামদাস স্বামীর সঙ্গে দেখা করবে। তিনি সরযূর ধাবে ঝরণার ওপর থাকেন। প্রয়াগে সুরদাস বাবাজীকে দেখবে। তারপর যেও হরিদ্বারে।

স্বামিজীর কথামত বেরিয়ে পড়লেন উমাচরণ। বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করলেন।

তীর্থ ভ্রমণের পূর্বদিন উমাচরণ স্বামিজীকে বললেন, গুরুদেব, দয়া করে আপনি আমাকে সমস্ত বিষয় দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি যে পাশ হতে মুক্ত হলুম তার কিছু প্রমাণ দেখিয়ে আমার সন্দেহ দূর করে দিন।

স্বামিজী বললেন, তোমার বিশ্বাসের জন্যে বলে দিচ্ছি, তোমার করপল্লবের ওপরের চর্মস্তর উঠে যাবে।

স্বামিজীর কথা পরে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল।

উমাচরণের হাতেব চামড়া উঠে গেছ্‌লো অল্পকালের মধ্যে।

উমাচরণ স্বামিজীকে প্রণাম জানালেন। এবার বিদায় প্রার্থনা

করলেন, আমাকে বিদায় দিন গুরুদেব। আশীর্বাদ করুন আমি যেন আপনার কথামত নির্দিষ্ট পথে চলতে সক্ষম হই।

স্বামিজী বললেন, যদি কখনও কোন বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে একাকী আমার কাছে এসো।

উমাচরণ ধীরে ধীরে প্রণাম করলেন স্বামিজীর শ্রীপাদপদ্মে মাথা রেখে।

স্বামিজী দু'হাতে আশীর্বাদ জানালেন পরম ভক্তকে। বললেন, তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক।

একদিন শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এলেন স্বামিজীর কাছে। তিনি মুঙ্গেরের আর্যধর্ম প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা।

উমাচরণের কাছে স্বামিজীর অলৌকিক ভাবের কথা জেনেছেন। তাই মনের কৌতূহল এবং আনন্দ মেটানোর উদ্দেশ্যে এসেছেন বারাণসীধামে—মর্তের স্বর্গে। সাক্ষাৎ শিবকে দেখবেন প্রাণভরে।

শ্রীকৃষ্ণের মনে সামান্য অহংভাব ছিল।

তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে দেখা হলে স্বামীজী তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখ শ্রীকৃষ্ণ! তোমার মনে মনে বড় অহঙ্কার হয়ে তুমি স্থির করেছ, আগে যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন তেমনি তুমিও নিজেকে সেইরূপ ভাব। ভাব, সকলে তোমাকে পূজো করবে। তোমার পায়ের ধূলো নেবার জন্যে বামুনের ছেলেকেও পা বাড়িয়ে দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা লজ্জাবোধ করো না। তোমার ভবিষ্যৎ ফল বড় শোচনীয়। তুমি একজন সামান্য মানুষ মাত্র। তবে কিছুমাত্র বক্তৃতাশক্তি আছে। দেখ, যখন লোক লুচি ভাজে প্রথমে লুচি বেলে ঘিয়ে ছেড়ে দেয়। যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণ কল্‌কল্ করে শব্দ হয়ে থাকে। তারপর যখন পাকে তখন স্থির হয়ে ঘিয়ের ওপর ভাসতে থাকে। এখন তোমার অত্যন্ত কলকলানি হয়েছে। আগে তোমার কলকলানি

থামুক তারপর যদি ধর্মের কাছে যেতে পার। উপস্থিত তুমি ধর্ম হতে অনেক দূরে আছ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন স্বামিজীর কথায় থ বনে গেলেন। কাছেই বসেছিলেন উমাচরণ। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনিও কিছু বললেন না।

কিছুক্ষণ উভয়ে মৌনী রইলেন। পরে স্বামিজীর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিপ্রণাম নিবেদন করে উভয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন স্বামিজীর কথা শুনে অতিশয় লজ্জিত হলেন। পথে চলবার সময় উমাচরণের সঙ্গে কোন কথা বললেন না।

হালিসহরেব যদুনাথ বাগচি এলেন স্বামিজীর সঙ্গে দেখা কবতে।

স্বামিজী বললেন, দেখ যদুনাথ! তুমি অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ কবে খারাপ হয়ে গেছ। এখনো নিজের মনকে স্থিব কবতে পার না। আগে নিজের মনকে স্থিব করো তবে পাবে মুক্তির পথ।

যদুনাথ বললেন, আজ্ঞে, আমি আপনার কাছে দীক্ষা নিতে চাই।

স্বামিজী বললেন, আমাব কাছে দীক্ষা নিতে চাও কিন্তু আমি তো তোমায় দীক্ষা দিতে পাববো না। আমি পাঁচজন শিষ্য করেছি। আব কাউকে শিষ্য কববো না। দীক্ষাদান মহাপাপের কাজ। শিষ্যকে যা উপদেশ দেওয়া হয় সে যদি তা না করে তবে গুরুকে সেই সমস্ত কর্ম করতে হয়। না করলে মহাপাপ হয়। সর্বদা শিষ্যের উদ্ধারের জন্যে তাব প্রতি নজব রাখতে হয়। আমি আর পাপে লিপ্ত হবো না। তবে আমার মত উপযুক্ত লোক আমার দ্বিতীয় শিষ্য কালীচরণ স্বামী তোমাকে দীক্ষা দেবেন। দীক্ষা নেবার আগে তোমার দেহ শুদ্ধ হওয়া উচিত।

যদুনাথ বললেন, কেমন করে দেহ শুদ্ধ হবে?

স্বামিজী বললেন, আগামী বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে কাশীধামে এসে সৎ ব্রাহ্মণকে দিয়ে এই কাজ করবে।

স্বামিজী পুনরায় বললেন, তুমি অফিসের একজন বড়বাবু। অনেক বিষয় তোমাকে চিন্তা করতে হয়। কিন্তু কয়েক বছর থেকে নিরামিষ খাচ্ছ। কিছুদিন পরে ভয়ানক গায়ের জ্বালা ধরবে। যদি শরীর সুস্থ রাখতে চাও তবে বাড়ী ফিরে মাছ খাও। আর যদি চাকরী ছেড়ে দাও তবে মাছ খাবার দরকার নেই।

একটু থেমে স্বামিজী আবার বললেন, দেখ যদুনাথ। গোঁড়া হিন্দু হওয়া ভাল নয়। একদিন জামালপুরে তোমার অধীনস্থ এক কর্মচারী প্রস্রাব করার সময় কানে পৈতে দেয়নি। সে বামুনের ছেলে। তাতে তুমি তার ওপর চটে গিয়ে তার উন্নতির পথ বন্ধ করে দেবার ইচ্ছে করেছ। এতে বোঝা যাচ্ছে, তুমি কানে পৈতে দেবার প্রকৃত কারণ জানো না। এর কারণ কি জান?

যদুনাথ মনে মনে অবাক হলেন। ভাবলেন, ইনি সত্যিই একজন মহামানব—অন্তর্যামী যোগী। আমার পূর্ব জীবনের অপকর্মের কথা ইনি জানতে পেরেছেন অপূর্ব যোগবলে।

যদুনাথ কাতরস্বরে বললো, আপনি বলুন। আমি ঠিক জানি না।

স্বামিজী বললেন, পৈতে শুচি আর মূত্র অশুচি। পাছে পৈতেয় মূত্রের ছিটে লাগে সেই কারণে দুই তিন ফের কানে জড়িয়ে নিতে হয়।

বিস্মিত হলেন যদুনাথ স্বামিজীর কথা শুনে। পরে যদুনাথ স্বামিজীর নির্দেশমত দেহশুদ্ধি ক্রিয়া করলেন। তাঁর দ্বিতীয় শিষ্য কালীচরণ স্বামীর কাছে দীক্ষা নিলেন।

ঈশ্বরের ওপর একান্ত নির্ভরশীল হলে তিনি রক্ষা করেন ভক্তকে। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তৈলঙ্গস্বামীর কৃপা ছিল একান্ত নির্ভরশীল ও ভক্ত উমাচরণের ওপর। তাঁর আর ভয় কিসের! শত রকম আপদে বিপদে গুরুর আশীর্বাদ আর কৃপা লাভ করতেন। মুক্ত হতেন সর্ব বিপদজাল হতে—মানুষের তৈরী নানারকম ফন্দিফিকির হতে।

মুঙ্গেরের এক ডাক্তারখানায় চাকরী করতেন উমাচরণ। সেই

ডাক্তারখানায় যিনি ম্যানেজার তাঁর নাম মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। লোকে তাঁকে ডাকতেন মাষ্টারমশাই বলে। কারণ আগে তিনি ছিলেন শিক্ষক। উমাচরণও তাঁকে বলতেন মাষ্টারমশাই।

একদিন মাষ্টারমশাই বললেন, দেখ উমাচরণ। দোকানের তু'শো টাকার তহবিল কম হচ্ছে। মনে করে দেখ দেখি, এই টাকা কাউকে দেওয়া হয়েছে কিনা?

উমাচরণের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ভেবে অস্থির হলেন। লোহার সিন্দুকে থাকে টাকা। সেই ঘরে শুয়ে থাকেন উমাচরণ। ঐ সিন্দুকের চাবি চারটে। তুটো থাকে মহেন্দ্র ঘোষের কাছে আর তুটো থাকে উমাচরণের কাছে।

তাছাড়া এর মধ্যে কাউকে কোন টাকা দেওয়া হয়নি তা বেশ মনে আছে উমাচরণের।

তন্ন তন্ন করে হিসেবের খাতা দেখলেন উমাচরণ। কোথাও কোন গোলমাল খুঁজে পেলেন না।

একবার ভাবলেন, কোথায় গেল টাকা? আমাদের কাছে ঐ সিন্দুকের চাবি রয়েছে। লোকে আমাদের দোষী বলবে। বিশেষ করে আমাকে চোর বলতে পেছ-পা হবে না। কেননা আমি ঐ ঘরে শুই।

ক্রমে তিনমাস কেটে গেল। টাকা আর পাওয়া গেল না। সব লোকে জানতে পারলো ম্যানেজারের সিন্দুক থেকে ছ'শো টাকা উধাও হয়েছে।

লজ্জায় মরে গেলেন উমাচরণ। তিনি জ্ঞানত জানতেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। অথচ কেন তিনি অপরাধী হবেন?

তিনি তো জানতেন, তিনি অপরাধী নন। তাঁর মন আগুনের মত পবিত্র।

তথাপি মানুষের কথা অনেকখানি খারাপ করলো বিষয়টিকে। মহাভাবনায় পড়লেন উমাচরণ। রাতে ঘুম নেই।

সর্বদা চিন্তা করতে লাগলেন, কি উপায়ে এ সমস্যার সমাধান হবে ?

শেষকালে চিন্তামণি নাশ করলেন চিন্তা।

একদিন হঠাৎ মনে পড়লো গুরুদেবের কথা। ছুটে চলে এলেন কাশীধামে।

গুরুদেবের শ্রীচরণে ভক্তি প্রণাম নিবেদন করে তাঁর কাছে নীরবে বসে রইলেন।

স্বামিজী তাঁকে দেখে জিগ্যেস করলেন, কি বাবা, টাকা গোলমাল করে এসেছ ?

উমাচরণ বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। টাকার গোলমাল হয়েছে। সেইজন্যে আপনার কাছে এসেছি।

স্বামিজী বললেন, যেমন তুমি তেমনি তোমার মাষ্টারমশাই। অমুক মাসে অমুক তারিখে পাঁচশো টাকা কোলকাতায় পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে তিনশো টাকা নরসিংহপ্রসাদ দত্তকে এবং দুশো টাকা স্মিথ ষ্টানিষ্ট্রীট কেম্পানীকে দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজেই তা রেজেষ্ট্রী করে এসেছ। তার রসিদ দু'খানা ডাক্তারখানায় অমুক জায়গায় অমুক ফাইলে আছে। টাকা পেয়ে তার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দিয়েছে তথাপি তোমাদের কারও ঘুম ভাঙেনি। খাতায়ও কোন খরচ লেখা হয় নি। আর একশো টাকা তোমার মাষ্টারমশাই বের করবেন। কোথায় আছে বা কি হয়েছে তা বলবো না।

অন্তর্যামী স্বামিজী আবার বললেন, তুমি মুঙ্গেরে এই সব কথা প্রকাশ করায় সেখান থেকে মাঝে মাঝে লোক এসে আমার কাছে দীক্ষা নেবার জন্যে বড় বিরক্ত করে। আমার এখানে থাকা দায় হয়ে উঠেছে। তোমার আর মুঙ্গেরে থাকতে হবে না। এবার মুঙ্গেরে গিয়ে চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার, শিলং, আসাম এই ঠিকানায় একখানা দরখাস্ত করবে।

উমাচরণ করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। পরে বললেন, আমি সকলকে সব কথা বলিনি। তবে দু'চার জনকে কিছু কিছু বলেছি। আগুন কখনো ছাই চাপা থাকে না। আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা ও ঘটনাসকল আপনিই প্রকাশ হচ্ছে।

তৈলঙ্গস্বামী খুব বেশী শিষ্য বা শিষ্যা করেন নি। তাঁর শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা হাতে গুণে শেষ করা যায়। কারও মতে তাঁর নাকি দুনা কুড়ির বেশী শিষ্যশিষ্যা ছিলেন না। তাঁর শঙ্করী মাতা নামে এক মহিলা শিষ্যা এখনো জীবিত আছেন এবং বারাণসীধামে অবস্থান করছেন।

এবার স্বামিজী দুঃখের সঙ্গে প্রকাশ করলেন, উমাচরণ! আর পাঁচ বছরের মধ্যে আমি দেহ রাখবো। যেখানেই থাকো আগে খবর দেবো। একবার আসবে। আর এখানে থেকো না। আসছে কাল মুঙ্গেরে যাবে।

এ কি কথা বললেন স্বামিজী!

চমকে উঠলো সর্বাঙ্গ উমাচরণের। এমন প্রিয় গুরুদেবকে ছেড়ে যাবেন কোথায়? তিনি কি ভাবে জীবন কাটাবেন গুরুদেব ছাড়া? গুরুই যে তাঁব কাছে প্রাণের প্রাণ—পরম ব্রহ্মস্বরূপ।

তথাপি গুরুদেব যখন চলে যা[illegible] বলেছেন তখন আর তাঁকে আটকান যাবে না।

দুঃখিত অন্তরে একদিন বিদায় নিলেন উমাচরণ গুরুর শ্রীপাদ-পদ্মে প্রণাম নিবেদন করে। তাঁর আদেশমত তিনি আসবেন মুঙ্গেরে।

পথে নানারকম কথা মনে পড়লো। একবার গুরু-বিয়োগব্যথা স্মরণ করে প্রাণটি ককিয়ে কেঁদে উঠলো। পরক্ষণে আননে প্রকাশ পেল আনন্দেব চিরশুভ্র বিজলীদ্যুতি এই মনে করে যে গুরুদেব নশ্বর দেহ ত্যাগ করে গেলেও থাকবে তাঁর অবিনশ্বর বিদেহ—পরম শক্তি-ময় আত্মা। সেই-ই অলক্ষ্য থেকে তাঁকে জোগাবেন শক্তি আর সাহস। সুতরাং তাঁর আর আশঙ্কা কিসের। এই কথা স্মরণ করে অকারণ আশঙ্কায় মুহ্যমান হলেন না উমাচরণ। মনে-প্রাণে দ্বিগুণ তৃপ্তি পেলেন আত্মার অমরতার কথা স্মরণ করে। মনে পড়লো তাঁর [illegible]র অমিয় মাখানো অমর বাণী,—

চাকর

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ,
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন-ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥······'

মুঙ্গেরে এলেন উমাচরণ। ডাক্তারখানায় মাষ্টারমশাই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি তখন যদুনাথের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

উমাচরণকে দেখে জিগ্যেস করলেন, কি হে উমাচরণ! তিন চার দিন হঠাৎ কোথায় গিয়েছিলে?

উমাচরণ বললেন, টাকার গোলমাল ভাঙতে গিয়েছিলুম।

এবার যদুনাথ সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, তবে কি কাশীধামে গিয়েছিলে?

উমাচরণ বললেন, ওছাড়া আর কোথায় যাবো?

তখন যদুনাথ আর মহেন্দ্রনাথ বললেন, তৈলঙ্গস্বামী কি বললেন

সকল কথা প্রকাশ করলেন উমাচরণ।

সঙ্গে সঙ্গে রেজেস্ট্রী করা রসিদ দু'খানি অনুসন্ধান করে দেখি সমস্ত কথা জানালেন।

উভয়ে হতবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

অবশিষ্ট একশো টাকার জন্যে মাষ্টার মশাই বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

পরে লোহার সিন্দুকের মধ্যে থেকে ঐ টাকা বেরুলো।

সিন্দুকে রং করা হয়েছিল। একশো টাকার নোটটি ওর গায়ে লেগে থাকতে দেখা গেল।

একদিন মাষ্টারমশাই উমাচরণকে ডেকে বললেন, এ দেখ উমাচরণ সেই একশো টাকা। এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

উভয়ে করজোড়ে প্রণাম জানালেন তৈলঙ্গস্বামীর উদ্দেশ্যে অন্তর্যামী মহাপুরুষের বাক্য সত্য এবং সফল হয়েছে মনে করে অন্তরে অনুভব করলেন আনন্দের বেগবতী প্লাবন।

একদিন গুরুদেব বলেছিলেন, উমাচরণ, আসামে যাও।

উমাচরণের মন তখন চায়নি ওখানে যেতে। কাশী থেকে ফিরে ২ বছর ছিলেন মুঙ্গেরে। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো, গুরুদেব বলেছিলেন, আসামে চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে দরখাস্ত পাঠাতে।

একদিন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন উমাচরণ চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে।

কিছুদিন পরে চাকরী করার নোটিশ পেলেন উমাচরণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাব্ ওভারসিয়ার। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। ভাতা পনেরো টাকা।

চাকরীস্থল হলো শিবসাগর। অমুক তারিখের মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে। একটা চরম বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে গেলেন উমাচরণ। চিন্তা এলো মনে, তাইতো মুঙ্গের থেকে সুদূর শিবসাগর যেতে হবে। সেত অনেকখানি রাস্তা।

মন না চাইলেও তবু যেতে হবে উমাচরণকে। এ যে তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ। তাঁর লীলারহস্য বোঝা দায়। দু'জন্মের রহস্য এক সূত্রে বাঁধার এ এক রহস্যময় লীলা। তাঁর অদৃশ্য শক্তি কাজ করে চলেছে।

শিবসাগরে যেতে হবে উমাচরণকে।

মাষ্টারমশাইকে বললেন উমাচরণ, আপনি আমার কাছ থেকে টাকার হিসেব বুঝে নিন। আমি এখানে আর থাকবো না।

মাষ্টারমশাই এবং অন্যান্য সকলে উমাচরণকে বললেন, তোমার কাছে বুঝে নেবার কিছু নেই। তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। বর্ত্তমান মাস থেকে আমরাই তোমাকে পঞ্চাশ টাকা করে দেব। তুমি কোথাও যেও না।

উমাচরণ বড় মুস্কিলে পড়লেন। যতবার মাষ্টারমশায়ের কাছে চাকরী ছাড়ার প্রস্তাব জানান ততবারই ফিরে আসেন বিফলমনা হয়ে।

এমনি করে কাটলো পুরো একটি মাস।

আর মাত্র দিন দশবারো মর্তলীলা করবেন স্বামিজী ক'দিন শিষ্যদের ডেকে ধর্মোপদেশ দিলেন।

দেহ রাখবার পূর্বমুহূর্তে শিষ্যদের কাছে বললেন, আমি পারি এই মাপের একটি সিন্দুক তৈরী করে আনতে হবে।। দেহত্যাগ হলে ঐ সিন্দুকের মধ্যে আমাকে বসিয়ে ওপ[illegible] এঁটে দেবে। পরে তালা বন্ধ করে পঞ্চগঙ্গার সামনে এতো প দূরে অমুক জায়গায় সিন্দুকসহ জলে নিক্ষেপ করবে। অন্ত্য-সং কোন প্রয়োজন নেই।

দেহত্যাগের পূর্বদিন শিষ্যদের বললেন, আগামীকাল এব নৌকো ভাড়া করবে। দেহত্যাগের পর ঐ সিন্দুক নৌকো প্রথমে অসি হতে বরুণা পর্যন্ত একবার ভ্রমণ করে তারপ জায়গায় ঐ সিন্দুক জলে ফেলে দেবে।

তারপর বললেন, যদি তোমাদের কারও কিছু জিগ্যেস থাকে আজ রাতে শেষ করবে। আগামীকাল আমার সঙ্গে কোন কথা হবে না।

সেদিন অনেকে অনেক কথা জিগ্যেস করলেন স্বামিজীকে।

উমাচরণ বললেন, বাবা! আমার গতি কি করবেন? স তাঁদের নিজের কাজ উদ্ধার করেছেন কেবল আমা হলো না।

স্বামিজী বললেন, তুমি কাজকর্ম যেমন করছো তেমনি কখনো ঘুঁটি ছেড়ে যেও না।

এরপর কালীচরণ স্বামীকে কাছে ডেকে বললেন, তুমি এর সর্বদা দৃষ্টি রাখবে। কোনমতে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। হলে মাঝে মাঝে এর বাড়ীতে গিয়ে যাতে অগ্রসর হতে প করবে। এর গতিমুক্তির ভার তোমার উপর রইলো।

আজ মহাদিন।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মহাপ্রস্থানে যাত্রার দিন আজ।

হ, কাশীর সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তৈলঙ্গস্বামী আজ দেহত্যাগ

নে আবালবৃদ্ধবণিতা এসে জমায়েত হলো স্বামিজীর পবিত্র
শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে প্রাণভরে। কেউ জানাচ্ছে
থা। কেউ শোনাচ্ছে গুরুর আসন্ন বিদায়জনিত
স্বামিজী আর থাকবেন না ভবসংসারে। মানুষকে নিয়ে
করবেন না। সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে অনিত্যকে
দিন তিনি যে লীলা করে গেলেন আজ তার হবে মহা-
আজ তিনি অমরলোকে গিয়ে প্রবেশ করবেন নিত্য
এই স্থূল নশ্বর শরীর ার থাকবে না। সেখানে যাবেন
রীরে।

তত্ত্বকথা স্মরণ করে নানান বয়সের এবং নানান ভাবের
য়েত হয়েছেন স্বামিজীর আশ্রমে। গ্রহণ করছেন
দিব্য এবং ভবসংসারের শতজ্বালানিবারণকারী
পদধূলিকণা। তাই নিয়ে অঙ্গে এবং শিবে লেপন

ামিজীও সকলকে প্রাণভরে আশীর্বাদ জানাতে লাগলেন।
নোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে শুভ কামনা জানালেন। কারও
দুঃখ রইলো না। আজ যে তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। ভক্তের
কবে চলে যাবেন নিত্যধামে। যে যা মনে করে
কাছে এসেছিল আজ তাই লাভ করে পরম আনন্দিত মনে
চ্ছে নিজের বাসায়।

ক্ত স্বামিজীর জন্যে বিছানা এবং কাঠের বাক্স তৈরী হয়ে
ক্তগণ ফুল এবং ফুলের মালা নিয়ে এলো। সিন্দুকের মধ্যে
না তৈরী করে দিলো। স্বামিজীর নশ্বর দেহ ওতে

আটটা-নটার সময় স্বামিজী বেদীর পাশে সেই ছোট
লে এলেন। আসার সময় ভক্তদের বললেন, সমস্ত দরজা